সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪

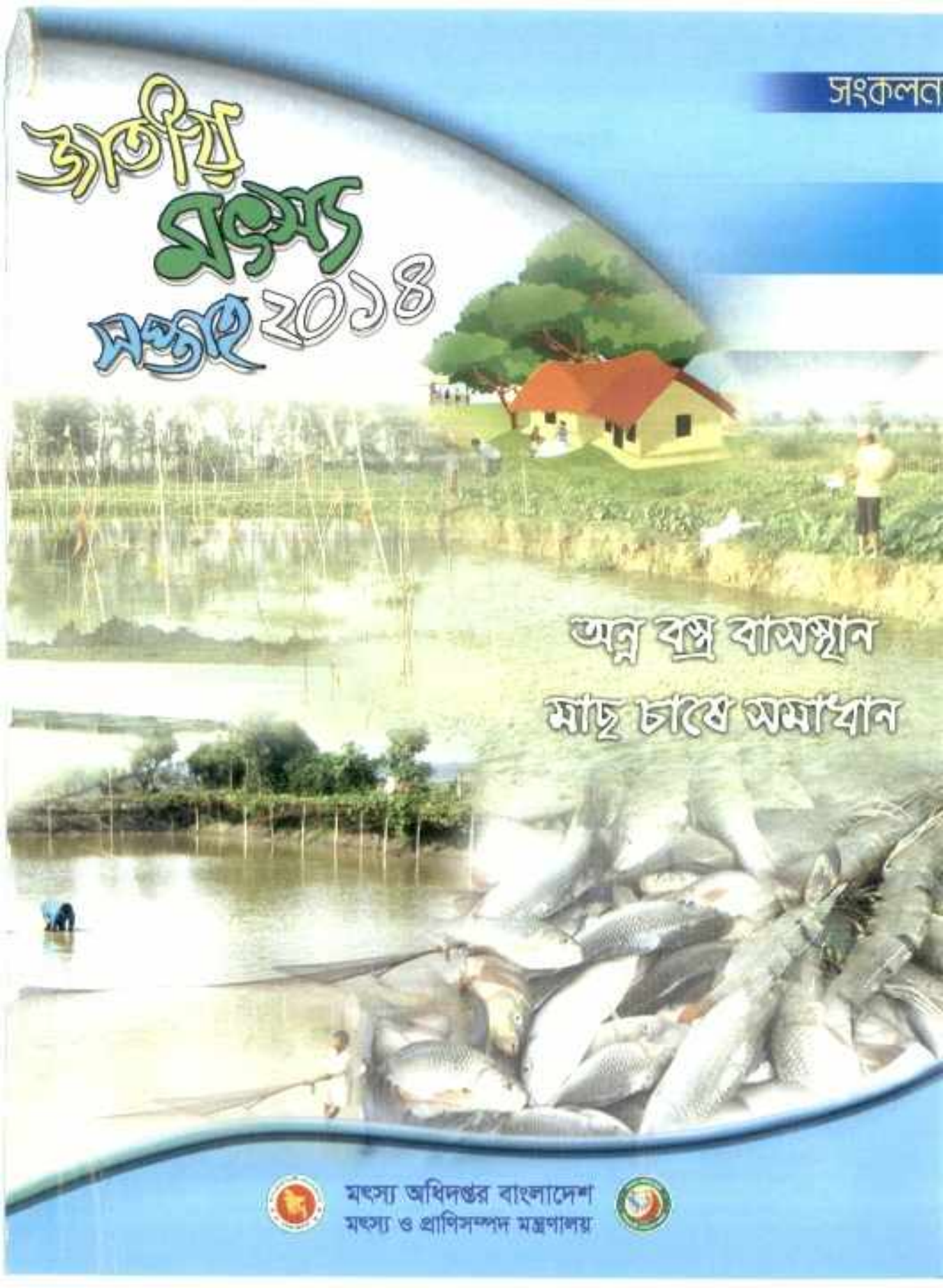

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান
মাছ চাষে সমাধান

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সৈয়দ আরিফ আজাদ	মহাপরিচালক	প্রধান উপদেষ্টা
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন	পরিচালক	উপদেষ্টা
এম আই গোলদার	পরিচালক	সভাপতি
ড. মোঃ গোলজার হোসেন	উপপরিচালক	সদস্য
মোঃ আবুল হাশেম সুমন	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ মজিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ তৌহিদুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোছাঃ সাইনার আলম	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ হুমায়ুন কবির খান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ	সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

মহাপরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১৪

প্রচ্ছদ

সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমি, মৎস্য অধিদপ্তর

প্রচার সংখ্যা

৮,৫০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ

রিমিনি ইন্টারন্যাশনাল, হুইয়া ট্রেড সেন্টার

২৯১/বি, ফকিরাপুল, ঢাকা

Citation: DoF. 2014. National Fish Week 2014 Compendium (In Bengali). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 144p.

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ আষাঢ় ১৪২১
০২ জুলাই ২০১৪

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, জেলে ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। আধুনিক ও পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ, আহরণ ও পরিচর্যা, যথাযথ সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যসম্মত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই। এ বছর জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, মাছ চাষে সমাধান' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে জনহিতকর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য খাত এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই এ খাতের সর্বাধিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন-এটাই প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৪' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আষাঢ় ১৪২১
০২ জুলাই ২০১৪

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য "অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, মাছ চাষে সমাধান" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মৎস্যখাত দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি সেক্টর। মেধাসম্পদ জাতি গঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের মৎস্যখাত আমাদের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

আমাদের সরকার গত পাঁচ বছরে এ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছর ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এ খাত থেকে প্রায় ৮ হাজার ৪২০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে আইনী লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জলসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছি। আমার বিশ্বাস এ অর্জন মৎস্য আহরণ ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করবে। আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথমবারের মত জেলেদের নিবন্ধন ও আইডি কার্ড প্রদানের যুগান্তকারী কাজ শুরু করেছে। জেলে সমাজের উন্নয়নে আমাদের এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রাকৃতিক জলাশয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। লাগসই ও পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২১
০২ জুলাই ২০১৪

বাণী

মৎস্য আমাদের জাতীয় সম্পদ। জাতীয় জিডিপিতে এ সম্পদের অবদান ৪.৩৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৩৭ শতাংশ)। দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগ যোগান দিচ্ছে মাছ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১১ শতাংশের অধিক মানুষের জীবন-জীবিকা যোগায় এ মৎস্যসম্পদ। দেশের রপ্তানি আয়ে এ খাতের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উভয় ধরনের মৎস্যসম্পদের এমন বিশাল ভাণ্ডার সারাবিশ্বে বিরল।

মৎস্যসম্পদের বিকাশ ও বিস্তারে সরকার তথা জনগণের সফলতা বিস্তর। প্রাণ্ড তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বছরের তুলনায় বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দু'গুণ, সেখানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচগুণেরও অধিক। বাঙালির প্রাণের ইলিশ প্রায় সংকটে পড়ে গিয়েছিল, এখন সেটা প্রাচুর্যে পরিণত হয়েছে। মুক্ত জলাশয়ে সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণের ফলে সংকটাপন্ন অনেক দেশী মাছের পুনরাবির্ভাব শুরু হয়েছে। অনেক বাধা পেরিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি সম্প্রতি রাশিয়াতে মৎস্যপণ্য রপ্তানির কারিগরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হওয়ায় নতুনভাবে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রপ্তানিতব্য মৎস্যপণ্যের মান পরীক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত তিনটি ল্যাবরেটরি এখন আক্রেডিটেড।

বিশ্বায়নের যুগে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের অমিত সম্ভাবনাময় সমুদ্রসম্পদকে ব্যবহার করতে হবে, উৎকর্ষ আনতে হবে অভ্যন্তরীণ জলরাশি ব্যবহারে। শুধুমাত্র আমাদের মৎস্যসম্পদকে ব্যবহার করেই দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এজন্য দরকার দূরদর্শী পরিকল্পনা, প্রয়োজন গণমানুষের অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা।

মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়ে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪**। এ উৎসবের মূল বার্তা হলো *অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, মাছ চাষে সমাধান*। আসুন আমরা এ বার্তা ছড়িয়ে দিই দিক-বিদিক, সবাই মিলে দেশকে মৎস্যপ্রধান করে তুলি।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২১
০২ জুলাই ২০১৪

বাণী

আমাদের এ নদীমাতৃক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অপার সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নে দেশের জনগণকে সচেতন করে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪** উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি। একই সাথে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টাকে সফল করার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

চিংড়ি শিল্পের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নিমিত্ত ইতোমধ্যে চিংড়ির ছয়টি সম্ভাব্য রোগের জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য পিসিআর প্রটোকল তৈরি করা হয়েছে। চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎস শনাক্তকরণের জন্য চাষ প্রযুক্তি সময়োপযোগী করে ক্লাস্টার চাষ পদ্ধতিতে উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, মাছ চাষে সমাধান এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪** উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী-জেলেসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪**-এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২১
০২ জুলাই ২০১৪

বাণী

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আবহমানকাল থেকেই অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক কারণে মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশের জীবন-জীবিকা নির্বাহে মৎস্য খাতের ওপর নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্যখাত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলসম্পদে রয়েছে মৎস্য উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা। বিশাল এ জলজ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব- যা এখন সময়ের দাবি।

এ প্রেক্ষাপটে দেশের সাধারণ মানুষকে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন করার পাশাপাশি এ সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী "**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪**" উদযাপিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্যসম্পদের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করা এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন, নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও অধিকতর আগ্রহী করে গড়ে তোলা।

মৎস্য-বান্ধব সরকার বিশাল সম্ভাবনাময় এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ খাতের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও পেশাজীবীসহ সকল মহলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সর্বস্তরে গড়ে তুলতে হবে মৎস্যসম্পদ উৎপাদন ও সংরক্ষণে সামাজিক আন্দোলন। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

এবারের শ্লোগান **অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, মাছ চাষে সমাধান** মৎস্য সপ্তাহের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

শেলীনা আফরোজ পিএইচডি

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আষাঢ় ১৪২১
০২ জুলাই ২০১৪

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ২০১২-১৩ আর্থিক সালে ৩৪.১০ লক্ষ মে.টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যার চলতি মূল্যমান প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। বিগত পাঁচ বছরে মৎস্যখাতে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৪.৩৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৩৭ শতাংশ)। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষির অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় মৎস্য সেক্টরের প্রবৃদ্ধি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ২.০১ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ, যা প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে একটি নিরাপদ ও সহজলভ্য উৎস হিসেবেই স্বীকৃত। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক তথা প্রায় ১৭.১ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত পাঁচ বছরে এ খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের।

দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও মজবুত এবং স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সরকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশবাসীকে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২ থেকে ৮ জুলাই দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪** উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এ বছরের শ্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে **'অন্ন বস্ত্র বাসস্থান মাছ চাষে সমাধান'**।

অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ মূল্যবান ও সহজপাঠ্য সংকলনটি যাদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। স্থানাভাবে কিছু লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা দুঃখিত। একই কারণে কিছু লেখা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাই তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংকলনটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ডফিশ, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মৎস্যসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪** উদযাপনের সন্ধিক্ষণে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সৈয়দ আরিফ আজাদ

সূচিপত্র

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের ভূমিকা ১৩
সৈয়দ আরিফ আজাদ

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্য ২২
প্রফেসর ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী

পোনা মাছের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ : বিবেচ্য বিষয় ও করণীয় ২৬
ড. মো: রফিকুদ্দিন শাহ

আন্তর্জাতিক বিধিবিধান : বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবস্থাপনায় এর প্রাসঙ্গিকতা ২৯
ড. মুশতাক সিরাজাদিন, ড. মো: শরীফ উদ্দিন ও রাজীব মুখার্জী

কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা : ডব্লিউবিআরপি'র একটি সফল উদ্যোগ ৩৪
ড. এ আতিক রহমান, মো: নিয়াজ আলী ও মো: তৌহিদুর রহমান

উত্তরাঞ্চলে আদিবাসীদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে কুচিয়া উৎপাদন ৩৮
ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ ও ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী

মাছের উচ্ছিষ্ট থেকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মাছের সস্তা খাদ্য : শুকনো সাইলেজ ৪৩
ড. এ কে এম নওশাদ আলম ও উজ্জ্বল হোসেন

মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দূষণের সম্ভাব্য উৎস শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ ৪৬
নিরঞ্জন বিশ্বাস ও মো: বেলাল হোসেন

ফাইবার গ্লাস বোট : জেলেদের নিরাপত্তায় সাম্প্রতিক উদ্যোগ ৪৯
শেখ মুজাহিদুর রহমান ও ড. আ ন ম আমিনুল ইসলাম খান

অপ্রচলিত মৌসুমি জলাশয়-পদ্মা নদীর কোল : শুকনো মৌসুমে মাছচাষের নতুন সম্ভাবনা ৫২
এম আই গোলদার ও ড. মো: আমিনুল রহমান

প্লাবনভূমিতে স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ৫৫
ড. বিনয় কুমার বর্মন, বিধু ভূষণ মজুমদার ও এম আই গোলদার

জলাভূমি অভয়াশ্রম : অনন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদন কৌশল ৫৮
মো: আবুল হাশেম সুমন, ড. সৈয়দ আলী আজহার ও তারিক আজাদ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ জরিপ : অতীত ও বর্তমান ৬৪
এবিএম আনোয়ারুল ইসলাম, মো: শফিকুল ইসলাম ও মো: আতিয়ার রহমান

ইলিশ উৎপাদনে জাটকা ও প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণের সুফল ৬৭
ড. মো: আনিসুর রহমান ও মোহাম্মদ জাবের

চিংড়ি শিল্পে এন্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব ৭০
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মফজুরুল করিম, ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও অধ্যাপক ড. এম নিয়ামুল নাসের

বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্যের বিকল্প হিসেবে কালো সৈনিক পোকার চাষ ও সম্ভাবনা ৭৩
প্রফেসর ড. মো: আব্দুস সালাম, শাহরিয়ার হাশেম ও কে এম শাকিল রানা

পরিবেশবান্ধব সুস্বাদু শিং মাছের মিশ্র চাষ ৭৮
ড. এ.এইচ.এম কোহিনুর, মো: মশিউর রহমান ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপনা কৌশল ৭৯
ড. এ কে এম আমিনুল হক

বাংলাদেশে এসপিএফ চিংড়ি প্রবর্তন ঃ সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ৮৩
অমিতোষ সেন ও ড. মো: গোলজার হোসেন

বড়ভাঙ্গা মডেল ঃ উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতির দলগত চিংড়ি চাষ ৮৭
প্রফুল্ল কুমার সরকার

হালদা নদীর বর্তমান অবস্থা ও সংরক্ষণে করণীয় ৯১
ড. মোহা: মনিরুল আলম ও প্রভাতী সেন

উপকূলে সী-উইড চাষ ঃ অণুপুষ্টি হিসেবে ব্যবহার সম্ভাবনা ৯৭
মোহাম্মদ আশরাফুল হক, ড. মো: এনামুল হক ও ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী

তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস ঃ গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড ও পোনা উৎপাদন কৌশল ৯৯
ড. মো: নাহিদুজ্জামান, ড. মো: মাহবুবুল আলম মিঞা ও ড. বিনয় কুমার বর্মন

ইফকাস-এ মাছ ও সবজি চাষ ঃ টেকসই খাদ্য-নিরাপত্তার নতুন সম্ভাবনা ১০১
ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক রিপন, মো: হোসনে আলম এবং ড. খন্দকার মোরশেদ-ই-জাহান

ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ উপকরণ ব্যবহার ঃ মৎস্য সম্পদের ওপর বিরূপ প্রভাব ১০৫
মো: জাহেদুল হাসান, ড. মাসুদ হোসেন খান ও মোহাম্মদ জাহেদ

মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে চলমান কার্যক্রম ১০৮
ড. জি এম শামছুল কবীর ও শেখ মনিরুল ইসলাম

কার্প ও মলার মিশ্রচাষ ঃ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের সহজ উপায় ১১২
কিরণ কুমার পাল ও মো: ফেরদৌস আলী

বিলকুমারী বিল ঃ এক সফল সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার নাম ১১৫
মোহা: গোলাম রব্বানী ও মো: রাশেদুল আলম

কার্পজাতীয় মাছে অ্যাংকর ওয়ার্ম এর সংক্রমণ ঃ প্রতিকার ও প্রতিরোধ ১১৮
মো: শরীফুল ইসলাম, মো: আমিনুল ইসলাম ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

ভেদা মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন কৌশল ১২১
নিলুফা বেগম ও মো: মেহেদী হাসান প্রামানিক

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৪ ১২৩

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ১২৪

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৩১

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের ভূমিকা

Role of Fisheries Sector in Socio-economic Development of Bangladesh

সৈয়দ আরিফ আজাদ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। বলা যায় এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০১২-১৩ সালে মাছের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.১০ লক্ষ মে.টনে, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩-এর তথ্যমতে এ দেশের মোট দেশজ উৎপাদ বা জিডিপি'র ৪.৩৭ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৩৭ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান। সাম্প্রতিক সময়ে মৎস্যখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি কৃষির অন্যান্য উপখাত যেমন- শস্য, প্রাণিসম্পদ ও বন-এর তুলনায় অনেক বেশি। এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানেও মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% প্রাণিজ আমিষের যোগান দেয় মাছ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত পাঁচ বছরে এ খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের। দেশের রপ্তানি আয়ের ২ শতাংশের অধিক আসে মৎস্যখাত হতে। বিগত পাঁচ বছরে মৎস্য উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৮৮ শতাংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত **রূপকল্প** ২০২১-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য সেক্টরে অর্জিত হয়েছে দৃশ্যমান সাফল্য। আশা করা যায় ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনেকাংশেই সম্ভব হবে।

২০১৪-১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রাসমূহ-

- মাছের উৎপাদন ২০০৮-০৯ (২৭.০১ লক্ষ মে.টন)-এর চেয়ে ২৫% বৃদ্ধিকরণ, (২০১২-১৩ সালের মধ্যেই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ ২৬.২৫% বৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে)
- জনপ্রতি ৫৬ গ্রাম আমিষের চাহিদা পূরণ, (২০১২-১৩ সালের মধ্যে জনপ্রতি আমিষের প্রাপ্তি ৫২ গ্রামে উন্নীত হয়েছে)
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক আয় ১ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীতকরণ,
- বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, (বিগত ৫ বছরে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রায় ৬ লক্ষ)
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০% বৃদ্ধিকরণ
- মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, (মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে গড়ে ২০ শতাংশ মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে)
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ
- বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ

মৎস্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

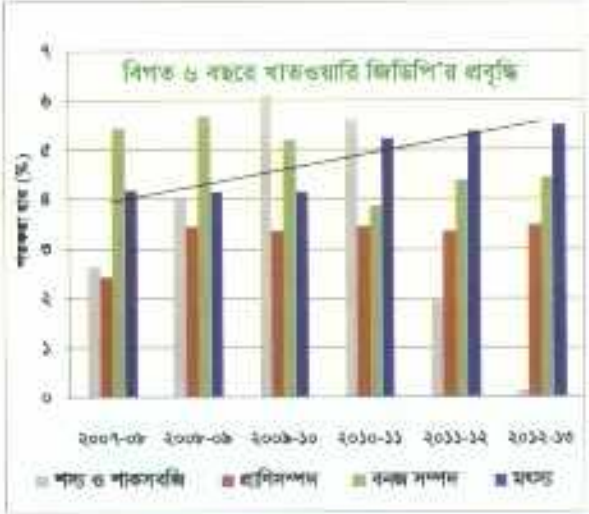

১. **মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান:** দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মে.টন, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ তথা মৎস্যবান্ধব কর্মসূচি এবং চাষি/উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৪.১০ লক্ষ মে.টন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৫.৫৫ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। প্রবৃদ্ধির এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে ২০২০-২১ সালে দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রক্ষেপিত

মৎস্য চাহিদা (৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন) পূরণ করা সম্ভব হবে। বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক (গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৪৯ শতাংশ) এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় স্থিতিশীলতা বিরাজমান।

দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশের ১১ শতাংশের অধিক বা প্রায় ১৭১ লক্ষ লোক তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য সেক্টরে সম্পৃক্ত এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। এছাড়াও বিগত পাঁচ বছরে এ সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত বার্ষিক ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের ৮০ শতাংশের অধিক নারী।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের (নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমি) পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়ের (পুকুর, মৌসুমি চাষযোগ্য জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের) পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ কিমি এবং সমুদ্র উপকূল রয়েছে ৭১০ কিমি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন, সেখানে তিন দশকের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৪.১০ লক্ষ মে.টন। বিগত প্রায় তিন দশকের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১২-১৩ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশে। অন্যদিকে প্রায় তিন দশকের ব্যবধানে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন হ্রাস না পেলেও প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি মূলত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণেই।

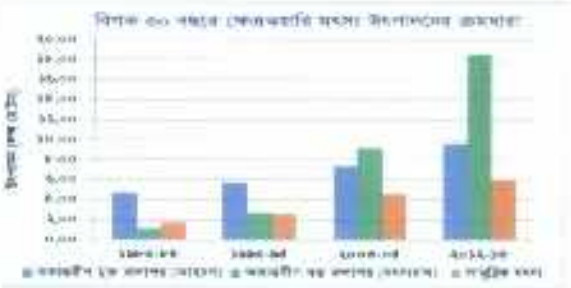

২. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন: উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-১৪ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৪৬০ মে.টন রুপাই মৎস্যসম্পদ ও বিপন্নপ্রায় প্রজাতির পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে মোট পোনামাছ অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন হাজার মে.টন। এ পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের ফলে বার্ষিক প্রায় ৭,৫০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেক বিপন্নপ্রায় প্রজাতির মাছের আবির্ভাব ঘটেছে। তাছাড়া এ সরকারের আমলেই মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত বিল নার্সারি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। বিগত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরে রাজস্ব বাজেটে মোট ৭১৫টি বিল নার্সারি স্থাপিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ বছরে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে ২০৫টি। প্রাথমিক তথ্যে দেখা যায়, এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশব্যাপী বিল নার্সারি কার্যক্রম আরো স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সরকার অতি সম্প্রতি ১১৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমুক্তকরণ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

৩. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: জলাশয় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী-জেলেসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জলাশয়ের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই সরকারি খালমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এ নীতির আওতায় অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/জেলেদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৩৪টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাঁচ বছরে স্থাপিত ৫৩৪টি অভয়াশ্রমসহ বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৫৫০টি অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের প্রাপ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ: চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি খামারে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের

উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত খামারে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সমন্বিত চিংড়ি-শস্য/সবজি চাষ ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হচ্ছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায়, এ নীতিমালা মোতাবেক পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন সম্ভব হবে। নানাবিধ অপপ্রচার ও নেতিবাচক কার্যক্রমকে মোকাবেলা করে এ ক্রমবর্ধনশীল শিল্পকে অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি সুফলভোগীদের নিয়ে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সহজলভ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর (Polymerase Chain Reaction-PCR) প্রটোকল তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত পোনা মজুদের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া চিংড়ি চাষকে আরো লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব করার নিমিত্ত জলাশয় বা ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিংড়ির পিএল নার্সিং-এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ক্লাস্টার ফার্মিং পদ্ধতি প্রবর্তনের

বাংলাদেশে ২০১৪ সালে প্রথমবারের মত হাওয়াই, আমেরিকা থেকে এসপিএফ (Specific Pathogen Free-SPF) বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ি আমদানির মাধ্যমে চিংড়ির পিএল উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

৫. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন: ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা। মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন (মোট ১১ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করে আইন সংশোধন করা হয়েছে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৬টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ২,০৬,২২৯টি জাটকা জেলে পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে চার মাসের জন্য মোট প্রায় ২৪,৭৫০ মে.টন খাদ্যসহায্য বিতরণ করা হয়। তারই ক্রমধারায় আরো বর্ধিত কলেবরে ২০১৩-১৪ সালে জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য জাটকাসমৃদ্ধ ১৫ জেলার ৮১টি উপজেলায় ২,২৪,১০২টি জাটকা জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৫,৮৫৬ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে

দেখা যায়, বিগত ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮ সালে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যসহায্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬,৯০৫ মে.টন। সেখানে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৬ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ১,২২,৯২৫ মে.টন। তাছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ বছরে ১,১৬৫ জনসহ বিগত পাঁচ বছরে সর্বমোট ২১,৯৪০ জন মৎস্যজীবীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/রিক্সা চালানো, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশ ও জাটকা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম আরো বেগবান ও কার্যকর করার নিমিত্ত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক একটি অত্যাধুনিক জলযান ক্রয় করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৩.৫১ লক্ষ মে.টন, যার বর্তমান বাজারমূল্য ১৫ হাজার কোটি টাকার ওপর। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের এক-দশমাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন: মৎস্যসম্পদের উৎকর্ষ সাধন তথা মৎস্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে নিয়ে সরকার ইতোমধ্যেই বেশকিছু নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

বিগত ৫ বছরে মৎস্য বিষয়ক প্রণীত নীতি, আইন ও বিধিমালা

ক. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯
খ. মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১
গ. মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১
ঘ. মৎস্যখাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১১
ঙ. চিংড়ি প্লট লবাইন ও ইজারা নীতিমালা ২০১৩
চ. এনআরসিপি (National Residue Control Plan- NRCP) পলিসি গাইডলাইন ২০১৩

নোট: মৎস্য সংরক্ষণ আইন ২০১৪, মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৪ এবং জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

তন্মধ্যে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন এবং মৎস্য হ্যাচারি আইন অন্যতম। প্রণীত এসব আইনের আওতায় মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, আইন দু'টির সফল বাস্তবায়নের ফলে উদ্যোক্তা/চাষি পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন পোনা ও মৎস্য খাদ্যের পর্যাপ্ততা অনেকাংশেই নিশ্চিত হবে। তাছাড়া দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং

ইলিশের জন্য প্রজনন মৌসুমের কাল সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া সরকার নভেম্বর, ২০১১-এ প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে ১ (এক) সেমি বা তার চেয়ে কম ব্যাসের বা দৈর্ঘ্যের মেস- বিশিষ্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ আরও কার্যকর করার নিমিত্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধনকল্পে জালে ধৃত মাছের আকার ও সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ সেমি আকারের বোয়াল মাছ এপ্রিল থেকে আগস্ট, ৩০ সেমি আকারের পাঙ্গাস মাছ নভেম্বর থেকে জুলাই এবং ২৫ সেমি আকারের জাটকা মাছ নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত ধরা, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। অতি সম্প্রতি দেশে আফ্রিকান মাগুর মাছ চাষ নিষিদ্ধ ও জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া জাটকা ধরার সর্বনিম্ন আকার ২৩ সেমি-এর পরিবর্তে ২৫ সেমি নির্ধারণসহ জব্দকৃত জাটকা মাছ নিলামের পরিবর্তে গরিব-দুঃস্থ ও এতিমখানায় বিনামূল্যে বিতরণের বিধান সংযুক্ত করে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর সংশোধন করা হয়েছে।

৭. **মৎস্যজীবী-জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে সরকার প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। দেশব্যাপী প্রায় ২০ লক্ষ মৎস্যজীবী-জেলের মধ্যে ২০১৩-১৪ সালের মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে প্রকল্পের আইডি কার্ড প্রদানের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ কার্যক্রমের ফলে প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) জীবননাশ ঘটলে জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। তাছাড়া এ পরিচয়পত্র ইলিশ জেলেদের চিহ্নিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, যার ফলে চলমান ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ হবে।

৮. **বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া উৎপাদনের এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩.৯ মে.টন। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দীঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে আগামি ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.০ মে.টন এবং ২০২০-২১ সালের মধ্যে ৫.০ থেকে ৬.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব।

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩টি সরকারি পুকুর/দীঘি/জলাশয় নিয়ে ৮০'র দশকের প্রথম দিকে শুরু হয়ে ২০ জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যচাষের অনুপযোগী জলজ আগাছায় পরিপূর্ণ দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা হাজামজা পুকুর-দীঘির কচুরিপানা ও জলজ আগাছাসহ অন্যান্য উদ্ভিদ অপসারণের পর পুকুর সংস্কার, পুনঃখনন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে মৎস্যচাষের আওতায় আনা হয়।

প্রকল্পের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সফলভাবে চলমান অবস্থায় বিগত ২১ জুন ১৯৮৬ খ্রি. তারিখ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় এবং গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা ২৫ বছরের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষে বিগত ২০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রি. প্রকল্পটি পুনরায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরিত হয়। উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় এ খাস জলাজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার অপামর নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্পভুক্ত পুকুর/জলাশয়ে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১১ খ্রি. তারিখে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ অনুমোদন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের নিমিত্ত উল্লিখিত চারটি উপজেলার ৭২৬৩ জন সুফলভোগীকে নিয়ে সুফলভোগী দল গঠন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ৫,৪৮৯ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। বাঁওড়গুলোতে মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সরকার অতি সম্প্রতি ৬টি বাঁওড় মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করেছে। এ সমস্ত বাঁওড়ে সুফলভোগী দল গঠনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন: বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরেপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালা মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত ৫ বছরে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় খনন করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলাধীন মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত মধুমতি বাঁওড়ের (দৈর্ঘ্য ৯.৩ কিমি) আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে এ বাঁওড়ে মোট প্রায় ৬.৭৮ হেক্টর মাটি খনন করা হয়। খননকৃত জলাশয়ে নিবন্ধ সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্নি বাঁওড়ের আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত তিন বছরে প্রায় ১২৫ হেক্টর মাটি খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

উন্নয়নকৃত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

দেশব্যাপী অন্যান্য অবক্ষয়িত জলাশয়সহ ঐতিহ্যবাহী হুমা সাগর নদী পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়নকৃত জলাশয়সমূহের সাথে সম্পৃক্ত সুফলভোগীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার।

১০. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলত আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ ভটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মোট ৫২,৫১৪টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবীর পরিবারের ন্যূনতম ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে। মৎস্য আহরণে মোট ১৮৭টি ও চিংড়ি আহরণে মোট ৩৮টি ট্রলার অর্থাৎ সর্বমোট ২২৫টি বাণিজ্যিক ট্রলার বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত রয়েছে।

অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রজ্ঞা নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি

এলাকায় মৎস্য আহরণে অইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ জরিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণমাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল এবং গ্রাউন্ডফিশ জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর Vessel Tracking and Monitoring System (VTMS) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fibre Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে।

এসব আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নৌকার বিভিন্ন সুবিধা বিবেচনা করে পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের মাঝে আরও অধিক সংখ্যায় নৌকা সরবরাহের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আইইউইউ (IUU- Illegal, Unreported and Unregulated) ফিসিং এর ক্ষেত্রেও মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে সামুদ্রিক মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে।

১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ: আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার। এ সমস্ত পরীক্ষাগারে LC-MS/MS মেশিনসহ ELISA, AAS ও PCR মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার সাভারে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি কয়েক মাসের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করবে। মাছ ও চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালের মার্চ মাসে ইইউ মিশন-এর সুপারিশে মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার বিধান প্রত্যাহার করা হয়েছে। চিংড়ি হেচারে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২,০৭ লক্ষ চিংড়ি খামার ও ৯,৬২৪টি রপ্তানিযোগ্য ফিনফিস (প্রধানত পাঙ্গাস, কৈ, তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর)-এর খামার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।অতি সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ই-ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৮৫ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ অর্জন করেছে ৪,৩১২.৬১ কোটি টাকা।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৩-০৪ সালে প্রায় ৫৪ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ ২,৩৬৩.৪৭ কোটি টাকা অর্জন করে। সেখানে ১০ বছরের ব্যবধানে ২০১২-১৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ৮৫ হাজার মে.টনে দাঁড়িয়েছে এবং এ থেকে আয় প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৪,৩১২.৬১ কোটি টাকা। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত তিনটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। অনেক বাঁধা পেরিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি সম্প্রতি রাশিয়াতে মৎস্যপণ্য রপ্তানির কারিগরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হওয়ায় নতুনভাবে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারণের নিরাপদ মাছ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য বাজার ও আড়তগুলোতে সচেতনতা সভা করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ করছে। মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটিং ডিভিটিস কিট বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় এ ডিটেকটিং কিট সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

১২. জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ: জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ঋতুও পরিবর্তিত হচ্ছে- এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মৎস্যসম্পদের সহনশীল প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার লক্ষ্যে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৩. প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ: রুই-কাতলা জাতীয় মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হলদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র (nursery ground) সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাঁওড় অঞ্চলের প্রাকৃবৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীতে রক্ষায় নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে ২০১২ সালে বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১,৫৬৯ কেজি রেণু আহরিত হয়েছে। ২০১৩ সালে এক ধাপে ৬২৫.৫ কেজি রেণু সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রথম ধাপে ইতোমধ্যেই ৫০৮.৩৮ কেজি রেণু সংগৃহীত হয়। আশা করা যায় প্রতিবারের ন্যায় দ্বিতীয় ধাপেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেণু সংগৃহীত হবে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর ৭টি জেলার হাওর অঞ্চল চিহ্নিত করে ডেটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ২০ বছরের জন্য এক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন: মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২,৯৭ লক্ষ জন সুফলভোগীকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে জনবল সঙ্কট এবং মৎস্য সেবা কার্যক্রমের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের সময়ে দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩,০০৫ জন স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী বা লিঙ্ক উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৭৫ জন মহিলা। সর্বোপরি সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর অর্জিতব্য লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান মোট ৪,৮৪৬টি রাজস্বখাতের পদের সাথে অতিরিক্ত আরো ২,৪৫৭টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন করার প্রস্তাব গত ১৯ এপ্রিল ২০১২ খ্রি. তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় সর্বমোট ৯২৬টি পদের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অর্থ মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে মৎস্য সেক্টরের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গতির সঞ্চার হবে।

ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে মধ্য পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মৎস্য খামার, মৎস্য খাদ্য কারখানা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, এনজিও ইত্যাদিতে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে দক্ষ ও হাতে-কলমে জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চাঁদপুরে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি বছর ২৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১১৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩-এ প্রথম ব্যাচের

শিক্ষার্থীগণ ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। কর্মসংস্থান ও মৎস্য সেক্টরের মধ্য পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার কর্তৃক গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় আরো তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী চারটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট-এ প্রতি বছর ৪০ জন করে মোট ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে।

১৫. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ই-এক্সটেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০টি চাষি পরামর্শ কেন্দ্র (সিয়াক) ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্মিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মহাসড়কে গ্রামীণ চাষিদের সম্পৃক্তকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশব্যাপী মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদানের নিমিত্ত ডেটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় এ কর্মসূচি দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান করে তুলবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

১৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ বছরে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১,৪৯১.৬১ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১৪-১৫ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক।

সারণি: বিগত ৫ বছরে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (টি)	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২০০৮-০৯	১৮	৭৯.০৫	৭৪%
২০০৯-১০	২২	১১৩.৩৯	৮৮%
২০১০-১১	২৩	১৩৫.৪৭	৯৫%
২০১১-১২	২৮	১৯৪.১০	১০০%
২০১২-১৩	২৭	১৫৩.৩৭	১০০%
২০১৩-১৪	২৬	২১৭.৬১	১০০%

বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- জলজ পরিবেশ জলাশয় সংস্কার ও অভয়াশ্রম স্থাপন
- প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ
- বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনা
- মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা
- প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
- উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন
- বঙ্গোপসাগরে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স পদ্ধতির জোরদারকরণ
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ
- মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ, খাস জলাশয়সমূহ জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণ, সকল ধরনের জলজ সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৭.০৩ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের দায়িত্বশীল উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ঃ সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্য
BFRI in Fisheries Development : Recent Research Activities and Achivements

প্রফেসর ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী

Abstract

Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) is the government mandated institution to conduct fisheries research and to develop need-based aquaculture and fisheries technologies. The institution has innovated so far 50 aquaculture and fisheries technologies through on-station and on-farm research that helps to enhance fisheries productivity in manifolds. Very recently BFRI has developed the technology of producing Rice Pearl from the freshwater mussels. In the mean time, the institute achieved remarkable success in induced breeding of seven endangered fish species, viz. bata, sarpunti, bhagna, kalibaush, gonia, mohashol and mini; and six catfish species like pabda, gulsha, singh, magur, gujji and native pangas. Artificial breeding of a delicious exotic carp named crucian carp imported from China is also another success story of the institute. Research is underway to develop a suitable induced breeding technique of indigenous chital and cuchia. In order to solve the inbreeding problem of exotic thai pangas, BFRI has imported wild stock from Vietnam and produced almost 90 thousand fingerlings by using rotational breeding protocol. These fingerlings will be distributed to the potential government and private hatcheries for the production of broodstock. The brackish water centre also made a success in artificial breeding of parshe (*Chelon subviridis*). BFRI identified new breeding and feeding ground in the Meghna River for establishing the 6th Hilsha sanctuary. The institute also identified some commercially valuable sea weed bed in the Bay of Bengal and trying to develop their culture technique. This write up details some made on basis of success so far achieved and ongoing research programme of BFRI.

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মৎস্যখাতের উন্নয়নে জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রামীণ আত্ম-কর্মসংস্থান ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মৎস্যচাষ বাংলাদেশে মৎস্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিপ্লবের সূচনা করেছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক তথা প্রায় ১.৭১ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্তমানে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালে মৎস্য উৎপাদন ছিল ২১.০২ লক্ষ মে.টন যা ২০১২-১৩ আর্থিক সালে প্রায় ৩৪.১০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

আগামি ২০২০-২১ সালে মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করেও প্রায় ২.০ লক্ষ মে.টন রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় চাহিদার নিরিখে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত মৎস্য প্রজনন, চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৫০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ যাবৎ বিএফআরআই উদ্ভাবিত রুই, রাজপুঁটি, গিফট তেলাপিয়া ও কৈ দেশীয় প্রজাতির তুলনায় যথাক্রমে ১৫%, ৩৫%, ৬৬% ও ৪৫% অধিক উৎপাদনশীল। এ সকল উন্নত জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে আমাদের হ্যাচারির সংখ্যা, মৎস্য উদ্যোক্তার সংখ্যা, সর্বোপরি মৎস্য চাষির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে স্বল্প দামে মাছ ক্রয় করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রম ও অগ্রগতি
(Recent Research Activities and Progress)

স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন কার্যক্রম
(Pearl Production Activities- Freshwater Mussels)

আমাদের দেশে পূর্বে প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর পরিমাণ মুক্তা উৎপাদিত হতো। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয় এবং অতিরিক্ত ঝিনুক আহরণের ফলে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আমাদের দেশের জলবায়ু মুক্তাচাষ উপযোগী এবং দেশে রয়েছে বিপুল পরিমাণ জলরাশি যেখানে স্বাদুপানির মাছের সাথে সহজেই মুক্তাচাষ করা সম্ভব। এছাড়াও বাংলাদেশের উষ্ণ আবহাওয়া ঝিনুকের বৃদ্ধি ও মুক্তাচাষের অনুকূল। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ১৯৯৯ সাল থেকে মুক্তা

ছবি: ইমেজ পার্ল

চিত্র: ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত মুক্তা

চাষের ওপর গবেষণা করে আসছে। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটের গবেষণা পুকুরে মুক্তাচাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রণোদিত পদ্ধতিতে ৫ মাসে ৩-৫ মিমি আকৃতির মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। উৎপাদিত মুক্তার আকার ছোট যা রাইস পার্ল নামে পরিচিত। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক মুক্তা চাষের জন্য মুক্তার আকার, আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির বিষয়ে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে মুক্তা চাষ গবেষণার জন্য ইনস্টিটিউটে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মুক্তা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে গ্রামীণ মহিলাদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, ক্ষমতায়িত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু, স্বাদুপানির মাছের সাথে বাড়তি ফসল হিসেবে মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা

(Reserach on Breeding and Conservation of Endangerd Species)

ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে নব্বই এর দশক থেকে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ওপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে ৭ প্রজাতির বিপন্ন প্রজাতির মাছ, যেমন- বাটা, সরপুঁটি, ভাগনা, কালিবাউস, গনিয়া, মহাশোল ও মেনি এবং ৬ প্রজাতির ক্যাটফিস যথা- পাবদা, গুলশা, শিং, মাগুর, গুজি ও দেশি পাঙ্গাস মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে বিলুপ্তপ্রায় চিতল ও কুচিয়ার কৃত্রিম প্রজননের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে চিতল মাছের নিয়ন্ত্রিত প্রজননে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ইনস্টিটিউটের সান্তাহার উপকেন্দ্রে আবদ্ধ পরিবেশে কুচিয়ার প্রজননেও প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে চিতল ও কুচিয়ার প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ছবি: কুচিয়া

ক্রুসিয়ান কার্প মাছের প্রজনন ও চাষ কৌশল

[Breeding and Culture Technique of Crusian Carp]

ক্রুসিয়ান কার্প প্রধানত চীনের মাছ হলেও বর্তমানে সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। মাছটি ২০১০ সালে চীন থেকে প্রথম বাংলাদেশে আনা হয়। সারা বিশ্বের মোট চাষকৃত মাছের ৭.৪% আসে ক্রুসিয়ান কার্প হতে। মাছটি সুস্বাদু, দ্রুত বর্ধনশীল ও কষ্টসহিষ্ণু এবং ৪ থেকে ৫ মাসে খাওয়ার উপযোগী হয়।

ছবি: ক্রুসিয়ান কার্প ব্রুড

ছবি: ক্রুসিয়ান কার্প পোনা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এ মাছের প্রজনন ও চাষ কৌশল নিয়ে গবেষণা করছে এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মাছটির কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন করে। বর্তমানে মাছটির সর্বোত্তম চাষ কৌশল নিয়ে গবেষণা চলছে। আগামি বছর মাছটি চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। আশা করা যাচ্ছে আগামি ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার পাশাপাশি ক্রুসিয়ান কার্প বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় ও লাভজনক মাছ হিসেবে পরিগণিত হবে।

পাঙ্গাস মাছের জাত উন্নয়ন
(Genetic Improvement of Pangas)

পাঙ্গাস ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড থেকে প্রথম বাংলাদেশে আনা হয়। ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম ইনস্টিটিউটে প্রজননে সফলতা অর্জিত হয়। ব্যাপক পোনা উৎপাদনের ফলে দ্রুত এ মাছটি চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন হ্যাচারি থেকে বর্তমানে প্রয়োজনীয় পোনার ৯০শতাংশে সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু একই স্টকের মাছ বছরের পর বছর ব্যবহার করার ফলে মাছের বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১০ সালে থাইল্যান্ড থেকে মাছটির ওয়াইল্ড স্টক সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ২০১১ সালে ভিয়েতনাম থেকে মাছটির ওয়াইল্ড স্টক সংগ্রহ করা হয়। বিগত বছরে রোটেশনাল ব্রিডিং পদ্ধতির মাধ্যমে থাইল্যান্ড থেকে আনা মাছের ৯০ হাজার পোনা উৎপাদন করা হয়েছে যা বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হ্যাচারিতে ব্রুড স্টক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে ফলে পাঙ্গাসের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও আগামি বছরে ভিয়েতনাম থেকে সংগৃহীত পাঙ্গাসের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

পারশে মাছের পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন
(Development of Breeeding Technique of Parshe)

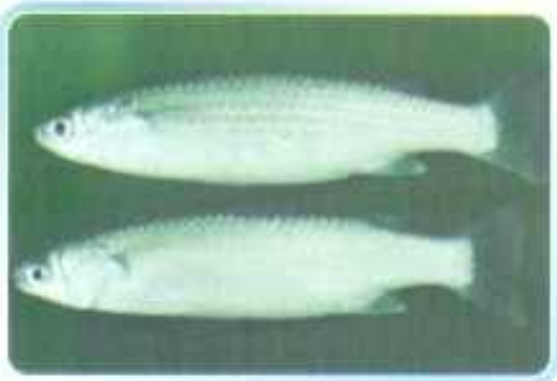

পারশে, *Chelon subviridis* (Val. 1836) লোনাপানি অঞ্চলের অতি সুস্বাদু, জনপ্রিয় এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাছ। অতীতে প্রাকৃতিক জলাশয়ে এবং চিংড়ি ঘেরে এ মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু নির্বিচার আহরণ ও পরিবেশগত কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে এ মাছের প্রাপ্যতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সুস্বাদু হওয়ায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় ক্ষেত্রে এ মাছ চাষের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে সাধারণত শীত মৌসুমে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) এ মাছ অধিক লবণাক্ত পানিতে সমুদ্রে প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে এবং পোনা পরবর্তী সময়ে কম লবণাক্ত অঞ্চলে অভিপ্রয়াণ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে লোনাপানির এ গুরুত্বপূর্ণ মাছের সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র এর বিজ্ঞানীগণ পারশে মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ নিরলস গবেষণার মাধ্যমে গত শীত মৌসুমে কৃত্রিম প্রজননে সাফল্য লাভ করেছে। গোনাডোট্রপিন অবমুক্তকারী হরমোন অ্যানালগ (S-GnRHa) প্রয়োগের মাধ্যমে এ মাছকে সফলভাবে প্রজনন করানো হয়েছে।

ছবি: পারশে ব্রুড মাছ

পরিপক্ক পারশে মাছ তৃণভোজী হলেও ডিম হতে প্রস্ফুটিত পোনার ডিম্বথলি নিঃশেষ হওয়ার পর পোনার প্রাথমিক খাদ্য হিসেবে অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত প্রাণিকণা খেয়ে এরা বড় হয়ে ওঠে। তাই হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের পূর্বে পারশে মাছের পোনার ভক্ষণোপযোগী অতি ক্ষুদ্র প্রাণিকণার চাষ এবং এই প্রাণিকণার খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য এককোষী উদ্ভিদকণা *Nannochloropsis* sp. (Hibberd, 1981) এর চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা হয়েছে

ছবি: পারশে মাছ এবং উৎপাদিত পোনা

পারশে মাছের পোনা উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন সাফল্য এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য লোনাপানির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ অব্যাহত রয়েছে। পোনা উৎপাদন পরবর্তী এসব মাছের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হলে উপকূলীয় ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষের পাশাপাশি পারশে মাছ চাষ করা সম্ভব হবে এবং এতে উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে

ইলিশ ও জাটকার নতুন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রম চিহ্নিতকরণ (Identification of Newly Proposed Sanctuary for Jatka and Hilsa)

ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে জাটকার প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে জাটকার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট, হরিনাথপুর পয়েন্ট, ধুলখোলা পয়েন্ট এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গালিয়া পয়েন্ট অঞ্চলে মেঘনার শাখা নদী হিজলা উপজেলার ধর্মগঞ্জ ও নয়াভাঙ্গানী নদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কালাবদর নদীর ৮০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশ/জাটকার বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে নতুন (৬ষ্ঠ) অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন ঘোষণাযোগ্য এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা নির্ধারণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে এ নতুন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা সন্নিবেশিত করা হলো। বিগত তিন বছরের পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিকভাবে জাটকার প্রাচুর্য এবং পানির গুণাগুণসহ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সকল বৈশিষ্ট্য পূরণ হওয়ায় এ অঞ্চলকে অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, প্রস্তাব গৃহীত হলে এটি ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম হিসেবে পরিগণিত হবে।

সারণি: মেঘনার শাখা নদীতে বরিশালের হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ অঞ্চলে প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রমের সীমানা এবং প্রস্তাবিত মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

সীমানা		জিপিএস পয়েন্ট	মোট আয়তন	মাছ ধরার নিষিদ্ধকালীন সময়
উত্তর-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গানী নদী)	২৩°০২.৭৫' উত্তর অক্ষাংশে, ৯০°৩৩.৭৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে	৮০ (আশি) কিমি	মার্চ - এপ্রিল
উত্তর-পশ্চিম	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গানী নদী)	২২°৫৮.৬৭' উত্তর অক্ষাংশে, ৯০°২৭.৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে		
দক্ষিণ-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার ধুলখোলা পয়েন্ট (ধর্মগঞ্জ নদী)	২২°৫১.৯১' উত্তর অক্ষাংশে, ৯০°৩৭.৫২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে		
দক্ষিণ-পশ্চিম	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গালিয়া পয়েন্ট (গজারিয়া নদী)	২২°.৪৭.৪৩ উত্তর অক্ষাংশে, ৯০°২৬.১৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে		

সামুদ্রিক শৈবালের চাষ ও ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা (Research on Culture and Use of Seaweed)

ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র কক্সবাজারে বাঁকখালী নদীর মহেশখালী চ্যানেলের নুনিয়ারছড়া থেকে নাজিরারটেক পর্যন্ত সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন জোয়ার-ভাটা এলাকায় ও মহেশখালী দ্বীপে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক শৈবালের (seaweed) প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষেত্রের (natural seaweed bed) সন্ধান লাভ করেছে। ইতোমধ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপে হরাইজন্টাল নেট পদ্ধতি ব্যবহার করে সামুদ্রিক শৈবালের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। চাষ প্রযুক্তির জন্য নির্বাচিত সামুদ্রিক শৈবালের প্রজাতিগুলো হলো- *Sargassum oligocystum*, *Enteromorpha intestinalis*, *Padina tetrastromatica*, *Caulerpa racemosa* ও *Hypnea musciformis*. সামুদ্রিক শৈবাল উন্নত খাদ্যমান ও ঔষধি গুণসম্পন্ন, জিলেটিন ও প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থসমৃদ্ধ যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশ, শারীরিক-মানসিক সুস্থতার জন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রসাধন শিল্পেও সামুদ্রিক শৈবাল ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে কোনো খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ সামুদ্রিক শৈবাল পাউডার বা সিদ্ধ করা সামুদ্রিক শৈবালের তরল নির্যাস সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করে খাদ্য উপাদানের (স্যুপ, আচার, সালাদ, চানাচুর, বুন্দুলস ইত্যাদি) পুষ্টিমান উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ছবি: সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সি উইড গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ এর ফলে মৎস্য উৎপাদন বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দেশের মানুষের চাহিদার নিরিখে উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে অধিকতর গবেষণার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির জাত উন্নয়ন, উপযুক্ত চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, জলাশয়ের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এর পাশাপাশি বিপুল জলরাশির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অপ্রচলিত জলজ পণ্য যেমন- কাঁকড়া, কুচিয়া, সী-উইড এবং ঝিনুকে মুক্তার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইনস্টিটিউট এ সকল বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমে গ্রহণ করেছে যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে আশা করা যায়।

পোনা মাছের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ ঃ বিবেচ্য বিষয় ও করণীয়

Genetic Quality of Fish Seeds : Considerations and Measures

ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ

Abstract

Fish seed quality refers to both genetic and non-genetic aspects. While the genetic aspects are the innate biological factors involving concepts and roles of the genetic materials per se and implicate biological considerations, non-genetic ones are the environmental factors consisting of the management of feeding, fertilization, water quality, soil quality, disease and various other physical and chemical parameters. Though both the factors are important, the non-genetic factors if go wrong they can be made good of, however, if genetic factors are damaged or lost, they are irreversible. So enough care must be taken to maintain the genetic factors together with the non-genetic ones as well. The principal genetic causes for quality degradation viz., inbreeding, genetic drift, negative selection and introgressive hybridization have been discussed.

কৌলিতত্ত্বের ইতিহাস বেশ লম্বা এবং এ ইতিহাস এমনকি মানুষের সভ্যতার গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যাবত কৌলিতত্ত্ব মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জীববিজ্ঞানে আজকাল যত চমকপ্রদ আবিষ্কার এবং অর্জনের কথা শোনা যায় আসতে সে সবের গোড়াতে কৌলিতত্ত্বের অবদান নিহিত আছে। মাছের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞানের প্রয়োগ মৌলিকত্ব থেকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। কৌলিতত্ত্বের প্রায়োগিক বিষয়গুলো হচ্ছে- কৌলিতাত্ত্বিক নির্বাচন, সংকরায়ন, সেক্স ম্যানুপুলেশন, ক্রোমোজোম সেট ম্যানুপুলেশন এবং জিন স্থানান্তর প্রযুক্তি। প্রজনন হচ্ছে কৌলিতত্ত্বের প্রায়োগিক ক্ষেত্র। অথচ পরিবেষ্টিত প্রজননই আসলে মাছের জেনেটিক গুণাগুণ তথা জেনেটিক বৈচিত্র্য অবলোপনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। চাষের জন্য যখনই কোন প্রজাতিকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন তথা চাষ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা হয় তখনই ঐ প্রজাতির জেনেটিক বৈচিত্র্য তথা নানা গুণাগুণ লোপ পেতে শুরু করে। সে হিসেবে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা তথা পোনা উৎপাদনে জেনেটিক জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে না পারলে চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেমন আর সম্ভব হয় না তেমনি প্রাকৃতিক পপুলেশনের মধ্যেও জেনেটিক ব্যবস্থাপনা বাড়ানো প্রয়োজন যাতে চাষের ক্ষেত্রে জিন পুলের ক্রমঅগ্রসরবরাহের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করা যায়।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে মাছ চাষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। চাষের জন্য নিয়োজিত প্রজাতির সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি একর প্রতি মাছ উৎপাদনের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্যাচারি থেকে পোনা উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষতাও সাধিত হয়েছে। বর্তমানে পোনার মোট চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ১,০০০টি হ্যাচারি থেকে উৎপাদিত পোনা থেকে মেটানো হচ্ছে। সরকারও এ বিষয়ে তাদের সম্প্রসারণ কার্যক্রম যথেষ্ট জোরদার করেছে। কৃষির যে কোন চাষ কাজে উন্নতমানের বীজের কোনো বিকল্প নেই। ভাল গুণগতমান বলতে জেনেটিক ও নন-জেনেটিক উভয় গুণাগুণকেই বুঝায়। জেনেটিক বিষয়টি বলতে জীবের নিরেট ভেতরকার জৈবিক গুণাগুণকে বুঝায়। এ সব গুণাগুণ বৈচিত্র্যময় জিনের সমাহারে জীবের পপুলেশনের মধ্যে প্রকাশ পায় যেমন বর্ধনহার, ডিম পাড়ার হার, রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি। হ্যাচারি ও মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার নানা বিষয় যেমন ব্রুড মাছের পুষ্টি, পুকুরে সার প্রয়োগ, পানি ও মাটির গুণাগুণ, নানারকম রাসায়নিকের ব্যবহার, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় নন-জেনেটিক বিষয়ের আওতাভুক্ত। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নন-জেনেটিক বিষয়ে ঘাটতি হলে ব্যবস্থাপনার মান বাড়িয়ে তা অনায়াসেই পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু জেনেটিক বিষয়ে কোনো ক্রমে ঘাটতি হলে সে ক্ষতি আর পুষিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। হ্যাচারিতে পোনা মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত জেনেটিক ও নন-জেনেটিক উভয় বিষয়েই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে সব জেনেটিক বিষয়ে দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে পোনার গুণগতমান হ্রাস পায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding)

প্রজননের জন্য ব্যবহৃত ব্রুড মাছ যদি বংশ সূত্রে ঘনিষ্ঠ হয় তবে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটালে তা অন্তঃপ্রজনন বলে বিবেচিত হবে এবং উৎপাদিত পোনা মাছ অন্তঃপ্রজনিত হবে। অর্থাৎ তাদের জিনের বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কেন হয় এবং কীভাবে হয়? বংশসূত্রে ঘনিষ্ঠ হওয়ার অর্থই হচ্ছে ঐ সব ব্রুড মাছ তাদের কূল ইতিহাসের কোনো না কোনো স্তরে একক পিতামাতার প্রেক্ষিতে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ফলে তাদের জিন পুলে একই রকম জিনের সমাবেশ বিদ্যমান থাকে। তাই তাদের দ্বারা সৃষ্ট সন্তানের মধ্যে ঐ সব জিনের সমসংকৃতা (homozygosity) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে উৎপাদিত পোনায় জিনের বৈচিত্র্যও হ্রাস পায়। অন্তঃপ্রজনন প্রতিরোধ করতে হলে হ্যাচারিতে ব্যবহৃত ব্রুড মাছের সংখ্যা বেশি মাত্রায় রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে মাছগুলো যেন

বংশসূত্রে সম্পর্কযুক্ত না হয় অর্থাৎ তাদের কূল ইতিহাস জানা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রজননের বেলায় যৌনানুপাত ১ : ১ মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইফেক্টিভ ব্রিডিং নাম্বার (N_e) এর মতবাদ মেনে চলতে হবে।

চাষের জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশেষভাবে কাম্য যেমন বর্ধনহার, রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা কিংবা ডিমপাড়ার হার, অন্তঃপ্রজনন সংঘটিত হলে তা সাংঘাতিকভাবে লোপ পায়। শুধু তাই নয় এভাবে বারবার কয়েক বংশ ধরে অন্তঃপ্রজনন সংঘটিত হলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে এবং তখন তাকে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন (inbreeding depression) বলা হয়।

মাছের প্রাকৃতিক পপুলেশনে অনেক রিসেসিভ অ্যালিল ঐ জিনের ডমিনান্ট অ্যালিলের ক্রিয়ায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ঐ সকল রিসেসিভ অ্যালিল আদতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না অথচ ব্রুড মাছের ঘনিষ্ঠতার কারণে উৎপাদিত পোনা মাছে ঐ সব জিনের সমসত্ত্বতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের বৈশিষ্ট্য পোনা মাছে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা মাছের গুণগত গুণাগুণ বিষয়ে চাষিদের কাছ থেকে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায়। আসলে হ্যাচারি ও ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নন-জেনেটিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে জেনেটিক জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ না ঘটানোর ফলে উৎপাদিত পোনার মধ্যে অন্তঃপ্রজনন রোধ করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

জেনেটিক ড্রিফট (Genetic Drift)

জেনেটিক ড্রিফট হ্যাচারি পরিচালনার ক্ষেত্রে আর একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়া যা হ্যাচারি পপুলেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে। হ্যাচারির জন্য কোনো প্রাকৃতিক উৎস থেকে কিংবা কোনো ব্রুড ব্যাংক থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করার সময় যদি মাছ যথাযথভাবে নির্বাচন করা না হয় অর্থাৎ ঐ সকল মাছ যদি যথাযথভাবে প্রাকৃতিক উৎসের বা ব্রুড ব্যাংকের পপুলেশনকে প্রতিনিধিত্ব না করে তবে ঐ সব মাছে জেনেটিক ড্রিফট সংঘটিত হবে এবং তাহলে তাদের দ্বারা উৎপাদিত পোনা মাছে অন্তঃপ্রজনন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। ব্যাপারটি এমন, প্রাকৃতিক পপুলেশনে সব ধরনের জিন সমানুপাতে বিদ্যমান থাকে না। এমন অনেক জিন আছে যেসব জিন খুব কম ফ্রিকোয়েন্সিতে পপুলেশনে বিদ্যমান থাকলেও তারা অনেক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক কাজ সম্পাদন করে। তাই কম সংখ্যায় ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা হলে ঐসব কম ফ্রিকোয়েন্সির জিন সংগৃহীত ব্রুড পপুলেশন থেকে বাদ পড়ে যায়। ফলে তাদের থেকে উৎপাদিত পোনা মাছ ভাল ফলাফল দিতে পারে না। জেনেটিক ড্রিফট প্রতিরোধ করতে হলে ব্রুড মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

অন্তঃপ্রজনন ও জেনেটিক ড্রিফট রোধে সহজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Easy Management Procedures for Prevention of Inbreeding and Genetic Drift)

ক. মাঝে মাঝেই, অন্তত আংশিক হলেও, হ্যাচারির মাছ প্রাকৃতিক উৎস কিংবা অন্য হ্যাচারির মাছের দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

মৃগেল ও রুই মাছের হাইব্রিড

অন্তঃপ্রজননজনিত দৈহিক বিকলাঙ্গতা

মৃগেল ও কাতলা মাছের হাইব্রিড

রুই ও কাতলা মাছের হাইব্রিড

রুই ও গনিয়া মাছের হাইব্রিড

কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন কাতলা মাছ

ঘ. বিভিন্ন বয়সের ব্রুডস্টক এক সঙ্গে প্রজনন করাতে হবে এতে জেনেটিক ড্রিফট ঠেকানো সম্ভব হবে।

ঙ. ব্রুড মাছের কুল ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে মাছের সম্পর্কীয়তা জানা যায় এবং অন্তঃপ্রজনন রোধ করা যায়।

চ. ক্রায়োসংরক্ষিত শুক্রাণু ব্যবহারের মাধ্যমে জিনের বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে।

ছ. হ্যাচারিতে বিভিন্ন প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন লাইন সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে জেনেটিক বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে।

ঋণাত্মক নির্বাচন (Negative Selection)

বাংলাদেশের কার্পের হ্যাচারিসমূহে উৎপাদিত পোনা মাছে ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়। পূর্বে রুই-কাতলা এবং চাইনিজ কার্পের ব্রুড মাছের গড় ওজন অনেক বেশি পাওয়া গেলেও বর্তমানে ঐ সব প্রজাতির ব্রুড মাছের গড় ওজন অনেক কমে গেছে। ঋণাত্মক নির্বাচন যে কোনো বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হতে পারে এবং বাংলাদেশে ব্রুড মাছের গড় ওজন হ্রাসের সম্ভবত আগাম (early) প্রজনন মৌসুম এবং আগাম পরিপক্কতার পক্ষে ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটে থাকে তা হলো- হ্যাচারি মালিকগণ হরমোন খরচ বাঁচানোর জন্যই হোক কিংবা ছোট আকারের ব্রুড মাছ নাড়াচাড়ার সুবিধার কারণেই হোক, তারা ছোট অথচ পরিপক্ক ব্রুড মাছ প্রজননের জন্য নির্বাচন করে। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত ব্রুড মাছের পপুলেশনের ক্ষেত্রে এভাবে অনেক বংশ ধরে ছোট ব্রুড মাছ প্রজনন করানোর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া ছোট আকারের অনুকূলে প্রভাবিত হয়েছে। এ ঘটনাটি হ্যাচারি মালিকগণের অজান্তেই সংঘটিত হয় বিধায় একে Unintentional Selection বা Inadvertent Selection বলা হয়ে থাকে।

আগাম প্রজনন মৌসুম এবং আগাম পরিপক্কতার অনুকূলে ঋণাত্মক নির্বাচন এভাবে সংঘটিত হয়েছে যে, যেহেতু এ দেশে বর্ষার সাথে মাছ চাষের একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তাই এপ্রিল-মে মাসে নতুন বৃষ্টির পানি এলে যখন পোনার চাহিদা বেড়ে যায় হ্যাচারি মালিকরা তখন উচ্চ বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য কেবল মৌসুমের শুরুতেই হ্যাচারি পরিচালনা করে থাকেন এবং এতে যদি ভাল ব্যবসা হয়ে যায় তবে মৌসুমের বাকি সময় তারা আর হ্যাচারি পরিচালনা করেন না। এতে দেখা যায় আগাম প্রজনন মৌসুম এবং আগাম পরিপক্কতার পক্ষেই কালক্রমে বংশে ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, আজকাল হ্যাচারিগুলোতে সারা মৌসুম জুড়ে প্রজনন করার মত পরিপক্ক মাছ তেমন পাওয়া যায় না।

ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হওয়া রোধের উপায় (Measures to be taken for Preventing Negative Selection)

ক. সকল বয়সের এবং সকল আকার-আকৃতির মাছ প্রজনন করাতে হবে।

খ. সারা প্রজনন মৌসুম জুড়ে মাছ প্রজনন করাতে হবে।

গ. যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মাছ প্রজনন করাতে হবে।

[illegible]

ইন্ট্রোগ্রেসিভ সংকরায়ন (Introgressive Hybridization)

যখন পর্যায়ক্রমে দু'টি প্রজাতির মধ্যে প্রজনন সংঘটিত হয় তখন তাকে সংকরায়ন বলা হয়। প্রকৃতিতে দু'টি পৃথক প্রজাতির মধ্যে সহজে প্রজনন সংঘটিত হয় না। কিন্তু মানুষ তাদের নিজের সুবিধা এমনকি খেয়াল-খুশি মত কৃত্রিম পদ্ধতিতে সংকরায়ন করে থাকে। রুই-কাতলা এবং চাইনিজ কার্পের মধ্যে বিশেষ করে সিলভার কার্প এবং বিগহেড কার্পের মধ্যে সংকরায়নের নজির পাওয়া গেছে। এ দেশে হ্যাচারিসমূহে এ রকম উদাহরণ রয়েছে যে, পোনা উৎপাদনের মৌসুমের শেষের দিকে যখন একই প্রজাতির পুরুষ এবং স্ত্রী মাছ পাওয়া যায় না তখন এক প্রজাতির ডিমের সাথে অন্য প্রজাতির শুক্রাণু মিশিয়ে প্রজনন ঘটিয়ে সংকর পোনা উৎপাদন করে ক্রেতাদেরকে ঠকানো ব্যবস্থা করা হয়। এটি কিছুতেই ঠিক নয়। কারণ যদিও আন্তঃপ্রজাতি সংকর মাছ প্রায় সব সময়ই বন্ধ্যা হয়ে থাকে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ প্রজাতি দুটি যদি জেনেটিকভাবে কাছাকাছি হয় তবে তাদের মধ্যেকার সংকর বন্ধ্যা না হয়ে বরং উর্বর হতে পারে এবং তা যদি হয় তবে ঐ উর্বর সংকর দুই প্রজাতির সাথেই ব্যাক ক্রস (back cross) করাতে পারে কিংবা তারা নিজেরাই একটি পৃথক লাইন সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ হলে প্রকৃতিতে জিন পুলের বিশাল ক্ষতি হতে পারে। প্রাকৃতিক পপুলেশনের বাসস্থান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই হ্যাচারিতে সজ্ঞানে অপরিকল্পিতভাবে সংকরায়ন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তবে পরিকল্পিত উপায়ে একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন স্টক বা স্ট্রেইন সংকরায়ন করে হাইব্রিড ভিগোর উৎপাদনের মাধ্যমে পোনা মাছের গুণগতমান বাড়ানো যেতে পারে। এ সকল অন্তঃস্টক বা স্ট্রেইন সংকর উর্বর হলেও ব্যাক ক্রস বা পৃথক লাইন সৃষ্টি হলেও জিন পুলের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

উপসংহার (Conlusion)

পোনা মাছের জেনেটিক গুণাগুণ একটি বিশেষ দরকারি বিষয়। জেনেটিক্স একটি জটিল বিষয় হলেও মাছ চাষের ক্রমাগত উন্নতি সাধন করতে হলে পোনা মাছ উৎপাদনে জড়িত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে নিবিড় জেনেটিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সুস্থ ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ছাড়া ভাল ফসল কখনো উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

আন্তর্জাতিক বিধিবিধান ঃ বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবস্থাপনায় এর প্রাসঙ্গিকতা

International Rules and Regulations : Relevance to Fisheries Management in Bangladesh

ড. যুগরাজ সিং যাদব*, ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন ও রাজদীপ মুখার্জী*

Abstract

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is a landmark international agreement that has allowed the countries to move from the 'freedom of the seas' concept to a responsible exploitation of one of the largest common global resources. Presently, many international instruments, both binding and non-binding regulate and or provide guidelines to protect the marine resources form degradation and sustainably exploit its wealth, mainly the fisheries resources. Besides UNCLOS, some other the key international instruments are the UN Fish Stock Agreement (UNFSA), the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS); RAMSAR Convention, Convention on Biological Diversity (CBD); and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Having committed to the protection of the environment and sustainable use of marine resources, the Government of Bangladesh has ratified huge number of such international instruments, including those mentioned above. As obligations under these instruments, the Government is also committed to comply with the provisions contained in these instruments. This article aims at creating awareness on some of the important international instruments to which Bangladesh is a party.

পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি মানুষ মৎস্যসম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মৎস্যচাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। অতীতে 'সামুদ্রিক সম্পদ উন্মুক্ত' প্রচলিত এ ধ্যান-ধারণায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সকলের জন্য উন্মুক্ত হিসেবে বিবেচিত হত। শিল্পের আধুনিকায়নের সাথে সাথে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে বৃহদাকার যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান নিয়োগ করে। তবে এ একচ্ছত্র অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় সদস্য দেশসমূহ সমুদ্র নিজস্ব রাষ্ট্রীয় জলসীমার পরিধি নির্ধারণ এবং উক্ত সীমানার মধ্যে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করে। সম্ভবত এ প্রয়োজনীয়তাটি বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ডি জেমস হার্ডিন (G James Hardin) কর্তৃক ১৯৬৮ সালে Science পত্রিকায় 'Tragedy of the Commons' নামক প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে আরো নতুন মাত্রা প্রাপ্ত হয়। তৎকালীন সময়ে নিজস্ব স্বার্থে মৎস্য আহরণ ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিণামদর্শী উন্নয়ন তথা অতি-আহরণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ধ্বংসের সম্ভাবনা এবং বিজ্ঞানী হার্ডিন এর বিশ্লেষণে প্রদর্শিত অনিয়ন্ত্রিত ও উন্মুক্ত সম্পদের পরিণতির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ উদ্যোগ এবং জাতিসংঘে আরও বেশ কিছু বিতর্কের কারণেই সুদূরপ্রসারী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন প্রণীত হয়, যা সংক্ষেপে UNCLOS নামে পরিচিত।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। তবে তা অবশ্যই অক্ষয়ন্ত নয়। ইতোমধ্যেই অতিআহরণের ফলে বেশ কিছু মৎস্য প্রজাতির মজুদ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং অনেক প্রজাতিই বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের প্রবর্তন এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান হুমকির ফলে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামুদ্রিক পরিবেশ এবং মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। এ স্বীকৃতির ফলশ্রুতিতে মৎস্য ও পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক বেশ কিছু আন্তর্জাতিক আইন, বিধি, সমঝোতা ও চুক্তি প্রণীত হয়েছে যা সকল রাষ্ট্র, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবীদের নিকট সমভাবে গ্রহণযোগ্য। এগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন-১৯৮২ (United Nations Convention on the Law of the Sea-1982), জাতিসংঘের মৎস্য মজুদ এগ্রিমেন্ট-১৯৯৫ (UN Fish Stock Agreement-1995), রামসার কনভেনশন-১৯৭১ (RAMSAR Convention-1971), কনভেনশন অন বায়োলোজিকাল ডাইভারসিটি-১৯৯২ (Convention of biological Diversity-1992), বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন-১৯৭৩ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-1973), অভিপ্রায়শীল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন-১৯৭৯ (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals-1979) ইত্যাদি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রণীত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (Code of Conduct for Responsible Fisheries-CCEF) যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং বাধ্যবাধকতামূলক নয় এবং মৎস্য বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন সনদ।

সামুদ্রিক পরিবেশ এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সনদ বা চুক্তিসমূহে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে এবং সে মতে ধারা বা উপধারায় বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে উক্ত বিধি-বিধানসমূহের ইতিহাস, পরিধি এবং জাতীয় পর্যায়ে এর গুরুত্ব সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো।

ক. আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন

(United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সমুদ্রবেষ্টিত কিছু দেশ মৎস্যসম্পদ রক্ষার পাশাপাশি খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন বা সংগ্রহ এবং সমুদ্র দূষণ রোধকল্পে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উদ্যোগ গ্রহণের আশা পোষণ করছিল এবং ফলশ্রুতিতে লিগ অব নেশনস কর্তৃক ১৯৩০ সালে হেগ সম্মেলনে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সমুদ্রে মহীসোপান এলাকা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকারে রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জেনেভায় সমুদ্র আইনের ওপর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা UNCLOS-I নামে পরিচিত। এ সম্মেলনের সাফল্য হলো টেরিটোরিয়াল সী (territorial sea), মহীসোপান (continental self), গভীর সমুদ্র (high seas) এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ও জীবিত সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়গুলোতে মতৈক্যে পৌঁছানো।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক সমুদ্র আইনের ওপর দ্বিতীয় সম্মেলন (UNCLOS-II) অনুষ্ঠিত হলেও নতুন কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে নিউইয়র্কে ১৬০টির অধিক দেশের অংশগ্রহণে সমুদ্র আইনের ওপর তৃতীয় সম্মেলন (UNCLOS-III) অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনের ধারাবাহিকতা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সে কারণে এটি সমুদ্র আইন ১৯৮২ নামে অভিহিত হয়ে থাকে এবং তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাস হতে সকল সদস্য দেশের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কনভেনশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- ভৌগোলিক সীমারেখা, নৌপথ, দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান এবং পরিবহন, একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা, মহীসোপানের বিস্তৃতি, গভীর সমুদ্রে খনিজ আহরণ, সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিরোধ মিমাংসা এই মত বিষয়গুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা সমুদ্রসীমা এবং সম্পদের সংরক্ষণ, অধিকার এবং অংশ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলো হলো:

- মোহনা/খাড়ি (Estuary): যে বিস্তীর্ণ এলাকায় সাগরের লবণাক্ত ও নদীর স্বাদুপানি মিশে এবং জোয়ার-ভাটার ক্রিয়া সুস্পষ্ট তাকে মোহনা বলে। এছাড়া স্থলভাগ দ্বারা আংশিকভাবে আবদ্ধ সমুদ্রের ছোট অংশকেও মোহনা বলে।
- অভ্যন্তরীণ জলসীমা (Internal Water): ভটরেখা বরাবর ভূভাগ সংলগ্ন সকল জলাভূমি, জলপথ এবং সমুদ্রের দিকে ১০ ফাদম গভীরতা পর্যন্ত এলাকা অভ্যন্তরীণ জলসীমা নামে অভিহিত। উক্ত এলাকায় উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে প্রণীত আইন প্রয়োগের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং কোনো বিদেশি জাহাজ উক্ত সীমানা অতিক্রমের অধিকার সংরক্ষণ করে না।
- রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Territorial Water): বেইজলাইন হতে সমুদ্রের দিকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকাকে রাষ্ট্রীয় জলসীমা বলা হয়। উক্ত এলাকার ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ আইন প্রণয়ন এবং সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। উক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে বিদেশি বেসামরিক জাহাজ তাদের নিজস্ব ও যে রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করবে সে দেশের পতাকা উত্তোলন করে চলাচল করতে পারবে, তবে সামরিক জাহাজসমূহের চলাচল অবৈধ হিসেবে পরিগণিত হবে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নিরাপত্তার প্রশ্নে উক্ত এলাকায় জাহাজ চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- দ্বীপবহুল জলসীমা (Archipelagic Water): দ্বীপসমূহের বেইজলাইনের সবচেয়ে নূরবর্তী বিন্দুর সোজা কাল্পনিক রেখা হতে বেইজলাইনের মধ্যবর্তী জলসীমাকে দ্বীপবহুল জলসীমা বলা হয়। উক্ত এলাকায় দ্বীপরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে তবে রাষ্ট্রীয় জলসীমার অনুরূপ অন্য দেশের জাহাজের যে কোনো একটি পথের মধ্য দিয়ে চলাচলের অধিকার থাকবে।
- সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous Zone): রাষ্ট্রীয় জলসীমার ১২ নটিক্যাল মাইল এবং পরবর্তী ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থাৎ বেইজলাইন থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকাকে সন্নিহিত অঞ্চল বলা হয়। এটি সাধারণত সাগরের নো-চলাচল এলাকা হিসেবেও পরিচিত। উপকূলীয় রাষ্ট্র এ অঞ্চলে শুল্ক আদায়, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন এবং দূষণ সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে।

ছবি: মৎস্যজীবীদের যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone- EEZ): ভটরেখা হতে সমুদ্রের দিকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রসীমাকে একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা বলে। এ অঞ্চলে রাষ্ট্র মৎস্য আহরণের পাশাপাশি সকল প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। তবে বিদেশি জাহাজ এবং উড়োজাহাজের গতিবিধি স্বাধীন থাকবে।
- মহীসোপান (Continental Self): উপকূলবর্তী সমুদ্রের অগভীর তলদেশ থেকে হঠাৎ করে গভীরতা বৃদ্ধি পেলে তাকে মহীসোপান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ এলাকার বিস্তার ক্ষেত্র বিশেষে ২০০ নটিক্যাল মাইল ছাড়িয়ে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্তও হতে পারে।

উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ এ অঞ্চল থেকে খনিজ সামগ্রী উত্তোলন এবং বাণিজ্যিক সম্পদ একচেটিয়া ভোগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরে বর্ণিত সাগরের সীমানা নির্ধারণ বিষয়াবলি ছাড়াও এই কনভেনশনে International Seabed Authority এর মাধ্যমে সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, গভীর সমুদ্রে গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং জাতীয় সীমানার বাইরে গভীর সমুদ্রের তলদেশে খনিজ আহরণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সামুদ্রিক সম্পদের উপর অধিকার এবং তা সংরক্ষণের প্রশ্নে এবং উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্ভাব্য বিবাদ পরিহারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের বিভিন্ন বিধি বা উপবিধিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিগত ২৭ জুলাই ২০০১ সালে এ চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে।

খ. জাতিসংঘের মৎস্য মজুদ বিষয়ক চুক্তি
(UN Fish Stock Agreement- UNFSA)

আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ১৯৮২-এ বর্ণিত স্থানীয় ও অতি অভিপ্রায়াণশীল মাছের মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অনুবিধিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের মৎস্য মজুদ বিষয়ক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ১৯৮২-কে আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে। এ চুক্তিটির মাধ্যমে একদিকে যেমন সকল দেশের জন্য গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, পাশাপাশি তেমনি স্থানীয় ও দ্রুত অভিপ্রয়াণশীল মাছের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ চুক্তি মোতাবেক (১) গভীর সমুদ্রে মৎস্য মজুদ সংরক্ষণ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সদস্যদেশসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে (UNCLOS ১৯৮২, আর্টিকেল ১১৭) এবং (২) সদস্যদেশসমূহ গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী নৌযানে স্ব স্ব দেশের পতাকা উত্তোলন করবে (UNCLOS ১৯৮২, আর্টিকেল ৯০-৯৮)। এ চুক্তির অনুবিধিগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

- স্থানীয় ও অতি অভিপ্রয়াণশীল মাছের মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সাধারণ ও মূলনীতিসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে;
- উক্ত মজুদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গৃহীতব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ধারণা প্রদান করা হয়েছে;
- স্থানীয় ও অতি অভিপ্রয়াণশীল মাছের মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিশেষ ভূমিকার ওপরে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে;
- গভীর সমুদ্রে মৎস্য মজুদ সংরক্ষণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ রয়েছে;
- গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী নৌযানে স্ব স্ব দেশের পতাকা উত্তোলন করার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে;
- গভীর সমুদ্র ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে; এবং
- উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে করণীয় বিষয়ের নির্দেশনা রয়েছে।

জাতিসংঘের মৎস্য মজুদ বিষয়ক চুক্তি শুধুমাত্র সদস্য দেশসমূহের উপর বর্তায়। এ চুক্তিটি ১১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখ হতে অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং অদ্যাবধি ৮১টি দেশ এ চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিগত ৬৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখে এই চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে

গ. রামসার কনভেনশন
(RAMSAR Convention)

রামসার কনভেনশন মতে জলাভূমি (wetland) বলতে স্যাঁতসেঁতে জলা ও হ্রদসহ প্রবাল দ্বীপ, পিট বনাঞ্চল, অস্থায়ী পুকুর, ভূগর্ভস্থিত গুহা এবং পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত মনুষ্যনির্মিত জলাসহ সকল প্রকার জলাশয়কে বোঝায়। জলাভূমি জনসাধারণের জীবিকা, খাদ্য, বস্ত্র সরবরাহসহ বন্যা থেকে রক্ষা, পানি পরিশোধন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর সকল জলাভূমির প্রায় অর্ধেকই মানুষ কর্তৃক অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রতিনিয়তই নতুনভাবে হুমকির মুখে পড়ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর গতিপথ ও প্রতিবেশের পরিবর্তন হয়, হ্রদ থেকে পানি উত্তোলন এবং সেখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ তথা দূষণের ফলে বিল ও কর্দমাক্ত জলাভূমি এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসারে অথবা কৃষি জমিতে রূপান্তর করার ফলে জলাভূমির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখোমুখি হয়ে থাকে। অনেক প্রজাতির মাছ, জলচর পাখি, ড্রাগন মাছির লার্ভাসহ বহু প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য জলাভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বর্তমানে বৈশ্বিকভাবে বিপন্ন ১৪৬টি প্রজাতির পাখির অন্তত শতকরা ১২ ভাগ জলাভূমির ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। জলজ পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭১ সালে The Convention on Wetlands of International Importance এর সূচনা হয় এবং ১৯৭৫ সাল থেকে এটি কার্যকর হয় এবং ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রামসার কনভেনশনে ১৬৮টি দেশ অনুস্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি বিশ্বে ২০৮.৫৫ মিলিয়ন হেক্টর আয়তনের মোট ২,১৮১টি জলাভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ কনভেনশনের আলোকে বহুদেশে ইতোমধ্যেই 'জাতীয় জলাভূমি নীতি' প্রণীত হয়েছে।

এ কনভেনশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে- টেকসই মৎস্য সম্পদের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মডেলিং, দূষণ হ্রাসকরণ এবং দেশজ সংস্কৃতি সংরক্ষণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রামসার শুধু পাখি বিষয়ক নয় বরং বৃহৎ পরিসরে এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন দিকসমূহ নিয়েও কাজ করছে। রামসার কনভেনশনের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে Birdlife International, IUCN, Wetland International, International Water Management Institute, World Wildlife Foundation সহ অনেক সংস্থাই কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে এ কনভেনশনে যোগদান করে। বাংলাদেশের ঘোষিত ২টি রামসার সাইট হলো সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওর।

ঘ. জৈবিক বৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশন
(Convention of Biological Diversity- CBD)

জৈবিক বৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশন (CBD) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। ৫ জুন ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেরিও সম্মেলনে স্বাক্ষরিত এই কনভেনশনটি ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখ হতে সদস্য দেশসমূহের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অদ্যাবধি অনুস্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৯৪টি। জৈবিক বৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনের ৩টি প্রধান লক্ষ্য হলো: (১) জৈবিক ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; (২) এর অংশসমূহের স্থিতিশীল ব্যবহার; এবং (৩) বংশানুগতি সম্বন্ধীয় সম্পদের ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টন। বৃহত্তর অঙ্গিকে এ কনভেনশনের উদ্দেশ্যসমূহ হলো জৈবিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় পর্যায়ে কলাকৌশল প্রণয়ন এবং এর স্থিতিশীল ব্যবহার। এ কনভেনশনটি স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল সনদ হিসেবেও বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ উক্ত কনভেনশনে বিগত ২৪ মে ২০০০ তারিখে স্বাক্ষর এবং ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে অনুস্বাক্ষর করেছে।

ঙ. বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES)

বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন হলো সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সরকারিভাবে সম্পাদিত একটি সমঝোতা। এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে যাতে করে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন না হয় তা নিশ্চিত করা। IUCN কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের প্রেক্ষিতে এ চুক্তির খসড়া প্রথম ১৯৬৩ সালে প্রণীত হয়। তবে চূড়ান্তভাবে চুক্তিটি রেজুলেশন ৮০টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ০৩ মার্চ ১৯৭৩ তারিখে গৃহীত হয় এবং ১ জুলাই ১৯৭৫ তারিখ হতে সকল দেশের জন্য কনভেনশনটি অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। CITES চুক্তিটি বৃহত্তর অঙ্গিকে সদস্য দেশসমূহের উপর চুক্তি পালনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করলেও কোনো দেশের আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বস্তুত CITES চুক্তি কোনো সদস্য দেশের নিজস্ব বিধি-বিধান প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ৯২টি প্রজাতির মাছ ও প্রাণী এ চুক্তির আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ বা অতিআহরণের বিবেচনায় আরও বেশ কিছু প্রজাতির মাছের নাম এ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ রয়েছে। বাংলাদেশ বিগত ২০ নভেম্বর ১৯৮১ তারিখে এ চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ তারিখ থেকে চুক্তিটি অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

চ. অভিপ্রয়াণশীল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন
(The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals - CMS)

অভিপ্রয়াণশীল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশনটি অভিপ্রয়াণশীল স্থলজ, সামুদ্রিক এবং পক্ষী প্রজাতিকে তাদের বিচরণের পথে নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে যা বন (Bonn) কনভেনশন নামেও পরিচিত। এটা একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক চুক্তি যা জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহীত হয়েছে এবং অন্তর্জাতিকভাবে বন্যপ্রাণী এবং এর আবাসস্থল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ। এই কনভেনশনটি ১৯৭৯ সালে জার্মানির বন নগরীতে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৮৩ সাল থেকে সকল দেশের জন্য পালনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এ কনভেনশনটি বৃহত্তর অঙ্গিকে চুক্তি প্রণয়নে কৌশল হিসেবেও বিবেচিত হয় এবং তা আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে কোনো অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে স্বল্প পরিসরে কোনো অনানুষ্ঠানিক চুক্তিও (MoU) হতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত কনভেনশনটিতে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা ১১৯ টি এবং বাংলাদেশ বিগত ০১ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে এই কনভেনশনটিতে অনুস্বাক্ষর করেছে।

ছ. দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি
(Code of Conduct for Responsible Fisheries-CCRF)

ধারাবাহিক এবং স্থিতিশীল মৎস্য প্রাপ্তি এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) একটি বিশ্বজনীন দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করেছে যা দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (CCRF) নামে পরিচিত। CCRF এর ধারণাটি সর্বপ্রথম মার্চ ১৯৯১ সালে FAO-এর মৎস্য বিষয়ক কমিটির ১৯তম অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলনে FAO কে CCRF-এর খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে মতে FAO এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আচরণবিধি প্রণয়নে কাজ শুরু করে এবং ৩১ অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে CCRF গৃহীত হয়। এ আচরণবিধি সকল প্রকার মৎস্যসম্পদ (সামুদ্রিক ও স্বাদুপানি) ও তার পরিবেশ এবং সকল পর্যায়ের ব্যবহারকারীর স্বার্থ বিবেচনায় রেখেই প্রণীত হয়েছে এবং আচরণবিধিতে মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত সকল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও সংস্কৃতিক গুরুত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

আচরণবিধির ১২টি অনুচ্ছেদে এর ব্যাপ্তি, উদ্দেশ্যাবলি, আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সম্পর্ক, বাস্তবায়ন, তদারকি ও হালনাগাদকরণ, উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ চাহিদা, আচরণবিধির মূলনীতি, মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহরণ, মৎস্যচাষ, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, মৎস্য পরিচর্যা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য ব্যবসা এবং মৎস্য গবেষণার ওপর আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রসমূহের করণীয় সম্পর্কিত বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আচরণবিধির নির্দেশনাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো হলো:

- সরকার এবং মৎস্য সংশ্লিষ্ট সকল সুফলভোগী কর্তৃক যৌথভাবে CCRF মেনে চলার মাধ্যমে জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ করা;
- সমুদ্রে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি, কোনো প্রজাতি ধ্বংস না হওয়া এবং মৎস্যজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নে মৎস্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;

ছবি: বাংলায় অনূদিত সিসিআরএফ গাইডলাইন

- সমুদ্রের মৎস্যসম্পদের অতি-আহরণ ও মাত্রাতিরিক্ত আহরণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নৌযান ও জালের সংখ্যা নির্ধারণ এবং ক্ষতিকর আহরণ সরঞ্জামের ব্যবহার বন্ধ করা;
- পরিবেশগতভাবে নিরাপদ জাল, নৌযান এবং অন্যান্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীদের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন মোতাবেক মাছ ধরায় নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা;
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান কর্তৃক জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা;
- সামুদ্রিক সম্পদকে জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করা এবং একাধিক দেশের জলসীমায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলজ প্রাণীর ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সাথে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা;
- বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সতর্কতার সাথে মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বিপন্ন সকল প্রকার সামুদ্রিক ও মিঠাপানির মাছের আবাসস্থল, প্রজনন ও লালন ক্ষেত্র, যেমন- মোহনা, উপকূল, প্যারাবন, প্রবালদ্বীপ, জলাভূমি, বিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদির সংস্কার ও পুনর্বাসন করা;
- সঠিক পরিচর্যা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা চালু করা যাতে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট না হয়, আহরণ-পরবর্তী অপচয় হ্রাস পায় এবং পরিবেশ দূষিত না হয়;
- মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত সকল সুযোগ-সুবিধা, যেমন- মৎস্য নৌযান, জাল ও অন্যান্য আহরণ সরঞ্জাম, জেটি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানসম্পন্ন রাখা;
- মৎস্যচাষ ও চাষভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ও আয়-রোজগার বাড়ানো;
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিকদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা এবং সকল স্বাদুপানি ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণক্ষেত্রে তাদের মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করা;
- সমুদ্রের মৎস্যসম্পদের অতিআহরণ ও মাত্রাতিরিক্ত আহরণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নৌযান ও জালের সংখ্যা নির্ধারণ এবং ক্ষতিকর আহরণ সরঞ্জামের ব্যবহার বন্ধ করা;
- পরিবেশগতভাবে নিরাপদ জাল, নৌযান এবং অন্যান্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীদের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন মোতাবেক মাছ ধরায় নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা;
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান কর্তৃক জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা।

ছবি: কক্সবাজারে সুফলভোগীদের সিসিআরএফ বিষয়ক সভা

উপসংহার (Conclusion)

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্রমাগত অতি-আহরণ, ভূমি ও সমুদ্র হতে সৃষ্ট দূষণ এবং সর্বোপরি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন এবং তার বিরূপ প্রভাবের ফলে বিশ্বব্যাপী মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য, বিস্তৃতি ও প্রজাতি বৈচিত্র্য বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, সেজন্য প্রয়োজন আহরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল ও নিরবিচ্ছিন্ন মৎস্য আহরণ নিশ্চিতকরণ। এ প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক পরিবেশ ও সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা, চুক্তি বা সমঝোতার গুরুত্ব অপরিসীম। এসব আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানসমূহের কৌশল এবং নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো সম্ভব বিধায় বর্তমান প্রজন্মের সকল স্তরের সুফলভোগীদেরকেই এগুলো পালনে দায়িত্ববান ও সুবিবেচক হওয়া সমীচীন।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা : ডব্লিউবিআরপি'র একটি সফল উদ্যোগ
Agro-Fish Friendly Sluice Gate Management : An Initiative of WBRP

ড. এ আতিকুর রহমান[1], মো: লিয়াকত আলী[2] ও মো: তৌহিদুর রহমান[3]

Abstract

Bangladesh is a riverine and flood prone country. In order to control flood and develop agriculture, the Government has implemented Flood Control, Drainage and Irrigation Project (FCD/FCDI) covering area about 5.5 million hectares floodplains. But due to construction of embankment under the mentioned projects, migration of fishes and other aquatic lives between river and floodplain has been obstructed and thereby fish production and wetland biodiversity have decreased remarkably and livelihood of fishers have been affected severely. The experience of using sluice gate for enhancing both agriculture and fisheries in the FCD/FCDI project/embanked area has been demonstrated as a key component of the GIZ financed Wetland Biodiversity Rehabilitation Project (WBRP) of the Department of Fisheries implemented in the impacted area of Pabna Irrigation and Rural Development Project (PIRDP). In order to develop guidelines for agro-fish friendly sluice gate management system for replication in other similar FCD/FCDI project area of the country for enhancing fish production and biodiversity without affecting agriculture, a study on "Promotion of Sustainable Sluice Gate Management Approach through Integration into the Government Existing Structure" has been undertaken by BCAS with financial assistance of GIZ under Wetland Biodiversity Rehabilitation Project (WBRP) during 2012-2013. The study reviewed and analyzed the national policies of water resource, agriculture, fisheries, environment etc. and activities with achievement of WBRP, BCAS-IIED sluice gate study, MACH, IPAC, Fourth Fisheries, CBFM etc. as well as conducted stakeholder discussion. Based on the study, a set of recommendations have been made to formulate guidelines for agro-fish friendly sluice gate management to be adopted by the Government for replication in the country for enhancing both agriculture and fisheries.

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও বন্যাপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে দেশের ২৫%-৪৫% এলাকা প্রায় ৩-৫ মাস বন্যা কবলিত থাকে। বন্যার ফলে একদিকে যেমন কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তেমনি প্রাকৃতিক মাছের বিচরণক্ষেত্র ও প্রজননক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। নদী থেকে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে বন্যা কখনো কখনো কৃষি ফসল, অন্যান্য সম্পদ এবং মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে প্রায় ১৩,০০০ কিমি বাঁধ, ৪,১৯০ টির অধিক স্লুইস গেইট/রেগুলেটর নির্মাণসহ ৬২০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের প্রায় ৫৫ লক্ষ হেক্টর এলাকা আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশ এখন খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের ফলে নদী ও প্লাবনভূমির মধ্যে মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মৎস্যজীবীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন (WBRP) প্রকল্পে স্লুইস গেইটের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির কোনো ক্ষতি ব্যতিরেকেই মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার কয়েকটি জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ১০-১১ প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ডব্লিউবিআরপি-এর আওতায় পরীক্ষিত এ কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেশের অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এলাকায় প্রয়োগ করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা সুপারিশমালা সম্বলিত একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় "স্লুইস-গেইটের টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়নপূর্বক সরকারের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ" নামে একটি সমীক্ষা ২০১২-২০১৩ সালে বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (BCAS) কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য
(Objective of the Study)

এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যা স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা নীতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান নীতিমালাভুক্ত করে দেশের সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা হবে।

সমীক্ষার কার্যক্রম
(Activities of the Study)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ সমীক্ষার আওতায় গৃহীত কার্যক্রমগুলো হলো (১) সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহ ও অন্যান্য দলিল, রিপোর্ট পর্যালোচনা; (২) সফল কার্যক্রম/প্রকল্প পর্যালোচনা; (৩) সুফলভোগী/সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা (একজিডি ও কেআইআই); (৪) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা; (৫) জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সমীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

সমীক্ষার ফলাফল ও আলোচনা
(Result and Discussion of the Study)

১. জাতীয় নীতিমালা পর্যালোচনা
(Review of the National Policy)

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রভৃতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার সাথে জাতীয় নীতিমালাগুলোর কোনো সংঘাত নেই বরং নীতিমালাগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকল সেক্টরের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

২. সফল কার্যক্রম/প্রকল্প পর্যালোচনা
(Review of Success Programme and Project)

জার্মান সরকারের সহায়তাপুষ্ট ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট, আইআইইডি-বিসিএএস কর্তৃক পরিচালিত স্লুইস গেইটের ব্যবহার শীর্ষক সমীক্ষা, মাচ (Management of Aquatic Ecosystem Through Community Husbandry- MACH) ও আইপ্যাক (Integrated Protected Area Co-management- IPAC) প্রকল্প কার্যক্রম, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ফিস-পাস প্রকল্পসমূহের সফল ও টেকসই কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। WBRP ও IIED-BCAS কর্তৃক পরিচালিত স্লুইস গেইট ব্যবহার শীর্ষক সমীক্ষা হতে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং মাচ ও আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত মৎস্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং কৌশল ও অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব টেকসই স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উপর্যুক্ত প্রকল্প বা কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে যৌথ ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা বা উদ্যোগ, জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও সংগঠিতকরণ, সম্পদ ব্যবহারে নীর্ঘমেয়াদি অধিকার এবং আর্থিক নিশ্চয়তা কোনো কার্যক্রম বা প্রকল্প টেকসই করার মূল বিবেচ্য বিষয়।

ডব্লিউবিআরপি'র উদ্যোগে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা
(Agro-Fish Friendly Sluice Gate Management taken by WBRP)

ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রায় ৯০টিরও বেশি স্লুইস গেইট আছে। তন্মধ্যে যমুনা ও পদ্মা নদীর সাথে সংযুক্ত ৫টি স্লুইস গেইট যথা (১) বেড় স্লুইস গেইট; (২) কইতলা স্লুইস গেইট; (৩) বাওলাখোলা স্লুইস গেইট; (৪) তালিমনগর স্লুইস গেইট এবং (৫) খলিসপুর স্লুইস গেইট প্রধান।

এসব স্লুইস গেইট প্রকল্প এলাকায় মাছের অভিপ্রয়াণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। এ প্রকল্পের আওতায় স্লুইস গেইটগুলো কৃষি ও মৎস্যবান্ধব ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়েছে।

- সুফলভোগী ও সংশ্লিষ্ট জনগণের মধ্যে মৎস্য ও জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদেরকে সংগঠিত করা
- প্রকল্প এলাকার শস্য বিন্যাস পর্যালোচনা এবং কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয় সাধন।
- পদ্মা-যমুনা নদীতে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু-পোনা মাছের প্রাচুর্য নির্ণয় এবং তদনুসারে স্লুইস গেইট খোলা ও বন্ধ করার সময়সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- স্লুইস গেইট সঠিক সময়ে ও সঠিক উপায়ে খোলা, বন্ধ করা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ের স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ এবং প্রতিটি স্লুইস গেইট এলাকায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, গণ্যমান্য ব্যক্তি, কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের সমন্বয়ে স্লুইস গেইট পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং এসব কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও স্লুইস গেইট পরিচালনা কার্যক্রম নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় নদী হতে মাছের অভিপ্রয়াণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মে-জুন মাস। এ সময় প্রকল্প এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদি ব্রি-২৯ ধান আহরণ করতে দেরী হয় ফলে স্লুইস গেইট খুলতে ধানের ক্ষতি হতে পারে। ব্রি-ধান ২৯ এর পরিবর্তে ব্রি-২৮ ধান চাষ করলে বেশ কিছু দিন আগে তা আহরণ করা যায় ফলে সঠিক সময়ে স্লুইস গেইট খুললে ধানের কোনো ক্ষতি হয় না। এজন্য কৃষকদেরকে ব্রি-২৯ ধান এর পরিবর্তে ব্রি-২৮ ধান চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং ফলে ব্রি-২৯ ধান এর পরিবর্তে ব্রি-২৮ ধান অধিক পরিমাণে আবাদ হচ্ছে।
- কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা যথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভূমি

মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন।
- কৃষি ও মৎস্যবান্ধব ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

স্লুইস-গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশমালা (Recommendation for Sluice-Gate Management)

সমীক্ষার আওতায় বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও সফল কার্যক্রম/প্রকল্প পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্টদের সকলের সাথে মতবিনিময় সভা, আলোচনা ও পরামর্শের আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা/সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে

১. 'সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে স্লুইস গেইট খোলা ও বন্ধ করে কৃষি ফসলের কোনো প্রকার ক্ষতি ব্যতিরেকে স্লুইস গেইটের ভেতর দিয়ে প্লাবনভূমিতে মাছের অভিপ্রয়াণ (migration) নিশ্চিত করা' কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

চিত্র: স্লুইস গেইট খোলা অবস্থা

২. কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও সুফলভোগীদের সমন্বয়ে স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্লুইস গেইট মনিটরিং ও পরিচালনা কমিটি গঠন

৩. সাধারণত বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম পানি বৃদ্ধির সময় (মে-জুন মাসে) অনুকূল পরিবেশে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে প্রায় সকল প্রজাতির স্বাদুপানির প্রাকৃতিক মাছ প্রজনন করে। এ সময় অধিক পরিমাণে মাছ নদ-নদী হতে প্লাবনভূমিতে প্রজনন, খাদ্য গ্রহণ ও বিচরণের জন্য প্রবেশ করে। তাই এ সময় স্লুইস গেইট খোলা রাখা হলে নদ-নদী হতে প্রকল্প এলাকায় অর্থাৎ প্লাবনভূমিতে অধিক পরিমাণে মাছ প্রবেশ করতে পারে

৪. স্লুইস গেইটের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রবেশের স্বার্থে এবং কৃষি উৎপাদন যাতে ব্যাহত না

চিত্র: কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় সেমিনার

হয় সেজন্য ফসলের জাত বা শস্য বিন্যাসের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ কৃষি ও মৎস্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলাকার নদী, খাল ও বিল পুনঃখননের মাধ্যমে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস-গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত সুপারিশমালা (Recommendation for Agro-Fish friendly Sluice-Gate Management)

ক. স্লুইস-গেইট খোলার সময় (Time Schedule for Opening Sluice Gate)

অনুকূল পরিবেশে স্লুইস গেইট খোলা থাকলে মাছ ও মাছের পোনা সারা বছরই কম বেশি প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। তবে মাছের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে বর্ষার প্রারম্ভে (মে-জুন) অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় যখন নদ-নদীতে পানি বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন অধিক সংখ্যক মাছ ও পোনা প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। তাই এ সময়ে মাছের অভিপ্রয়াণের জন্য স্লুইস গেইট খোলা রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর ফলে কৃষি ফসলের যেন কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়।

খ. স্লুইস-গেইট খোলার নিয়ম (Tecnique for Opening Sluice Gate)

১. স্লুইস গেইট খোলার সময় পানির স্রোতের গতি এবং পানির আলোড়ন অত্যন্ত বেশি হলে অভিপ্রয়াণের সময় মাছের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেতে পারে। এ জন্য স্রোতের গতি ও পানির উত্তলতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যাতে মাছ ও পোনা স্লুইস গেইটের ভেতর দিয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং মাছ ও পোনার মৃত্যুহার হ্রাস পায়।

২. বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম পানি বৃদ্ধির সময় স্লুইস গেইটের ভেতর দিয়ে বেশি পরিমাণ পানি প্রবেশ করাতে হবে এবং প্রয়োজনে বার বার স্লুইস গেইট খুলতে হবে ও বন্ধ করতে হবে। স্লুইস গেইট খোলা বা বন্ধ করার সময় স্লুইস গেইটের বাইরের পানির উত্তলতা কম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. কৃষি ফসলের জাত ও শস্য বিন্যাস পরিবর্তন বা সমন্বয়করণ
(Changing or Coordination of Crop Varelty and Crop Rotation)

১. বর্ষার প্রারম্ভে স্লুইস গেইট খোলা রাখার কারণে প্লাবনভূমির নিম্নাঞ্চলের কৃষি ফসল যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে প্রয়োজনে কৃষি ফসলের বিশেষ করে ধানের জাতের পরিবর্তন বা শস্য বিন্যাস পরিবর্তন অথবা নতুন কোনো জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে সমন্বয় করে ক্ষতির হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নিচু জমিতে দীর্ঘ মেয়াদি ব্রি-২৯ ধান এর পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি ব্রি-২৮ ধান ইত্যাদি জাতের কিংবা বন্যাসহনশীল বা স্বল্পমেয়াদি অন্য কোনো জাতের ধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। শস্য বিন্যাসে বোরো ধান ও রবি ফসল কর্তনের পর আগাম জাতের পাটের আবাদও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২. কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার আলোকে প্রকল্প এলাকার জন্য শস্য পঞ্জিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, সংগঠিতকরণ ও ক্ষমতায়নসহ প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. স্লুইস-গেইট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা
(Operatrion of Sluice-gate Management Activities)

১. স্লুইস গেইটগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি স্লুইস গেইটের জন্য প্রভাবিত এলাকার সকল ধরনের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে তা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে। একই উপজেলায় একাধিক স্লুইস গেইট থাকলে একটি কমিটিই সবগুলো স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা করতে পারে অথবা প্রয়োজনবোধে প্রত্যেক স্লুইস গেইটের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২. কৃষি ফসলের অবস্থা ও নদীতে মাছ ও পোনার প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণপূর্বক স্লুইস গেইট খোলা বা বন্ধ করার পরামর্শ প্রদান এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এবং সকল শ্রেণীর সুফলভোগীদের সমন্বয়ে প্রতিটি স্লুইস গেইটের জন্য একটি করে স্লুইস গেইট পরিবীক্ষণ ও পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে।

৩. নদীতে মাছের পোনা ও মা মাছের প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণপূর্বক স্লুইস গেইট খোলা এবং বন্ধ রাখার সময়সূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং তদনুসারে স্লুইস গেইট খোলা ও বন্ধ করতে হবে।

৪. মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই নদী ও স্লুইস গেইটের সংযোগ খালগুলো প্রবাহমান রাখতে হবে যাতে গেইট খোলার সাথে সাথে মাছ ও পোনা সহজে প্রবেশ করতে পারে।

ঙ. কৃষি ও মৎস্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ
(Ensure of Agro-Fish Freindly Environment)

১. শুকনো মৌসুমে প্লাবনভূমি হতে প্রায় সব পানিই কৃষির সুবিধার্থে নিষ্কাশন করা হয়। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্লাবনভূমি ও বিলে ন্যূনতম পরিমাণ পানি ধরে রাখতে হবে এবং প্লাবনভূমির প্রকল্প এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক 'জলাভূমি অভয়াশ্রম' স্থাপন করতে হবে।

২. প্রকল্প এলাকার ভেতরের নদী ও খালগুলো পুনঃখনন করে এমনভাবে গভীর করতে হবে যাতে প্রথম পানি বৃদ্ধির সময় গেইট খুলে পানি প্রবেশ করালে তা নদী ও খালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ফসলের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে।

চ. মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
(Management of Fisheries Resources)

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রচলিত মৎস্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সংযোগ খাল ও মুক্ত জলাশয়ে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বর্ষার প্রারম্ভে সাময়িকভাবে সকল প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখতে হবে।

ছ. স্লুইস গেইট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা
(Repair, Maintenance and Operation of Sluice-gate)

সময়মত স্লুইস গেইট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে মৎস্য সম্পদ ও কৃষি ফসল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। স্লুইস গেইট খোলা ও বন্ধ করার জন্য জনবলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার ওপর দায়িত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়।

জ. সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও সুফলভোগীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়
(Cooperation and Cordination between Relevent Organisations and Stackholders)

১. কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথা- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রশাসনের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. স্লুইস-গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে উপকারভোগীদের সমন্বয়ের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কৃষি-মৎস্য কোনোটিরই কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে কৃষি ফসল ও মাছের আকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন এবং বর্তমান জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণসহ হারানো জীববৈচিত্র্যকে ফিরিয়ে আনা অনেকাংশে সম্ভব। প্রণীত কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা সরকারের নীতিমালাভুক্ত করে দেশের মৎস্য সম্পদ সমৃদ্ধ সেচ প্রকল্প এলাকায় প্রয়োগ করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ভূমি, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও বন, সমবায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সমূহ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত প্রয়াস।

[1]নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (BCAS)
[2]সিনিয়র ফেলো, বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (BCAS)
[3]সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক, WBRP, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

উত্তরাঞ্চলে আদিবাসীদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে কুচিয়া উৎপাদন

Culture of Cuchia Using Indigenous Technology by the Ethnic People of Northern Region

ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ[১] ও ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী[২]

Abstract

Cuchia (*Monopterus cuchia*), a delicacy, nutritious and favorite fish for Adivasi people is usually found all over Bangladesh as well in other South Asian countries like Pakistan, India and Nepal. In recent days, Adivasi people, rely on cuchia harvesting and marketing thrives to sustain their livelihood. In view to investigate existing knowledge of Adivasi people on cuchia, the cuchia rich waterbody of Kokraduba beel surrounds by two Adivasi fishers' villages of Chitolia and Shyampur under Fulpur Upazila of Mymensingh district was selected. A set of questionnaire was designed to study the existing ecosystem status of the beel, food and feeding habit and reproductive behaviour of cuchia. The Adivasi fishers' having Indigenous Technological Knowledge (ITK), dependent for their livelihood on cuchia were evaluated. Both primary and secondary data were accumulated by direct interviews to the Adivasi respondents, Department of Fisheries and websites. The study included searching suitable areas for cuchia habitat in the beel, its feed and feeding habit, breeding behavior, production profile, harvest methods, causes of habitat destruction and low productivity. The response by the Adivasi fishers' of Kokraduba beel revealed that cuchia is an omnivore, live in bushy and muddy habitat, mainly breeds from mid March to May having parental care whose production gradually declines due to habitat destruction and over fishing. The main reasons for destruction cuchia's habitat are blockage of water flow, shallow water depth, encroachment by agriculture and aquaculture, indiscriminate use of chemicals like fertilizers and pesticides, development of flood control structures and fishing in breeding season. Three fishing methods viz. physical (by hand picking), hook and line and traps (bait) were identified among which traps catches relatively undersized cuchia. Participating Adivasi people into the paradigm of community based management approach to conserve, protect and restore cuchia vis-à-vis involving in alternative income generating activities (AIGAs) linking them to value and market chain could improve the livelihood of disadvantaged Adivasi people.

আদিবাসী সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় সুস্বাদু কুচিয়া (*Monopterus cuchia*) বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন- পাকিস্তান, ভারত ও নেপালে পাওয়া যায় (Jhingran and Talwar, ১৯৯১)। আমাদের দেশে সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার অগভীর বিল ও বোরো ধানক্ষেতের আইল, জলজ আগাছার ঝোপঝাড়যুক্ত পরিবেশে কুচিয়া পাওয়া যেত (Rahman, ১৯৮৯)। আদিবাসী শিকারিগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুচিয়া শিকার করে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করত। এক সময় দেশের সর্বত্র কুচিয়া পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে কুচিয়ার আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় এখন তেমন একটা পাওয়া যায় না। ভৌগোলিক ও জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, অতিরিক্ত খরা, জলাভূমি ভরাট, অপরিকল্পিত স্লুইস গেইট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, জলাভূমি কৃষিতে রূপান্তর, নিষিদ্ধ ঘোষিত ও মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, অতিআহরণ ইত্যাদি কুচিয়ার আবাসস্থল নষ্টের অন্যতম কারণ। তাই প্রাপ্যতার বিবেচনায় কুচিয়া আজ বিপন্ন (IUCN, ২০০০)। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় জলাভূমি, ধানক্ষেত, ছোট ছোট পুকুর ও জলাশয় রয়েছে। এসব জলাশয় ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রাকৃতিকভাবে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যায়। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কুচিয়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদাও

ছবি: আহরিত কুচিয়া

রয়েছে। কুচিয়ার চাষ ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হলে আদিবাসীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য
(Objective of the Study)

কোকরাডোবা বিলে গবেষণা জরিপ কাজের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী ছিল কুচিয়ার আবাসস্থল উন্নয়নে এবং সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী সমাজের নিজস্ব জ্ঞান

অনুসন্ধান: আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই; কুচিয়ার খাদ্য, খাদ্যাভাস, প্রজননকালের আচরণ, গার্ডি ও পোনার লালন-পালন ও পোনা প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণ করা।

কর্মপদ্ধতি, ফলাফল ও আলোচনা (Methodology, Result and Discussion)

কুচিয়া বসবাসের অনুকূল আবাসস্থল হিসেবে কোকরাডোবা নামক বিলটি নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত বিলটি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় অবস্থিত এবং দুটি আদিবাসী গ্রাম চিতোলিয়া ও শ্যামপুর পরিবেষ্টিত। চিতোলিয়া গ্রামের শতকরা ৬৮ ভাগ এবং শ্যামপুর গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠী কুচিয়া আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিলটিতে কুচিয়ার উপযুক্ত আবাসস্থল, খাদ্য ও খাদ্যাভাস এবং কুচিয়ার প্রজনন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। প্রশ্নপত্র অনুসরণে চিতোলিয়া গ্রামের ৩০জন, শ্যামপুর গ্রামের ৩৮জন আদিবাসীর ওপর জরিপ চালিয়ে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয় এবং ইন্টারনেট থেকে সেকেন্ডারি ডেটা সংগ্রহ করা হয়। জরিপের ফলাফল ও আলোচনা নিম্নবর্ণিত হলো:

খাদ্য হিসেবে কুচিয়ার জনপ্রিয়তার কারণ (Cuchia as Popular Food)

কুচিয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য হওয়ার কারণ বিশ্লেষণে শতকরা ৮৯.০১ ভাগ আদিবাসী কুচিয়া ব্যথানাশক ও রক্ত উৎপাদক, শতকরা ৮৫.৩৩ ভাগ কুচিয়ায় আমিষের পরিমাণ বেশি এবং শতকরা ৯২.৮৬ ভাগ কুচিয়া হজমশক্তি বর্ধনকারী হিসেবে উল্লেখ করেন।

কুচিয়ার আবাসস্থল ও এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cuchia Habitat)

বিলের বিস্তৃত এলাকার মধ্যে কুচিয়া বসবাসের অনুকূল স্থান শনাক্তকরণে প্রাপ্যতার বিবেচনায় কুচিয়া আহরণের সাথে সম্পৃক্ত শতকরা ৯২.৮৬ ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠী মনে করেন কোকরাডোবা বিলের উত্তর-পূর্বাংশে কুচিয়ার প্রাপ্যতা সবচেয়ে বেশি এবং শতকরা ৯০.৪৮ ভাগের মতে উত্তর-পশ্চিমাংশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কুচিয়া আহরিত হয়। বাকি দক্ষিণ-পূর্বাংশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তুলনামূলকভাবে খুব কম সংখ্যক ও কম পরিমাণ কুচিয়া পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্বাংশ কুচিয়ার উপযুক্ত আবাসস্থলের কারণ হিসেবে শতকরা ৯২.৮৬ ভাগ কুচিয়ার খাবারের প্রাপ্যতা বেশি; শতকরা ৯৫.২৪ ভাগ কুচিয়া ঝোপঝাড়যুক্ত কর্দমাক্ত এলাকা পছন্দ করে, শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ অগভীর এলাকা কুচিয়ার পছন্দনীয় এবং শতকরা ৮৩.৩৩ ভাগ মৎস্যচাষের বিস্তৃতি কম মর্মে মত প্রকাশ করেন।

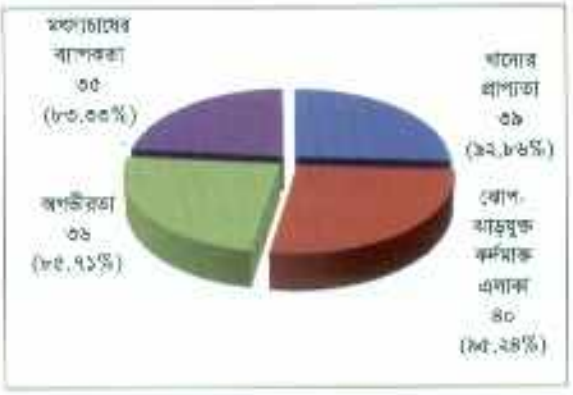

চিত্র: কোকরাডোবা বিলে উত্তর-পূর্বাংশে কুচিয়া প্রাপ্যতার কারণসমূহ

কুচিয়ার আবাসস্থল বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৮০ ভাগ আদিবাসী উত্তরদাতার মতে জানুয়ারি-ডিসেম্বর সারা বছর কুচিয়া ঝোপঝাড় ও ক্ষেতের আইলের গর্তে বসবাস করে, শতকরা ৭২.৫০ ভাগের মতে অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত কুচিয়া কাদায় বসবাস করে এবং শতকরা ৯৫ ভাগ কুচিয়া সারা বছর কাদায় ও গর্তে বাস করে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

ছবি: আহরিত কুচিয়া

ছবি: কুচিয়ার গর্ত

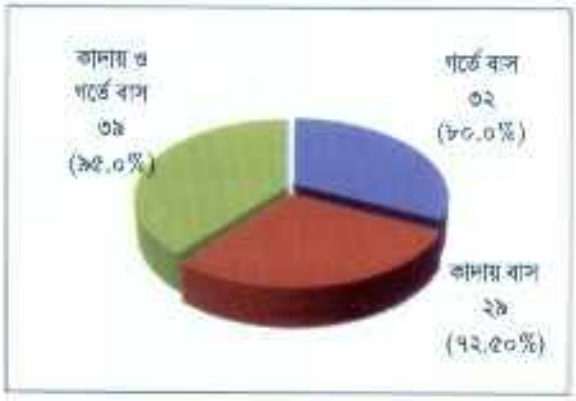

চিত্র: কুচিয়া আহরণের পদ্ধতিসমূহ

কুচিয়ার খাদ্য ও খাদ্যাভাস
(Food and Feeding Habit of Cuchia)

বিলের পার্শ্ববর্তী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর জরিপের ফলাফলে শতকরা ৯২.৮৬ ভাগের মতে কুচিয়ার খাদ্য তালিকায় ব্যাঙের বাচ্চা, শতকরা ৮০.৯৫ ভাগের মতে কেঁচোসহ অন্যান্য ছোট জলজ কীট এবং শতকরা ৬৬.৬৭ ভাগ উত্তরদাতা শুতুমসহ অন্যান্য ছোট মাছের কথা উল্লেখ করেন। সার্বিক বিবেচনায় কুচিয়া সর্বভুক প্রাণী।

চিত্র: কোকরাডোবা বিলে উত্তর-পূর্বাংশে কুচিয়া প্রাপ্যতার কারণসমূহ

পুরুষ ও স্ত্রী কুচিয়া মাছ চিহ্নিতকরণ
(Food and Feeding Habit of Cuchia)

পুরুষ ও স্ত্রী কুচিয়া নির্বাচনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬৪.২৮ ভাগ মনে করেন পুরুষ কুচিয়ার পেট গোলাকার, অপেক্ষাকৃত শক্ত, পায়ুপথ সামান্য লম্বা এবং লালচে বর্ণের; লেজ ছোট; শরীরের রং উজ্জ্বল বাদামি। শতকরা ৭১.৪৩ ভাগের মতে স্ত্রী কুচিয়ার পেট নরম ও পোলাকার এবং পায়ুপথ স্ফীত; গোলাকার, মাংসল ও গোলাপি বর্ণের, লেজ চাপ্টা, শরীরের বর্ণ তুলনামূলকভাবে ফ্যাকাসে হয়।

ছবি: স্ত্রী কুচিয়ার জননাঙ্গ

প্রজননকালে কুচিয়ার আচরণ, ফেকানডিটি ও লার্ভি
(Behaviuor of Cuchia during Breeding Season, Fecundity and Larvae)

কুচিয়া মাটির গর্তে বাস করে। শতকরা ৮৩.৩৩ ভাগ উত্তরদাতার মতে কুচিয়া প্রজননকালে খুবই আক্রমণাত্মক হয় এবং শতকরা ৯০ ভাগ মনে করে কুচিয়া এ সময়ে শত্রুকে কামড়ায়। উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শিকারির শরীরে কুচিয়ার কামড়ে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। শতকরা ৫৪.৭৬ ভাগের মতে প্রজননকারী কুচিয়ার ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম, ডিমের সংখ্যা ৪৫৮-১,১১৬ টি এবং কুচিয়ার ডিম আঠালো হয়। শতকরা ৫০.০০ ভাগ উত্তরদাতার মতে কুচিয়ার লার্ভি কালো ও বাদামি বর্ণের সুতা বা চুলের ন্যায় দেখায়।

প্রজননোত্তর মা কুচিয়ার আচরণ
(Maternal Care of Cuchia during Post Spawning)

শতকরা ৮৮.১০ ভাগ আদিবাসী উত্তরদাতা মনে করেন কুচিয়া প্রজননকালে তেলাপিয়া মাছের মত শত্রুর আক্রমণ হলে মা কুচিয়া তার ডিম ও লার্ভি মুখে তুলে নেয়। শতকরা ৯০.৯৪ ভাগের মতে পুরুষ কুচিয়ার ক্ষেত্রে এটি ঠিক উল্টো। এরা সুযোগ পেলেই নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। এজন্য মা কুচিয়া সতর্ক থাকে এবং পুরুষ কুচিয়ার আচরণের দিকে খেয়াল রাখে। বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত মা কুচিয়া সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

কুচিয়া আহরণ পদ্ধতি
(Harvesting Methodology of Cuchia)

কোকরাডোবা বিলে কুচিয়া মাছ সাধারণত তিন পদ্ধতিতে আহরণ করা হয়। শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ আদিবাসী লাইন পদ্ধতিতে বড়শির দ্বারা, শতকরা ৮৯.০১ ভাগ জনগোষ্ঠী হাত দ্বারা এবং শতকরা ৯২.৮৬ ভাগ ট্র্যাপ পদ্ধতিতে কুচিয়া আহরণ করেছেন। বড়শি ও হাত দ্বারা ১০০ ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং ট্র্যাপ পদ্ধতিতে কুচিয়া আহরণকারীদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ আদিবাসী ও শতকরা ৫০ ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী। অপর পৃষ্ঠার চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে অক্টোবর থেকে জুন পর্যন্ত হাত দ্বারা, সেপ্টেম্বর থেকে জুন

পর্যন্ত লাইন পদ্ধতি (বড়শি) দ্বারা এবং মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ট্রাপ পদ্ধতিতে কুচিয়া মাছ আহরণ করা হয়।

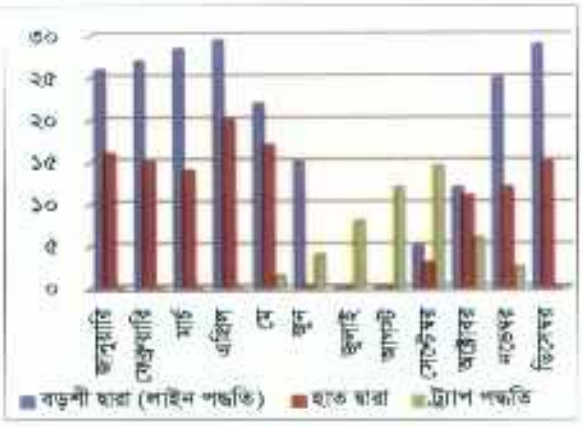

চিত্র: বিভিন্ন মাসে তিন পদ্ধতিতে কুচিয়া আহরণ

আহরিত কুচিয়ার আকার ও ওজন

(Length and Weight of Cuchia during Harvesting)

কোকরাডোবা বিলে তিন ধরনের পদ্ধতিতে আহরিত কুচিয়ার দৈর্ঘ্য ও ওজনের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায়। শতকরা ৬৫.০০ ভাগ আদিবাসীর মতে বড়শি দ্বারা (লাইন পদ্ধতি) ৫৯.১১±৪.৩৪ সেমি লম্বা ও ৩৯২.২২±৮৬.৭১ গ্রাম ওজনের কুচিয়া আহরণ করা হয়। শতকরা ৭০.০০ ভাগের মতে হাত দিয়ে ৪৬.৮৬±৫.০ সেমি লম্বা ও ৩৫২.৪৪±১১৭.৯৭ গ্রাম ওজনের কুচিয়া এবং শতকরা ৮০.০০ ভাগের মতে ট্রাপ পদ্ধতিতে (বাইর) ৩২.৫৯±৬.১৩ সেমি লম্বা ও ১৬৩.৩৩±৯৩.২০ গ্রাম ওজনের কুচিয়া আহরিত হয়। লাইন পদ্ধতিতে ২০০.০০ থেকে ৫০০.০০ গ্রাম ওজনের সবচেয়ে বড় এবং ট্রাপ পদ্ধতিতে ৫০.০০ থেকে ৩৫০.০০ গ্রাম ওজনের সবচেয়ে ছোট কুচিয়া আহরিত হয় তা নিম্নবর্ণিত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। ট্রাপ পদ্ধতিতে কখনও কখনও ৫০.০০ গ্রাম ও তার চেয়ে কম ওজনের কুচিয়া মাছ আহরিত হয়ে থাকে যা কুচিয়ার প্রাপ্যতা হ্রাসের জন্য অনেকাংশে দায়ী এমন মতামতও প্রকাশিত হয়েছে।

সারণি: কোকরাডোবা বিল থেকে ২০১২ ও ২০১৩ সালে আহরিত কুচিয়ার উৎপাদন (কেজিতে)

আহরণ পদ্ধতি	মোট উৎপাদন (২০১২)		মোট উৎপাদন (২০১৩)		অংশগ্রহণকারীর মোট (N=৪২)	শতকরা হার (%)	মন্তব্য
	দৈনিক আহরণ	সর্বমোট আহরণ	দৈনিক আহরণ	সর্বমোট আহরণ			
বড়শি দ্বারা (লাইন পদ্ধতি)	১৭.১০	৫৭৮২.০০	১৫.৪০	৫২৩৪.০০	৩৯	৯৭.৫০	২০১৩ সালে কুচিয়ার উৎপাদন তুলনামূলক ভাবে কমেছে।
হাত দ্বারা	৫.৩০	১০১২.০০	৪.৬০	৯৬৫.০০	৩০	৭৫.০০	
ট্রাপ পদ্ধতি (বাইর)	১০৬.২০	৮৬০১.০০	১০৫.৬০	৭০০৮.০০	৩৪	৯৫.০০	
মোট		১৪৩৯৫.০০	১২৫.৬০	১৩২০৮.০০			

কুচিয়া উৎপাদন

(Production of Cuchia)

কোকরাডোবা বিলে ২০১২ ও ২০১৩ সালে মোট কুচিয়ার উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৪৩৯৫.০০ ও ১৩২০৮.০০ কেজি উপরের সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে পূর্বের বছরের তুলনায় ১১৮৭.০০ কেজি কম অর্থাৎ শতকরা ৮.২৫ ভাগ কম কুচিয়া আহরিত হয়েছে। ২০১২ ও ২০১৩ সালে তিন পদ্ধতিতে দৈনিক কুচিয়া আহরণে উত্তরদাতাগণের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শতকরা ৯৭.৫০ ভাগ উত্তরদাতার মতে 'বড়শি দ্বারা (লাইন পদ্ধতি)' দৈনিক যথাক্রমে ১৭.১০ ও ১৫.৪০ কেজি, শতকরা ৭৫.০০ ভাগ উত্তরদাতার মতে 'হাত দ্বারা' দৈনিক যথাক্রমে ৫.৩০ ও ৪.৬০ কেজি এবং শতকরা ৯৫.০০ ভাগের মতে 'ট্রাপ পদ্ধতি দ্বারা' দৈনিক যথাক্রমে ১০৬.২০ ও ১০৫.৬০ কেজি কুচিয়া আহরিত হয়েছিল। পর্যবেক্ষণকালে বিলে কুচিয়া আহরণে ১৩৯টি ট্রাপ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ছবি: হাত দ্বারা কুচিয়া আহরণ

ছবি: বড়শি দ্বারা (লাইন পদ্ধতি)

ছবি: ট্র্যাপ পদ্ধতি

বড়শি দ্বারা কুচিয়া আহরণ (Harvesting of Cuchia by Hook)

বড়শি দিয়ে কুচিয়া শিকারি আদিবাসী উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে জানা যায় যে, শতকরা ৬৬.৬৬ ভাগের মতে বড়শিতে আধার হিসেবে ওলিগোকীট (কেঁচো), শতকরা ৯০.৪৮ ভাগ ব্যাঙের বাচ্চা, শতকরা ৮০.৯৫ ভাগ তুতুম মাছ এবং শতকরা ৬১.৯০ ভাগের মতে ছোট পাতুয়া, টাকি ইত্যাদি অন্যান্য ছোট মাছ ব্যবহার করা হয়। খাদ্য হিসেবে ব্যাঙের বাচ্চা সবচেয়ে প্রিয় এবং রঙ-বেরঙের তুতুম মাছ দ্বিতীয় প্রিয় আধার হিসেবে বিবেচিত হয়।

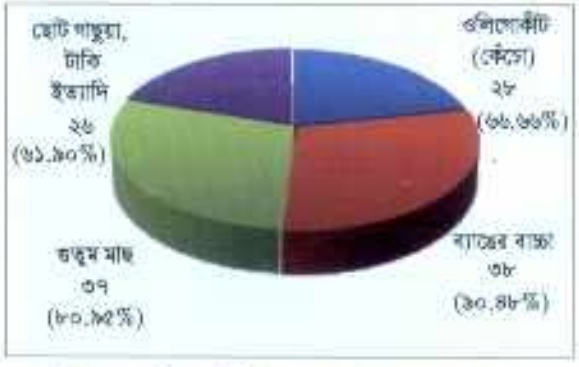

চিত্র : বড়শিতে কুচিয়া আহরণে আধার ব্যবহার

কুচিয়া পরিবহন ও বিপণন (Transportation and Marketing of Cuchia)

শতকরা ৯৫.২৪ ভাগ আদিবাসীর মতে তাদের বিকল্প শ্বাসযন্ত্রের জন্য ৩ মাস পর্যন্ত মজুদ রেখে পরিবহন করা যায়। এ সময়ে তারা কুচিয়া আহরণ করে আদিবাসী কুচিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে এবং কমপক্ষে ১০০০-২০০০ কেজি মজুদ করে ঢাকায় সরবরাহ করা হয়। শতকরা ৯০.৪ ভাগের মতে কুচিয়াকে রৌদ্রে শুকিয়ে শুটকি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কুচিয়ার শুটকি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রিয় খাদ্য।

বিলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ (Causes of Destruction of Beel Biodiversity)

কোকরাডোবা বিলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে শতকরা ৮৯.০১ ভাগ আদিবাসী পানি প্রবাহের পথ বন্ধ হয়ে জলাশয়ে কুচিয়ার চলাচল বন্ধ হওয়া, শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ পানির গভীরতা কমে যাওয়ায় বিলের জলজ পরিবেশে কুচিয়া বসবাসের অনুপযোগী হওয়া, শতকরা ৮৩.৩৩ ভাগ কৃষি ও মৎস্যচাষের বিস্তৃতির ফলে কুচিয়ার বাসস্থান অনুপযোগী হওয়া, শতকরা ৭৮.৫৭ ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সার, কীটনাশক ব্যবহার ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে কুচিয়াসহ অন্যান্য মাছের বসবাসের উপযোগিতা হারানো এবং শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ প্রজননের সময় কুচিয়া আহরণের ফলে প্রজননক্ষম কুচিয়া মাছের সংখ্যা কমে যাওয়াকে দায়ী করেন

চিত্র: কোকরাডোবা বিলের ইকোসিস্টেম ও কুচিয়া বসবাসের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

সুপারিশসমূহ (Recommendations)

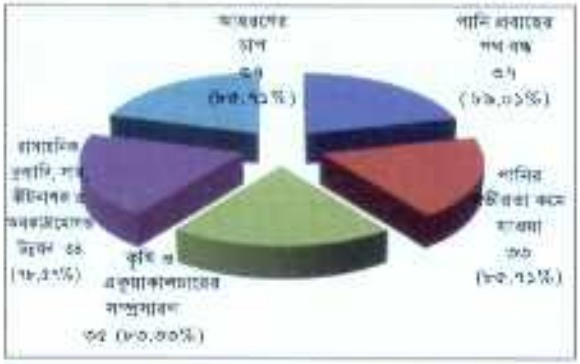

কোকরাডোবা বিলে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

- আদিবাসীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিলের আবাসস্থল উন্নয়ন;
- প্রজননকাল (চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস) কুচিয়া ও বিলের অন্যান্য ছোট মাছের আহরণ বন্ধ রাখা এবং প্রজননের পর কুচিয়ার লার্ভি ও পোনা বড় হওয়ার সুযোগের ব্যবস্থা করা; এবং
- কুচিয়া প্রজনন মৌসুমে কুচিয়া নির্ভর আদিবাসী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং কুচিয়া বাজারজাতের জন্য ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন করতে হবে

উপসংহার (Conclusion)

কুচিয়ার বাজারদর বেশি এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা থাকায় চাষের ব্যাপকতা বাড়িয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। গবেষণাকালে আদিবাসী সমাজের আন্তরিক সহযোগিতা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পতিত ছোট পুকুর ও জলাশয় যা আজও মৎস্যচাষের আওতায় আসেনি সে সমস্ত পুকুর ও জলাভূমিতে যথাক্রমে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতদবিষয় বিবেচনায় মৎস্য অধিদপ্তর দেশে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ বৃদ্ধিকল্পে শীঘ্রই একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে। পরিশেষে আশা করা যায় কুচিয়া আহরণকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠির সক্রিয় সহযোগিতায় কুচিয়ার আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং আদিবাসী সমাজের জীবিকা নির্বাহে সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

[1] মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[2] প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মাছের উচ্ছিষ্ট থেকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মাছের সস্তা খাদ্য : শুকনো সাইলেজ
Cheap Fish Feed Commercially Made from Fish Wastes : Powder Fish Silage

ড. এ কে এম নওশাদ আলম[১] ও উজ্জ্বল হোসেন[২]

Abstract

Fish wastes (such as viscera, fin, skin and flesh) contain high amount of protein, lipid and minerals. There is a need for developing methods for use of these valuable wastes into human food or animal feed to reduce costs and increase benefit. Considering the easy method involved and low-cost inputs required, the fish wastes can best be utilized into powder fish silage production. Fish silage has very good nutritive value. So it can be very vitally used as a feed supplement in aquaculture to convert nutrients into flesh. It is a dry product fortified with protein and can be kept stable at ambient temperature for up to 1 year. Besides, utilization of least-cost fishery wastes into powder fish silage can minimize feed costs and thus reduces cost of aquaculture production. In order to make it popular and encourage commercial production of this valuable feed, detailed production technology including equipment and utensils needed and raw materials and ingredients used, have been presented. Finally, a simple cost-benefit analysis is provided to realize the profitability of such production.

মৎস্য সাইলেজ (Fish Silage)

সহজ কথায় 'মৎস্য সাইলেজ' বলতে বুঝায় 'তরলিকৃত মাছ'। মাছ বা মাছের উচ্ছিষ্টকে (যেমন- নাড়িভুঁড়ি, পাখনা, চামড়া, কাঁটা বা ফেলে দেয়া মাংস) শক্তিশালী এসিডের মাধ্যমে হাইড্রোলাইসিস করে তরলে পরিণত করে মাছের সাইলেজ তৈরি করা হয়। তরল সাইলেজে শুকনো খাদ্য-উপকরণ (যেমন- কুঁড়া, ভুসি, খৈল, আটা ইত্যাদি) মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে "শুকনো সাইলেজ" তৈরি করা যায়। শুকনো সাইলেজ মূলত আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য হলেও এতে আমিষের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে স্নেহ, ফাইবার ও খনিজ পদার্থ থাকে। মাছের সাইলেজ তরল বা শুকনো- যাই হোক না কেন, এটি মাছ, চিংড়ি, হাঁস-মুরগি ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মাছচাষে সাইলেজের ভূমিকা (Importance of Fish Silage in Aquaculture)

মাছের উচ্ছিষ্টে (যেমন- নাড়িভুঁড়ি, পাখনা, চামড়া বা হাড়-মাথায় লেগে থাকা মাংসে) যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ, স্নেহ ও খনিজ পদার্থ থাকে। এ মূল্যবান উচ্ছিষ্ট ফেলে না দিয়ে এ থেকে মানুষ, গবাদিপশু বা চাষকৃত প্রাণীর জন্য খাদ্য তৈরি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। পদ্ধতির সহজতায় ও উপকরণের সহজ প্রাপ্যতায় মাছের উচ্ছিষ্টকে সাইলেজে রূপান্তর সবচেয়ে কার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছে। মাছের শুকনো সাইলেজ একটি উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন শুকনো সম্পূরক খাবার বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। মাছচাষে শুকনো সাইলেজের ব্যবহার খুবই ফলদায়ক হয়েছে। পুকুরে ব্যবহার করে সাইলেজের পুষ্টি উপাদানকে সহজেই মাছের মাংসে রূপান্তর করা যায়। অন্যদিকে শুকনো সাইলেজকে সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় এক বছর পর্যন্ত পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন রেখে সংরক্ষণ করা যায়। পাশাপাশি উচ্ছিষ্টকে খাবারে রূপান্তর করে মাছের খাবার খরচ ও চাষের খরচ – উভয়ই কমানো যায়।

মৎস্য সাইলেজের ব্যবহার (Uses of Fish Silage)

মাছ ও অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুতে মাছের সাইলেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিম্নে এর কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:

মৎস্য খাদ্য (Fish Feed)

উচ্ছিষ্ট থেকে সাইলেজ উৎপাদন ও মাছের খাদ্য হিসেবে এর সম্ভাবনাময় ব্যবহার নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ফিসমিল বা অন্যান্য তৈরিকৃত মৎস্য খাদ্যের কাঁচামালের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সাইলেজের আমিষ বেশি পুষ্টিমানসম্পন্ন। তাছাড়া সাইলেজের তুলনামূলক কম দামের কারণে মাছ চাষে এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক মাছের পুকুরে ফিসমিলের পরিবর্তে সাইলেজ ব্যবহার করলে মাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তেলাপিয়া, সামন ও আফ্রিকান কাটফিশ চাষে সাইলেজের ব্যবহার অনন্য ভূমিকা রাখছে। পিংক আবালনির ক্ষেত্রে সাইলেজ প্রাকৃতিক খাদ্যের (যেমন- মাইক্রোঅ্যালজি) বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রুই-কাতলা বা মৃগেল মাছের রেণু এবং অন্যান্য অসংখ্য মাছের ধানী পোনা লালন-পালনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

হাঁস-মুরগির খাদ্য (Poultry Feed)

মাছের সাইলেজ হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী ভূমিকা পালন করে। ব্রয়লার মুরগিকে সয়াবিন মিলের পরিবর্তে মাছের সাইলেজ খাওয়ালে গড় বৃদ্ধিতে তেমন পরিবর্তন হয় না। ডিমপাড়া মুরগীর ক্ষেত্রে পুরো ফিসমিলের ৫০% সাইলেজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হলেও ডিমের গুণগতমানে কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার হাঁসের ক্ষেত্রেও ফিসমিলের পরিবর্তে শুকনো সাইলেজ খাওয়ালে উৎপাদন একই থাকে

পশু খাদ্য (Cattle Feed)

অনেক দেশে মাংস উৎপাদনকারী গরুকে ফিসমিলের পরিবর্তে মাছের সাইলেজ খাওয়ানো হয়। উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে শীতের সময়ে দুগ্ধবতী গাভীকে প্রতিদিন এক কেজি সাইলেজ খাওয়ালে দুধ দেয়ার পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়ে। মরক্কো ও কেনিয়াতে ভেড়ার খাদ্যে সফলভাবে মাছের সাইলেজ ব্যবহার করা হয়। শুকরের ক্ষেত্রে ফিসমিলের বদলে মাছের সাইলেজ খাওয়ালে বৃদ্ধি বেশি হয়। শতকরা চার ভাগ ফরমিক এসিড সহযোগে তৈরি তেলাপিয়ার সাইলেজ শুকরের বৃদ্ধিতে পেরুভিয়ান ফিসমিল- অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ফিসমিলের মতোই কাজ করে।

পাখির খাদ্য (Bird Feed)

পাখির খাদ্য তৈরিতে মাছের সাইলেজ এক নম্বর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পোল্যান্ড ও ডেনমার্কে ষাটের দশক থেকে পাখির খাদ্য তৈরির জন্য বাণিজ্যিকভিত্তিতে মাছের সাইলেজ ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে মাছের শুকনো সাইলেজ উৎপাদন (Production of Fish Silage in Bangladesh)

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগের আধুনিক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ গবেষণাগারে একদল গবেষক মাছের উচ্ছিষ্টাংশ থেকে শুকনো সাইলেজ তৈরির একটি কার্যকর বাণিজ্যিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। চারটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শুকনো সাইলেজ তৈরি করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

- মাছের উচ্ছিষ্টকে ঘরে সংরক্ষণযোগ্য শুকনো খাদ্যে পরিণত করা;
- শুকনো সাইলেজকে ফিসমিলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা;
- মাছ চাষে তুলনামূলক সস্তা আমিষসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান দেওয়া এবং
- দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

শুকনো সাইলেজ তৈরি (Preparation of Fish Silage)

এ মূল্যবান খাদ্য তৈরির বাণিজ্যিক উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও জনপ্রিয় করা এবং নতুন উদ্যোক্তাদের নিকট ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এর উৎপাদন পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও উপকরণ এবং লাভ-খরচের হিসাব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো:

মৎস্য সাইলেজ তৈরির কারণ (Reasons of Fish Silage Production)

- সাইলেজের কাঁচামাল ও উপকরণ খুব সহজে পাওয়া যায়;
- প্রযুক্তিটি সহজ হওয়ায় সামান্য প্রশিক্ষণে যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি এটি তৈরি করতে পারে;
- খুব বেশি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না;
- এর উৎপাদন ব্যয় খুব কম;
- মৎস্য খামারে এটি তৈরি করা যায় এবং
- অনেকদিন পর্যন্ত শুকনো সাইলেজকে ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

মৎস্য সাইলেজের বাণিজ্যিক উৎপাদন পদ্ধতি (Method for Commercial Production of Fish Silage)

মাছ বাজার থেকে উচ্ছিষ্টাংশ (নাড়িভুঁড়ি, চামড়া ইত্যাদি) সংগ্রহ করে কাঠের হামান বা ইলেকট্রিক ব্লেন্ডারে চূর্ণ করে নেয়া হয়। অতঃপর চূর্ণীকৃত তরল একটি কাঁচের খোলা পাত্রে নেয়া হয়। এবার সাবধানতার সাথে প্রতি কেজি উচ্ছিষ্টে ৩০-৪০ মিলি ফরমিক এসিড ঢালতে হয়। অতঃপর মিশ্রণটি নাড়াচাড়া করতে হয় যাতে ভালভাবে এসিড মিশতে পারে। এসিড ঢালার সাথে সাথেই সাইলেজ তৈরি শুরু হয়ে যায়। তাই সুষম হাইড্রোলাইসিসের জন্য কিছুক্ষণ পর পর মিশ্রণটি নাড়াচাড়া করতে হয়। তবে নাড়াচাড়ার সময় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কক্ষ তাপমাত্রায় পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস ঘটতে ৪-৫ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। এ সময়ের মধ্যে মাছের নাড়িভুঁড়ি ও মাংসল অংশ হাইড্রোলাইসিস হয়ে তরলে পরিণত হয়। এরপর তরল অংশকে ছেঁকে কাঁটা বা হাড়-গোড় পৃথক করতে হয়। অতঃপর তরল সাইলেজে ২% সোডিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে পিএইচ প্রায় নিরপেক্ষ (পিএইচ ৬.৫) করতে হয়। এবার শুকনো সাইলেজ তৈরির জন্য তরল সাইলেজের সাথে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল মানের চালের কুঁড়া মেশাতে হয়। এ মিশ্রণকে ২ দিন রোদে ও কয়েক ঘণ্টা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেনে শুকিয়ে নিতে হয় যাতে পানির পরিমাণ ১০-১২% এর মধ্যে থাকে। এবার মিশ্রণকে ব্লেন্ডারে ভালভাবে গুঁড়া করে এয়ার-টাইট পলিথিন ব্যাগে ভরে ফেলতে হয়।

শুকনো সাইলেজ তৈরিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি (Apparatus and Materials Required for Production of Fish Silage)

শুকনো সাইলেজ তৈরির জন্য খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। যন্ত্রপাতির মধ্যে দরকার - (ক) ইলেকট্রিক ব্যালান্স; (খ) ব্লেন্ডার; (গ) গুঁড়া করার মেশিন; (ঘ) মাপার যন্ত্র; এবং (ঙ) প্যাকেট সিলিং মেশিন। প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে (ক) নাড়িভুঁড়ি; (খ) ফরমিক এসিড; (গ) সোডিয়াম কার্বনেট; (ঘ) চালের কুঁড়া; এবং (ঙ) পলিথিন ব্যাগ।

শুকনো সাইলেজের গুণগত মান (Proximate Composition of Fish Silage)

গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদিত সাইলেজের উন্নত গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে। শতকরা ১০-১১ ভাগ পানি সম্বলিত শুকনো সাইলেজে নিম্নবর্ণিত পুষ্টি উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে :

পুষ্টি উপাদান ও বৈশিষ্ট্য	পরিমাণ
আমিষ	২০.৮৪%
স্নেহ	৩৩.৭৩%
খনিজ পদার্থ	১৪.০৫ %
ফাইবার	৬.৬১%
শর্করা	১৩.৯৪%
পানি	১০.৮৩%
পিএইচ	৬.০-৭.০
গুঁড়ার আকার	০.২-৪.০ মিলি

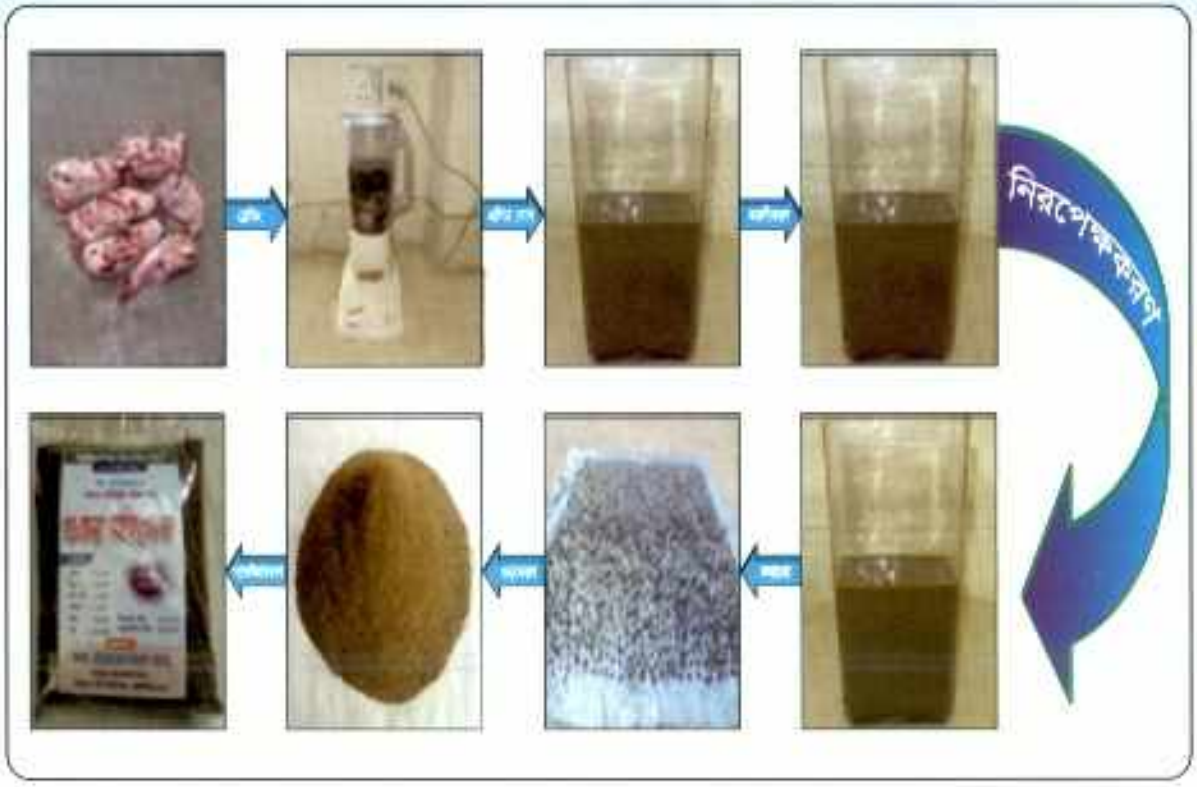

চিত্র: শুকনো সাইলেজ উৎপাদন পদ্ধতি

উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা
(Production Cost and Profit)

উপকরণ সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় মাছের খাদ্য হিসেবে শুকনো সাইলেজ উৎপাদন বেশ লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে শুকনো সাইলেজ তৈরির উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার হিসাব নীচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো

সারণি : ফিস সাইলেজ উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা

সীমিত আকারে ১০০ কেজি শুকনো সাইলেজ উৎপাদনের জন্য উৎপাদন ব্যয়			
দ্রব্য	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মূল্য (টাকা)
নাড়িভুঁড়ি (তাজা)	১৫০ কেজি	স্বল্পমূল্য	২০০.০০
অজৈব এসিড	৪.৫ লিটার	১৫০.০০	৬৭৫.০০
সোডিয়াম কার্বনেট	২ কেজি	৬০.০০	১২০.০০
চালের কুঁড়া	৪৫ কেজি	১০.০০	৪৫০.০০
মজুরি	৮ কর্মঘণ্টা	৪০.০০	৩২০.০০
উৎপাদন ব্যয় ১০০ কেজি			১৭৬৫.০০
প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ			১৭.৬৫
প্রতি কেজি ২৫.০০ হারে ১০০ কেজির বিক্রয় মূল্য			২৫০০.০০
প্রতি ১০০ কেজিতে মুনাফা			৭৩৫.০০

এটি একটি সাধারণ আয়-ব্যয়ের হিসাব। এখানে অনেক খরচ দেখানো হয়নি। আবার বাণিজ্যিকভিত্তিতে অধিক পরিমাণ উৎপাদিত হলে উৎপাদন ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে যাবে এবং মুনাফা বেড়ে যাবে। তবে উল্লিখিত সাধারণ আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে শুকনো সাইলেজ উৎপাদন বেশ লাভজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

উপসংহার
(Conclusion)

শুকনো সাইলেজ উৎপাদন পদ্ধতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের আধুনিক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। উৎপাদিত শুকনো সাইলেজের সংরক্ষণ গুণও প্রায় বছরাধিক কাল ধরে পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় মাছের উচ্ছিষ্ট থেকে অতি সহজে উন্নত মানসম্পন্ন ও সংরক্ষণযোগ্য শুকনো সাইলেজ উৎপাদন করা সম্ভব। আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে যে কোনো গ্রামীণ উদ্যোক্তা অতি সহজেই লাভজনকভাবে শুকনো সাইলেজ উৎপাদন করে অবশ্য একটি সম্ভাবনাময় মাছের ব্যবসার নয়া দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

---
[1]প্রফেসর, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
[2]প্রাক্তন শিক্ষার্থী, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দূষণের সম্ভাব্য উৎস শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

Identification of Probable Source and Control of Chemical Contamination in Fish and Fish Products

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস[1] ও মোঃ বেলাল হোসেন[2]

Abstract

Contamination of fish and fish products by different harmful chemical substances is considered as major food safety concern to the consumers. Based on the requirements of global consumers, Department of Fisheries (DoF) has so far identified twenty five substances under nine major groups as chemical contaminants coming in live fish and shrimp. These contaminants are mostly derivatives and metabolites of different banned or controlled antibiotics, hormones and steroids, toxic chemicals, pesticides, dyes and toxins deposited as tissue bonded residues in fish and shrimp flesh. Studies revealed that sources of such chemical contaminants are mainly due to unethical use of drugs at different stages of aquaculture and in fish feed. Department of Fisheries as competent authority food safety issues of fisheries products has taken several measures to monitor and control these contaminations. To control contamination at backyard chain of farming, country has promulgated fish feed and fish hatchery acts and rules and to monitor the residue status, government has been implementing National Residue Control Plan (NCRP) with the support of required policy guidelines. Since 2009, DoF has been conducting laboratory test of over thousands of risk based samples collected from the farms. It was reported a down trend in the contamination over the year of monitoring from the test result. In order to ensure production of safe fish and shrimp for human consumption, coverage of NRCP should be increased and effective implementation of regulatory tools with required logistic support is essential.

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মোট ৩২.৬০ লক্ষ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদিত হয় যার মধ্যে প্রায় ৮৪,৯০০ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় ৪৬১৩ কোটি টাকা আয় হয়। অধিক মৎস্য উৎপাদন, আমিষের চাহিদা পূরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যের (safe food) বিষয়টি এখন বিশ্বব্যাপী সময়ের দাবি। অধিক মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে জলাশয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ও মৎস্যখাদ্য ব্যবহার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহার বা প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হওয়া অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে ব্যবহার বা সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ঘটে থাকে। দেশি ও বিদেশি ভোক্তার স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান বজায় রাখার নিমিত্ত সরকার যুগোপযোগী একাধিক আইন, বিধিমালা ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (এনআরসিপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবাঞ্ছিত রাসায়নিক দূষণের স্বরূপ ও উৎস পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

রাসায়নিক রেসিডিউ (Chemical Residue)

সাধারণত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের কোন পর্যায়ে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবশিষ্টাংশ রূপে দেহকোষে থেকে যেতে পারে যা রেসিডিউ নামে পরিচিত। মাছের মাংসে এ ধরনের রেসিডিউ এর উপস্থিতিকে মৎস্য দূষণ বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো রাসায়নিক রেসিডিউ-এর প্রভাবে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

এনআরসিপি-এর আওতায় পর্যবেক্ষণকৃত রাসায়নিক রেসিডিউসমূহ (Chemical Residues Monitored Under NRCP)

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানিকারক দেশসমূহ বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ও ইউএসএফডিএ (USFDA) রাসায়নিক রেসিডিউজনিত দূষণ সম্পর্কে খুবই সচেতন। ইউরোপীয় রেগুলেশনের ওপর ভিত্তি করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০, হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০৮) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এরূপ বিধিবিধানের আলোকে মাছ, চিংড়ি ও খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে রাসায়নিক রেসিডিউ দূষণ মাত্রা ও উৎস শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

সারণি: মৎস্যে রাসায়নিক দূষণ উপাদানের তালিকা

রাসায়নিক গ্রুপ	রাসায়নিক দূষণ উপাদান
A_1	স্টিলবিন (Stilbenes) ও এর লবণসমূহ এবং এস্টারসমূহ (Esters)
A_3	স্টেরয়েডসমূহ (Steroids) ও আন্তঃজৈবিক স্টেরয়েডসমূহ
A_6	নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotics)
B_1	অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল পদার্থ (Antibiotics and antibacterial substances)
$B_2(a)$	এনথেলমিন্টিক্স (Anthelmintics, anti-helmintics)
$B_3(a)$	অর্গানোক্লোরাইড (Organochloride) কীটনাশক
$B_3(c)$	বিষাক্ত ভারি ধাতব পদার্থ (Toxic heavy metal)
$B_3(d)$	মাইকোটক্সিন (Micotoxin)
$B_3(e)$	রঞ্জক (Dyes)

মাছে রাসায়নিক রেসিডিউ অনুপ্রবেশের সম্ভাব্য পাথওয়ে ও শনাক্তকরণ (Probable Pathways of Residue Contamination in Fish and its Identification)

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক রেসিডিউ বিভিন্ন উপায়ে অনুপ্রবেশ করে দূষণ ঘটাতে পারে। নিম্নে মাছে রাসায়নিক রেসিডিউ অনুপ্রবেশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

১. **গ্রুপ A_1-স্টিলবিন্স:** মাছ চাষে রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণে থেরাপিউটেন্ট (Therapeutant) হিসেবে স্টিলবিন্স ব্যবহৃত হয়। ডাই-ইথাইল স্টিলবেস্ট্রল (DES) এবং হেক্সাস্ট্রল এ গ্রুপের রেসিডিউ যা মানবদেহে ক্যান্সার উদ্দীপক। ইউরোপ, আমেরিকা, বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নত দেশে খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণীতে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে মাছের নমুনা পরীক্ষণে এ জাতীয় রাসায়নিক উপাদানের কোনো উপস্থিতি পাওয়া যায় নি।

২. **গ্রুপ A_3-স্টেরয়েড:** টেস্টোস্টেরোন, ১৯-নর-টেস্টোস্টেরন এবং ১৭-ইস্ট্রাডায়ন এ গ্রুপের হরমোন যা সাধারণত গবাদিপশু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত হয়। মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদনে মিথাইল টেস্টোস্টেরোন হরমোন ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রয়োগমাত্রা সীমিত করে (সর্বাধিক ৫০মিগ্রা/কেজি ফ্রাই ফিড) এবং কমপক্ষে ৩৫ (পাঁচ) মাস লালন-পালন করলে এ রেসিডিউ মাছে থাকে না। অনেক সময় হরমোন ব্যবহৃত হ্যাচারির পানি মাছ চাষের পরিবেশে মিশে গেলে মাছে এ ধরনের রেসিডিউ এর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এজন্য এ ধরনের হ্যাচারির পানি ফিল্ট্রেশন পদ্ধতিতে একটি জলাধারে কয়েক মাস ধরে রেখে পরবর্তীতে বর্জ্য তলানিতে পড়ে গেলে পানি নিষ্কাশন করা উচিত। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ল্যাবরেটরিতে মৎস্য নমুনা পরীক্ষণে এ ধরনের রেসিডিউ এর কোনো উপস্থিতি পাওয়া যায় নি।

৩. **গ্রুপ A_6-নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক্স:** নাইট্রোফিউরান ও ক্লোরামফেনিকল এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ড্রাগ। নাইট্রোফিউরান গ্রুপের রেসিডিউ এর মধ্যে AOZ (3-amino-2-oxazolidinone), AMOZ (3-Amino-5-morphs Linomethyl-2-oxazol), AHD (1,Aminchydantoin), SEM (Semicarbazide) উল্লেখযোগ্য যা যথাক্রমে ফুরাজলিডন, ফুরালটাডোন, নাইট্রোফুরানটয়িন, নাইট্রোফুরাজন নামক উপাদান হতে মাছ বা চিংড়ির মাংসে সংশ্লেষিত আকারে থাকতে পারে। এটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারক বলে ইউরোপ, আমেরিকা, বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। সাধারণত মৎস্যখাদ্য, খাদ্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত ফিসমিল, মিট ও বোনমিল, ব্লাড মিল প্রভৃতি হতে সরাসরি মাছে/চিংড়ির দেহে প্রবেশ করতে পারে কিংবা গরুর গোবর, মুরগির বিষ্ঠা পানিতে মিশে দূষণের মাধ্যমে মাছ/চিংড়ির দেহে প্রবেশ করতে পারে যদি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে প্রাণীর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। ক্লোরামফেনিকল একটি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক এটি তুলনামূলক সস্তা ও অতীতে সহজপ্রাপ্য ছিল। অতীতে মৎস্যচাষে এর ব্যবহার হলেও বর্তমানে এটির ব্যবহার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. **গ্রুপ B_1-এন্টিবায়োটিক্স এবং এন্টিব্যাক্টেরিল পদার্থ:** টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরো টেট্রাসাইক্লিন এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এন্টিবায়োটিক। ব্যাকটেরিয়াঘটিত জীবাণু আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এ ধরনের এন্টিবায়োটিক খাদ্যের সাথে মাছ/চিংড়িকে খাওয়ানো হয়। সাধারণত ফিসফিডে এ জাতীয় এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। যদিও মাছ/চিংড়িতে এ ধরনের রেসিডিউ এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ১০০ পিপিবি।

৫. **গ্রুপ B_2(a)-অ্যানথেলমিন্টিক্স:** এ গ্রুপের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে Albendazole, Mebendezole, Fenbendazole & Flubendazol প্রভৃতি। প্রাণীর কৃমিজাতীয় পরজীবীর চিকিৎসায় এ গ্রুপের রাসায়নিক উপাদানসমূহ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে মাছ/চিংড়ির নমুনায় এ গ্রুপের উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র ফ্লুবেনডাজল এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। যদিও মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে এখন পর্যন্ত মাছ ও চিংড়িতে এ ধরনের কোনো উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি।

৬. **গ্রুপ B_3(a)-অরগানোক্লোরাইড কীটনাশক:** সাধারণত শস্যক্ষেতে পোকামাকড় নিধনে অর্গানোক্লোরাইড কীটনাশক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অল্ড্রিন, ডাইএলড্রিন, এন্ড্রিন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর উল্লেখযোগ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় পরিবেশে প্রয়োগের পরে রেসিডিউগুলো ধীরে ধীরে ভাঙ্গে ও পরিবেশে অবস্থান করে। একই পরিবেশে মাছ চাষ করা হলে মাছের খাবারের সাথে কিংবা শস্যক্ষেত থেকে বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এসে মাছের দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে। মাছ কিংবা মানুষের দেহে অর্গানোক্লোরিন রেসিডিউ প্রবেশ করলে বিভিন্ন ধরনের একিউট এবং ক্রোনিক জাতীয় রোগের লক্ষণ দেখা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের দেহে উক্ত রাসায়নিক রেসিডিউ জমা হতে থাকলে মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট, টিউমার এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

৭. **গ্রুপ B_3(c)-বিষাক্ত ভারি রাসায়নিক ধাতব পদার্থ:** আর্সেনিক, শিশা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ভারি রাসায়নিক ধাতব পদার্থ এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত কলকারখানা থেকে নিষ্কাশিত ভারী ধাতু পানিতে মিশে দূষণ ঘটতে পারে। ভারী রাসায়নিক ধাতব পদার্থ দ্বারা দূষিত পানিতে মাছ চাষ করা হলে উক্ত মাছ ও ভারী পদার্থ দ্বারা দূষিত হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে এসব

দূষিত মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষও কালক্রমে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।

৮. গ্রুপ B_2(d)-মাইকোটক্সিন: মাইকোটক্সিন হলো এক ধরনের সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস যা ছত্রাক গ্রুপের অণুজীব হতে উৎপন্ন হয়। সংরক্ষণ করা না হলে *Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Fusarium, Penicillium* প্রভৃতি অণুজীব অনুকূল পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় ফিস ফিড বা খাদ্য উপাদানে এ জাতীয় টক্সিন উৎপন্ন করে যা তাপেও সহজে নষ্ট হয় না। বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যখাদ্যে *Aspergillus* কর্তৃক উৎপাদিত আফলাটক্সিন (A^1, B^1, G^1, G^2) এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। এ ধরনের টক্সিন মৎস্যখাদ্যের মাধ্যমে মাছ এবং মানবদেহে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে *Deoxynivalenol, Zearalenone, Fumonisin, OchratoxinA* মাইকোটক্সিন মৎস্য খাদ্য ও খাদ্য উপাদানে লক্ষ্য করা যায়।

৯. গ্রুপ B_1(e)-রঞ্জক: মাছ চাষে জীবাণুনাশক হিসেবে রঞ্জক (Dyes) ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও বর্তমানে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যখাদ্যে মেলাকাইট গ্রিন, ক্রিস্টাল ভায়োলেট এবং এর মেটাবলাইট যথাক্রমে লিউকোমেলাকাইট গ্রিন ও লিউকোক্রিস্টাল ভায়োলেট এর উপস্থিতি যাচাই করা হয়। মৎস্য খাদ্যে রঞ্জকের উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

রাসায়নিক রেসিডিউ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সাফল্য ও করণীয় (Success and Future Measures to Control Residue Contaminants)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের গাইডলাইন অনুসারে দূষণমুক্ত মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণে মৎস্য অধিদপ্তরের কিছু ফলপ্রসূ কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

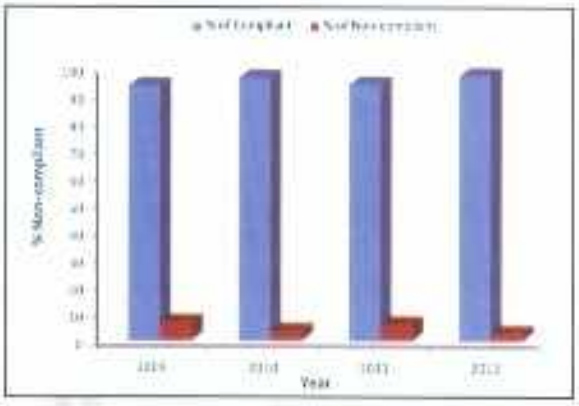

চিত্র: মৎস্যে রাসায়নিক রেসিডিউ এর উপস্থিতির তুলনামূলক হার (২০০৯-২০১২)

- ২০০৯ সাল থেকে এনআরসিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন;
- মৎস্য খাদ্য ও মৎস্য হ্যাচারি আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে ও বাস্তবায়ন হচ্ছে;
- মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালায় সময়োপযোগী সংশোধন আনা হয়েছে;
- মৎস্য মান পরীক্ষায় নিয়োজিত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন তিনটি ল্যাবরেটরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে;
- মাঠ পর্যায়ে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে চাষি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলছে; এবং
- ফলশ্রুতিতে, মৎস্য ও চিংড়িতে রাসায়নিক রেসিডিউজনিত রাসায়নিক দূষণের মাত্রা ৬.৩২% (২০০৯ সাল) থেকে কমে ২.৫% এ (২০১২ সাল পর্যন্ত) নেমে এসেছে।

দূষণমুক্ত মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় (Future Measures to Ensure Contamination Free Fish Production and Supply)

- জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (NRCP) এর পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা;
- মৎস্যখাদ্য মনিটরিং এর আওতায় সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার ফলাফল নন-কম্প্লায়েন্স হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১১ সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;
- মৎস্যখাদ্য বা খাদ্য উপকরণ আমদানি প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা;
- অ্যাকোয়াকালচারে অনুমোদিত ঔষধসমূহের মোড়কে উৎপাদন তারিখ, ব্যবহারের শেষ তারিখ এবং উইথড্রল পিরিয়ড যথাযথভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;
- রেসিডিউ পরীক্ষার সকল ল্যাবরেটরিতে ISO ১৭০২৫ অনুসরণে কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে; এবং
- চাষি পর্যায়ে মৎস্য রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণে আইন বাস্তবায়ন

উপসংহার (Conclusion)

জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য দূষণের উৎস শনাক্তকরণের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। এজন্য শুধুমাত্র মৎস্যপণ্য নয় মাংস, দুধ, ডিম, শাকসবজি ও ফলমূলে যে রাসায়নিক দূষণ তা নিয়ন্ত্রণে সারাদেশের বিভিন্ন উৎস হতে এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি নির্ণয় করে তা প্রতিরোধে জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার এখনই সময়।

ফাইবার গ্লাস বোট : জেলেদের নিরাপত্তায় সাম্প্রতিক উদ্যোগ

Fibre Glass Boat : A Recent Initiative for Safe Livelihoods of Coastal Fishers

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান[১] ও ড. আ ন ম আজিজুল ইসলাম খান[২]

Abstract

Bangladesh has enriched capture fisheries resources to support fishers' livelihood. Generally fishers' profession is a challenging and risky one. Fishing in coastal and marine waters of Bangladesh is always more risky than that of other countries. Most of the countries introduced FRP fishing boat for fishers' safety and secured livelihoods in the recent past. Department of Fisheries and FAO has introduced and distributed this smart fishing boat and among the coastal fishers of Bangladesh in 2010-11. The design of the FRP fishing boats has been improved to make it more convenient and acceptable by the fishers following a feasibility study during implementation. FRP fishing boat is highly durable and does not sink and rust. It is easy to drive and favours the secured livelihood of the fishers. Entrepreneurship of FRP bot making industry has already been developed in the country. Now FRP boat builders need to create friendly marketing environment. Successful FRP boat marketing could be a new era in safe fishing and it will also contribute to protect the green forest retarding the use of wooden boat that will ultimately help to save the nature.

স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ সর্বত্র যানবাহনের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটলেও বাংলাদেশে জেলে সম্প্রদায়ের নৌকা ব্যবহারে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া তেমন লাগেনি বললেই চলে। সে কোন সুদূর অতীতে মৎস্য শিকারে ভেলা থেকে কাঠের নৌকার উত্তরণ ঘটেছিল। সম্প্রতি ইঞ্জিন যুক্ত হয়ে স্বল্প সংখ্যক মৎস্য আহরণের নৌকা যান্ত্রিক রূপ নিয়েছে বটে তবে তা সামগ্রিক সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের সৌজন্যে কয়েকটি ইস্পাতনির্মিত অত্যাধুনিক ট্রলারের ব্যবহার ঘটেছে ঠিকই কিন্তু সাধারণ মৎস্যজীবী/জেলে সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য আধুনিক ফাইবার গ্লাস নৌকার প্রচলন এখনো প্রায় অধরাই।

মৎস্য আহরণ পৃথিবীর বিপদসঙ্কুল পেশাগুলোর অন্যতম। তন্মধ্যে বাংলাদেশের সুবিশাল নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, মোহনা, উপকূলীয় অঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। এ উন্মুক্ত জলরাশিতে আমাদের মৎস্য আহরণকারী মাছ আহরণ করে নিরন্তর আমাদের প্রাণিজ প্রোটিনের অন্যতম উৎস মাছের যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে জেলেদের জীবন এবং সম্পদহানির সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ক্ষুদ্র এবং অনিরাপদ জলযান এ ক্ষতির অন্যতম কারণ।

ফাইবার গ্লাস বোট
(Fibre Glass Boat)

ফাইবার গ্লাস বোট সাধারণত এফআরপি (fibre reinforced plastic) বোট বা জিআরপি (glass reinforced plastic) নৌকা নামেই সারাবিশ্বে পরিচিত। এছাড়াও ফাইবার গ্লাস রিইনফোর্সড পলিয়েস্টার (fibreglass reinforced polyester), রেজিনগ্লাস (resinglass) কিংবা গ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (glass reinforced plastic) নৌকা নামেও পরিচিত। ফাইবার গ্লাস বোট তৈরির প্রধান উপকরণ হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের/ডিজাইনের মোল্ড বা ডাইস। নৌকার ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে মোল্ড তৈরি করতে হয় বা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ফলে ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন সাইজের নৌকা নির্মাণ সহজ নয়। নৌকার ডিজাইন ও মোল্ড তৈরি অত্যন্ত জটিল কারিগরি বিষয়। প্রচলিত ডিজাইন অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ সহজ ও সাশ্রয়ী হয়। মোল্ড ব্যবহার করে অনেক কিছুর (প্রধানত ফাইবার গ্লাস ও রেজিন) যথাযথ মিশ্রণের মাধ্যমে এটিকে তৈরি করা হয়ে থাকে। কাঠনির্মিত নৌকার যেমন কাঠের টুকরোগুলো শক্তিশালী আঠা এবং লোহার পিন দিয়ে আটকানো থাকে, এফআরপি বোটের ক্ষেত্রে ফাইবার গ্লাস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি শক্তভাবে লেগে থাকে পলিয়েস্টার রেজিন দিয়ে। এখানে ফাইবার দেয় শক্তি এবং রেজিন ফাইবারকে শক্ত করে ধরে রাখে। তাছাড়া রেজিনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হার্ডনার এবং নৌকাকে মসৃণ করার জন্য জেলকোট ব্যবহার করা হয়। জেলকোটের সাথে কাঙ্ক্ষিত রঙের সংমিশ্রণে নৌকা সাদা, কাল বা অন্য পছন্দনীয় রংয়ের করা হয়। নৌকার বন্ডেড ফাইবার গ্লাসকে চপড্ স্ট্রান্ডেড ম্যাট বলা হয়ে থাকে।

ছবি: চপড্ স্ট্রান্ডেড ম্যাট

বাংলাদেশে সাধারণত ছোট ছোট মাছ ধরা নৌকা তৈরি হয় প্রধানত কাঠ, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে। কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরির সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কাঠ

দিয়ে নৌকা তৈরি বেশ জনপ্রিয়। বনজ সম্পদের ওপর চাপ কমানোর জন্য পরিবেশবাদীদের চাপে এবং নানাবিধ সুবিধার জন্য এখন মৎস্য আহরণের জন্য ফাইবার গ্লাস বোট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও কয়েক দশক আগে থেকে বাংলাদেশে ফাইবার গ্লাস বোট নির্মিত স্পিড বোটের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ফাইবার গ্লাস নির্মিত চেয়ার ব্যবহার করতে দেখা যায়। পানির ট্যাংক এবং বাথরুম ফিটিংস-এ ফাইবার গ্লাস সামগ্রীর ব্যবহারও লক্ষণীয়। ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে নৌকা ছাড়াও হালকা ধরনের স্পোর্টস কার, কায়াক, গ্লাইডার, বাচ্চাদের গাড়ী, ছাদের সামগ্রী, বায়ুকলের পাখনা, লরি ও মোটরগাড়ীর কাঠামো, বিমানের পার্টস, সুইমিং পুলের কাঠামো, পাইপ, স্টোরেজ ট্যাংক ইত্যাদি তৈরি করা হয়ে থাকে।

মাছ আহরণের জন্য ফাইবার গ্লাস বোট নির্মাণে সারাবিশ্ব এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। এর সঠিক কারণ অনুসন্ধান করে দেখা না হলেও সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, এফআরপি বোট নির্মাণ ব্যয় আপাতদৃষ্টিতে একটু বেশি বলে দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের পক্ষে তা ক্রয় দুঃসাধ্য। মাছ ধরার এফআরপি বোট বাজারজাত করা কঠিন হতে পারে ভেবে অথবা এর নির্মাণ কৌশলের অজ্ঞতার জন্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো এতদিন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে ইতোপূর্বে এদেশে এর প্রসার ঘটেনি।

ফাইবার গ্লাস বোট তৈরিতে বিবেচ্য বিষয় (Points to be Considered for Preparing Fibre Glass Boat)

এফআরপি বোট তৈরির সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তা হলো:

- **নৌকার ডিজাইন (Boat Design):** এফআরপি বোটের ডিজাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কতজন জেলে এ নৌকায় থাকবে, নৌকাটি কোথায় চলবে, প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ কতদিন মাছ আহরণ করা হবে, কী পরিমাণ মাছ আহরিত হবে, বরফ কতটুকু নেয়া দরকার হবে, কী কী যন্ত্র এতে থাকবে, নিরাপত্তার বিষয়গুলো কোথায় সন্নিবেশিত থাকবে এগুলোর সবকিছুই ডিজাইন তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে।
- **উৎপাদন ব্যয় (Production Cost):** এটি বিবেচনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে এটির স্থায়িত্বকাল, মেরামত ব্যয়, অপারেশনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য সামগ্রি দিয়ে তৈরিকৃত নৌকার চেয়ে পার্থক্য, প্রতি ট্রিপে সম্ভাব্য আয়, উৎপাদন ব্যয় কত বছরে উঠে আসবে ইত্যাদি।
- **অর্থের উৎস (Source of Fund):** অনেক ক্ষেত্রেই এককালীন অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা এর ব্যবহারকারীদের থাকে না। এ ক্ষেত্রে সহজ শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে কিনা। ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী কিস্তি সুবিধা প্রদান করে কিনা তা বিবেচনায় রাখতে হবে।
- **উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা (Suitabilty and Acceptability):** এ ধরনের নৌকা আমাদের জলাশয়ে পরিচালনা লাভজনক কিনা তা দেখতে হবে।

ছবি: এফআরপি নৌকা নির্মাণের য়ার্ড পরিদর্শন

- **উৎপাদনকারীর উৎপাদন ও মেরামত সক্ষমতা (Production and Repairability by the Producer):** উৎপাদনকারীর সঠিক ডিজাইন এবং মান বজায় রেখে নৌকা তৈরি এবং দেশের সর্বত্র মেরামতের সক্ষমতা আছে কিনা সেটাও বিবেচ্য।

প্রথম ব্যবহার (First Usage)

মৎস্য অধিদপ্তর ও এফএও-ইইউ কর্তৃক পরিচালিত 'সাপোর্ট টু অ্যাসিস্ট দ্য ভালনারেবল মার্জিনাল এন্ড স্মল ফার্মার্স টু ওভারকাম দ্য সোরিং প্রাইসেস অব ফুড অ্যান্ড ইনপুটস ইন দ্য ইমপোভারিশড এরিয়াজ অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরার জন্য ২৫টি এফআরপি বোট বিতরণ করা হয় এবং এভাবেই জেলেদের ব্যবহারের জন্য প্রথম এফআরপি বোটের প্রচলন ঘটে। প্রথম থেকেই এটির ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এ জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে পরবর্তী সময়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও এফএও কর্তৃক পরিচালিত ইসিআরআরপি প্রকল্পে কাঠের নৌকার পরিবর্তে ফাইবার গ্লাস বোট তৈরি ও বিতরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এজন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও এফএও-র সংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মকর্তা যৌথভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের বেতাগী এবং দশমিনা উপজেলাসমূহ পরিদর্শন করে ইতোপূর্বে বিতরণকৃত ফাইবার গ্লাস বোটের গ্রাহক ও সুফলভোগী মৎস্যজীবী, সাধারণ মৎস্যজীবী ও সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে ফাইবার গ্লাস বোটের আর্থসামাজিক উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। ফাইবার গ্লাস বোট ব্যবহারে মৎস্যজীবীগণের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। তবে দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত নৌকাগুলো আকারে ছোট এবং সাগর ও মোহনায় মাছ ধরার জন্য উপযোগী নয়। বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তরের পরামর্শে এফএও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং একজন আন্তর্জাতিক নাভাল আর্কিটেক্ট নিয়োগ করে সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী মাঝারি আকারের একটি উন্নত ডিজাইন প্রণয়ন করে। মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিজাইনটি অনুমোদিত হয়। বর্তমানে সংশোধিত ডিজাইনে নির্মিত ৫৮টি ফাইবার গ্লাস বোট নির্বাচিত জেলেদের

ছবি: প্রথম পর্যায়ে সরবরাহকৃত বোট

মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যা ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রশংসিতও হয়েছে। ফাইবার গ্লাস বোট প্রবর্তনের ফলে নিম্নবর্ণিত কারিগরি বিষয় ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে:

- ফাইবার গ্লাস বোট দ্রুততর গতিসম্পন্ন। মাছ আহরণ ক্ষেত্রে কম সময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সাধারণ নৌকার তুলনায় মাছ ধরার জন্য বেশি সময় পাওয়া যায় বিধায় অধিক মাছ ধরা সম্ভব হয় এবং মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।
- এটি হালকা বলে কাঠ কিংবা স্টিল নির্মিত নৌকার চেয়ে জ্বালানি ২৫% অপেক্ষা কম;
- ফাইবার গ্লাস বোটের স্থায়িত্বকাল ২৫-৩০ বছর যেখানে কাঠের নৌকার স্থায়িত্ব মাত্র ৩-৪ বছর;
- ফাইবার গ্লাস বোট ভাঙে না, এতে মরিচা ধরে না এবং পচে না;
- ঘনঘন মেরামতের প্রয়োজন হয় না;
- জীবন রক্ষার জন্য লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট, রাডার রিফ্লেক্টর, আয়না, রেডিও, হুইসেল, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, হ্যান্ড ফ্লেয়ার, ক্যাপসাইজ রোপ, ফার্স্ট এইড ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের জীবনরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে;
- মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফের বাক্স থাকায় অধিক সময় মাছ তাজা রাখা যায়;

ছবি: আধুনিক ডিজাইনের এফআরপি বোট

- ফাইবার গ্লাস বোট ইঞ্জিনযুক্ত এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ায় মৎস্যজীবীগণ এক স্থান থেকে অন্যত্র সহজেই চলাফেরা করতে পারে। ফলে মৎস্যজীবীদের পক্ষে মাছ ধরা অনেক সহজ হয়েছে;
- সরবরাহকৃত ফাইবার গ্লাস বোট বাংলাদেশ সরকার ও এফএও মনোগ্রামযুক্ত থাকায় এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ায় জলদস্যু, সন্ত্রাসীসহ অন্যান্য অবাঞ্ছিত হয়রানির শিকার হবার সম্ভাবনা কম;
- ফাইবার গ্লাস বোট প্রাপ্ত মৎস্যজীবীগণ মহাজনদের ঋণের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসছে;
- কাঠের নৌকার ন্যায় কঠোর কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় না এবং
- স্বল্প সময়ে দূরবর্তী স্থান থেকে তাজা মাছ নিয়ে ফেরত আসা যায় বিধায় মাছের মান সংরক্ষণ সহজতর হয়।

ছবি: সর্বশেষ সরবরাহকৃত উন্নত ডিজাইনের বোট

সীমাবদ্ধতা (Limitations)

- দেশে, বিশেষত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা তৈরির কারখানা নেই;
- উপকূলীয় অঞ্চলে ফাইবার গ্লাস বোট মেরামতের জন্য কোনো প্রয়োজনীয় দক্ষ কারিগর বা হাতের নাগালে মেরামত কারখানা নেই;
- প্রাথমিক ক্রয়মূল্য অনেকের পক্ষেই সাধ্যাতীত এবং
- নির্মাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ফাইবার গ্লাস বোট ব্যবহারে জেলে সম্প্রদায়/পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে মিডিয়া বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে কোনরূপ প্রচারণা নেই।

উপসংহার (Conclusion)

দেশের জেলেদের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ, মৎস্য আহরণের ব্যয় হ্রাস এবং আহরণ বৃদ্ধি, বাংলাদেশে বনভূমি তথা বৃক্ষরাজির উপর চাপ কমানো এবং মৎস্য আহরণকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে এফআরপি বোটের ব্যবহার বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে শ্রীলংকা, ভারত ও ফিলিপাইনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের নৌকা বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশে ফাইবার গ্লাস বোট তৈরির কারখানা বৃদ্ধি করে ফাইবার গ্লাস বোট মৎস্যজীবীদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখে উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বা অন্য কোনো উপায়ে এর বাজারজাত করা সম্ভব হলে হতদরিদ্র ও অবহেলিত মৎস্যজীবীগণ উপকৃত হবে। দেশে নৌকা নির্মাণ কাজে কাঠের ব্যবহার কমবে এবং বৃক্ষ নিধন কমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর সহায়ক প্রভাব ফেলে সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

[১] প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২] সহকারী পরিচালক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

অপ্রচলিত মৌসুমি জলাশয়-পদ্মা নদীর কোল : শুকনো মৌসুমে মাছচাষের নতুন সম্ভাবনা

Non-Conventional Waterbody - River Kole : A Recent Intervention of Fish Culture in Dry Season

এম আই গোলদার[১] ও ড. মোঃ আমিমুল এহসান[২]

Abstract

Fish culture in non-conventional waterbody-river kole in dry season is a recent intervention in the Northwest Bangladesh. The river Padma, one of the largest rivers, become shrinked and most of the river beds are dried up in dry season leaving some depressions (water pockets) along its narrow water flow. These depressions resemble small lake or large ponds are popularly called "kole or damosh". These koles remain uninundated only for 5 to 6 months till to next rainy season offering ample water area potential for aquaculture. Very recently unemployed youths and fishers nearer to the river koles were found to use these potential waterbodies for fish culture in Chapainawabganj Sader Upazila (Sub-district). A preliminary investigation was carried out from January to July'12 to assess the feasibility and to identify the problems and prospects of kole fish culture. Within 4 to 5 months of culture period, average 767kg/ha fish (including 42kg/ha non stocked wild fish) was produced with an average net profit of Tk. 38,000.00 per hectare against production cost of Tk. 37,000.00. It revealed that all the native and exotic species cultured except mrigal were found suitable for kole fish culture considering their growth performance. With the introduction of appropriate culture techniques through training and motivation, the present production level as well as net profit can be increased at least 2 to 3 times.

জনবহুল বাংলাদেশের মানুষের আমিষের নিরাপত্তা অনেকাংশে মৎস্য চাষের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য অপ্রচলিত জলাশয়-নদীর কোলে নতুনভাবে মৎস্যচাষের সুযোগ প্রাপ্তি অপুষ্টি নিরসনে এক নতুন সম্ভাবনা। পদ্মা এদেশের একটি বৃহৎ নদী যা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে বর্তমানে তার প্রমত্ত প্রবাহ হারিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ থাকলেও শুকনো মৌসুমে পানি কমে শুষ্ক বালুচরে পরিণত হয়। নদীর তলদেশে চর পড়ার কারণে কোথাও কোথাও পানি আবদ্ধ হয়ে ছোট ছোট লেক বা বড় বড় পুকুরের ন্যায় মৌসুমি জলাশয়ের সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এরূপ আবদ্ধ জলাশয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় স্থানীয়ভাবে 'কোল' বা 'দামোশ' নামে পরিচিত। প্রতি বছরই পদ্মা নদীগর্ভে শুকনো মৌসুমে 'কোল' সৃষ্টি হয়। কোলে মাছ চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে বেকার যুবক ও মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে কোলে মাছ চাষের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ও অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব যা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে ও পরোক্ষভাবে মৃদু প্রবাহমান নদীর বিদ্যমান মৎস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে। রাজশাহী অঞ্চলে পদ্মা নদীর বুকে জেগে ওঠা সম্ভাবনাময় এসকল অপ্রচলিত মৌসুমি জলাশয়ে মাছ চাষের সুযোগ সৃষ্টি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় ২০১০-১১ সাল থেকে কোল সংলগ্ন নদী তীরের আগ্রহী বেকার যুবক ও মৎস্যজীবীদের দু-একটি দলকে বিচ্ছিন্নভাবে এসব কোলে মাছ চাষ করতে দেখা যায়। নদীর কোলে মাছ চাষের ঘটনাটি সাম্প্রতিক হওয়ায় এ বিষয়ে কোনো জরিপ বা গবেষণালব্ধ তথ্য নেই। এ ধরনের জলাশয়ে প্রচলিত মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৩৩টি কোলে মৎস্যচাষ কার্যক্রম জরিপ ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য জরিপাধীন কোলে মাছ চাষি দলকে বিশেষ কোনো মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করা হয়নি। কোলে মাছ চাষের প্রচলিত পদ্ধতির ওপর পর্যবেক্ষণ ও তা উন্নয়নে করণীয় এ লেখায় বর্ণিত হয়েছে।

সম্ভাবনাময় পদ্মা নদীর কোল

(Potential of the Padma River Kole)

অব্যবহৃত ও অপ্রচলিত জলাশয় নদীর কোলে স্থানীয় বেকার যুবক ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত সুফলভোগী দলের মাধ্যমে মাছচাষ করা হলে বিকল্প কর্মসংস্থানের তথা দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শুকনো মৌসুমে জীবিকার

ছবি: পদ্মা নদীর কোলে পোনা ছাড়ার দৃশ্য

নির্বাহের জন্য মৎস্যজীবীরা নদীতে বা নদীর কোলসহ সব ধরনের জলাশয়েই মাছ আহরণের প্রচেষ্টা চালায়। সরেজমিনে ও মৎস্যজীবীদের সাথে মতবিনিময় করে জানা যায় এসব

কোলে বারংবার জাল টেনে এমনকি কোনো কোনো সময় বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমুদয় মাছ আহরণ করা হয়। ফলে পরিত্যক্ত কোলে সাধারণত দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধির বা বেড়ে ওঠার তেমন একটি সুযোগ থাকে না। নদীর কোলে স্থানীয় ও দলীয়ভাবে মাছ চাষ করা হলে এসব মৌসুমি জলাশয় থেকে একদিকে অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে এবং বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগে মাছ আহরণের ক্ষতিকর অভ্যাসও দূর হতে পারে। অন্যদিকে মাছ চাষে সার ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবহৃত হওয়ায় চাষকৃত মাছের সাথে সাথে কোলে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধিরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। যা পরোক্ষভাবে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

কোলের ভৌত অবস্থা

(Physical Condition of River Kole)

সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দিকে নদীর বুকে ১৫ থেকে ছোট বড় বিভিন্ন আকার ও গভীরতার কোল সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে কোলের আকার বড় থাকলেও শুকনো মৌসুমের শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে আকার ও গভীরতা হ্রাস পায়। জরিপকৃত সবচেয়ে বড় কোলের আয়তন ছিল ১৫.০ হেক্টর যা ক্রমান্বয়ে ৭.৪ হেক্টরে নেমে আসে। সবচেয়ে ছোট কোলের আয়তন ছিল ৫.৫০ হেক্টর যা ক্রমান্বয়ে ১.৭৫ হেক্টরে নেমে আসে। কোলের প্রারম্ভিক গড় গভীরতা ছিল ৩.৫০ মিটার যা পরবর্তীতে এসে দাঁড়ায় ২.৫০ মিটারে। জলজ আগাছার উপস্থিতি ও নিবিড়তা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে কোনো কোনো কোলে প্রচুর আঁশজাতীয় শৈবাল দেখা গেছে। কোলের পানি স্বচ্ছ তলদেশ সমতল ও অসমতল উভয় প্রকৃতির। অধিকাংশ কোলের তলদেশ বালুকাময় তবে কোনো কোনো কোলে কাদাযুক্ত তলদেশও পরিলক্ষিত হয়।

দেশীয় মাছের উপস্থিতি

(Abundance of Indigenous Species)

পদ্মা নদীর কোলে বাফুলে মাছ হিসেবে বোয়াল, শোল, গজার, টাকি, চাং, চিতল, ফলি ইত্যাদি পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাকৃতিক মাছের মধ্যে বাতাস, পটকা, বাইলা, টেংরা, গুচি, বাইম, পুঁটি, মলা, ঢেলা, ছিটা, পাবদা, লাড্ডিনা, গোল চান্দা, লম্বা চান্দা, চাপিলা, উড়ুল, রেওয়া, কাঁটা বাতাসি, আইড়, বাঘাইর, ঘাউরা, পিয়ালী, চেলা, পুঁইয়া, কাকিলা, কুই, কাজল, গুড়া চিংড়ি, গলদা চিংড়ি এমন কি কখনো কখনো ভেলা মাছও দেখা যায়।

কোলে মাছ চাষ

(Fish Culture in Kole)

জলাশয় প্রস্তুতির সময় অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণে ঘন ফাঁসের বেড় জাল ব্যবহার করতে দেখা যায়। কোলে প্রাকৃতিক খাবার তৈরির সুবিধার্থে জৈব এবং অজৈব সার প্রয়োগ করে পোনা মজুদ করা হয়। পোনা মজুদের পূর্বে সাধারণত চুন প্রয়োগ করা হয় না। তবে মজুদ পরবর্তী সময়ে কখনো কখনো চুন প্রয়োগ করা হয়। জলাশয় প্রস্তুতিকালে হেক্টর প্রতি ৩২০ কেজি জৈব সার, ৭০ কেজি ইউরিয়া এবং ৪৫ কেজি টিএসপি প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। দেশি ও বিদেশি কার্পের পোনা যেমন- কাতলা, রুই, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, কমনকার্প এবং গ্রাস কার্প মজুদ করা হয়। সংখ্যায় হেক্টর প্রতি গড়ে ১২২৫ টি এবং ওজনে হেক্টর প্রতি প্রায় ৩০০ কেজি বড় আকারের পোনা (ইয়ারলিং) মজুদ করা হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মাছের পোনা মজুদ সাধারণত ১৫-২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। মজুদ পরবর্তী সম্পূরক খাদ্য হিসেবে হেক্টর প্রতি ৩১৫ কেজি সরিষার খৈল এবং ১০৫ কেজি চাউলের কুঁড়া ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত প্রজাতি মিশ্রণ, মজুত ঘনত্ব নির্ধারণ, সার ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোলে মাছ চাষকে অধিকতর লাভজনক করার সুযোগ রয়েছে।

সারণি: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় পদ্মা নদীর কোলে প্রজাতিভিত্তিক পোনার মজুদ ঘনত্ব ও আহরণ কালীন ওজন

ক্রমিক নং	প্রজাতির নাম	মজুদ (সংখ্যা/হেক্টর)		মজুদের সময় প্রতিটির ওজন (গ্রাম)		আহরণের সময় প্রতিটির ওজন (গ্রাম)	
		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
০১	সিলভার কার্প	২৮০	৩২০	১৪০	৪০০	৮০০	২০০০
০২	বিগহেড কার্প	১৬০	১৯০	১৫০	৫৮০	৯০০	২২০০
০৩	কাতলা	১৫০	১৭৫	১১০	৫৩০	৬০০	১৫০০
০৪	রুই	১৮০	২২৫	১০০	২২০	৪৫০	১০৫০
০৫	মৃগেল	৮০	১২০	১০০	২৪০	৪২৫	৯০০
০৬	কমন কার্প	২৪৫	৩২৫	২৭০	৫৭০	১০০০	২৫০০
০৭	গ্রাস কার্প	১০	২৫	৩০০	৮০০	১১০০	২৫০০
	মোট	১,১১৫	১,৩৮০				

মাছ আহরণ

(Fish Harvest)

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও নদীতে পানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সচরাচর মে-জুন মাসে এবং কখনো কখনো জুন-জুলাই মাসে মাছ আহরণ সম্পন্ন করতে দেখা যায়। পর্যায়ক্রমে মাসব্যাপী মাছ আহরণ করা হয় এবং প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু মাছ বাজারজাত করা হয়। প্রতি হেক্টরে প্রায় ৪২ কেজি প্রাকৃতিক মাছসহ ৭৬৭ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণে প্রজাতিভিত্তিক মাছের আহরণকালীন ওজন বিবেচনায় মজুদকৃত সিলভার কার্প, বিগহেড, কাতলা, রুই, মৃগেল, কার্পিও এবং গ্রাস কার্পের মধ্যে বিগহেড, কার্পিও এবং সিলভার কার্পের বৃদ্ধির হার খুব ভাল ছিল। তবে মৃগেলের বৃদ্ধির হার কিছুটা কম ছিল। পর্যাপ্ত সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হলে রুই মাছের আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়। উপরের সারণিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মজুদের বিবরণ এবং মজুদকালের ও আহরণকালের একক ওজন উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

(Income and Expenditure Statement)

কোলে মাছ চাষের ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পোনা/মাছ, সম্পূরক খাদ্য ও সার ক্রয় এবং পাহারাদার বা শ্রমিক ব্যয় উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বন্যা প্রতিরোধের জন্য নেট ও বানা

ছবি: পদ্মা নদীর কোল হতে মৎস্য আহরণ

ক্রয় করা হয়। জরিপে দেখা যায় ৪-৫ মাস চাষকালে হেক্টর প্রতি প্রায় ৩৭,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩৮,০০০.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জিত হয়েছে। মজুদযোগ্য পোনা মাছের যোগানের পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে ব্যয় কিছুটা কমানো সম্ভব।

কোলে মাছ চাষে সুবিধা
(Advantage of Fish Culture in River Kole)

নদীর কোলে মাছচাষের ফলে পার্শ্ববর্তী স্থানীয় জেলে, বেকার যুবকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের মৌসুমি জলাশয়ে মাছ উৎপাদন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কোলে মাছ চাষের সময় কোলটি পরিত্যক্ত থাকে না বরং সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় কোলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়। অপেক্ষাকৃত কম গভীর ও সমতল তলদেশ সম্পন্ন উপযুক্ত কোল পোনা উৎপাদনে নার্সারি হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। কমপ্রকৃতিতে নার্সারিতে পোনা লালন-পালনের জন্য বড় মাছ চাষযোগ্য পুকুরের ওপর চাপ কমাবে এবং সময়মত স্থানীয়ভাবে পোনা উৎপাদন ও সরবরাহের সুযোগ বাড়বে।

কোলে মাছ চাষে অসুবিধা
(Disadvantage of Fish Culture in River Kole)

নদীর বুকে কোনো কোনো কোলের অবস্থান নদীর মূল তীর হতে ৫/৬ কিমি দূরে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় উপকরণ ও পোনা পরিবহন, পাহারাসহ অন্যান্য কাজে বিঘ্ন ঘটে। হঠাৎ বৃষ্টিপাত বা ঝড়-বৃষ্টি হলে কোল প্লাবিত হয়ে মাছ বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। রাতে নদীর চরে অনেক সময় শিয়াল দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় বিধায় মাছের নিরাপত্তার জন্য একাধিক পাহারাদারের প্রয়োজন হয়। এরূপ পাহারাদারের মজুরি সাধারণ শ্রমিকদের চেয়ে ২/৩ গুণ বেশি হয়। অনেক সময় কোলের তলদেশ অসমতল হয় এবং তলদেশে ডুবন্ত জলজ আগাছা থাকে যা দূর করা কষ্টসাধ্য। দরিদ্র সুফলভোগীদের দ্বারা নদীর কোলে মাছ চাষের সময় স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব খাটানোর সম্ভাবনা থাকে। কোনো অভিলোভী সুফলভোগী দল কর্তৃক কোলের সমুদয় মাছ আহরণের অভিপ্রায়ে অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

সুপারিশ (Recommendations)

ক. স্থানীয় পর্যায়ে (At local level): নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণের প্রতিশ্রুতিসহ স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রশাসনের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে স্থানীয়ভাবে মৎস্যজীবী ও বেকার যুবক-যুব মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত সুফলভোগীদের দ্বারা নদীর কোলে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সুযোগ দেয়া যেতে পারে:

- নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ/নাব্যতা ব্যাহত হয় বা পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না;
- মাছ চাষে কোল প্রস্তুতিতে বা মাছ আহরণের সময় কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না;
- কোলে বিদেশি প্রজাতি যথাসম্ভব পরিহার করে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে;
- কোলের সকল মাছ আহরণ করতে কোনো প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না;
- নদীর কোল খনন বা পুনঃখনন বা বাঁধ তৈরি ইত্যাদি কোনোরূপ উন্নয়ন কাজ করা যাবে না; এবং
- সুফলভোগী দল গঠনের সময় স্থানীয় দরিদ্র মৎস্যজীবীদেরকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. জাতীয় পর্যায়ে (At national level): নদীর কোলে মাছ চাষ উৎসাহিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে:

- স্থানীয় মৎস্য অফিস কর্তৃক প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে সুফলভোগী দল গঠনে সহায়তা প্রদান;
- দরিদ্র সুফলভোগীদের আংশিক পোনা ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান; এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর হতে বা স্থানীয় উপজেলা পরিষদের এডিপি তহবিল হতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;
- কোলে মাছচাষ ব্যবস্থাপনার ওপর সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সফল মাছ চাষ অভিজ্ঞতা অর্জনে বা ফলাফল প্রদর্শনী বা মাঠ পরিদর্শনকালীন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এবং
- সমাজভিত্তিক দল কর্তৃক কোলে মাছ চাষের সময় মনিটরিং জোরদার রাখা।

উপসংহার (Conclusion)

নদীর কোলে মৌসুমি জলাশয়ে মাছ চাষের ধারণাটি সাম্প্রতিক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত জলাশয় আমাদের প্রয়োজনেই উপযুক্ততার বিচারে মৎস্যচাষে বা মৎস্য সংরক্ষণে ব্যবহার করতে হবে। আশা করা যায় বিদ্যমান প্রযুক্তিগত ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে কোলে মাছ চাষ অধিকতর জনপ্রিয় ও লাভজনক হবে এবং দেশের পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখবে।

পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্লাবনভূমিতে স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা

Sustainable Fish Culture Management in Flood Plain

ড. বিনয় কুমার বর্মন[১], বিপ্লব ভূষণ মজুমদার[২] ও এম আই গোলদার[৩]

Abstract

Flood plain fisheries have great potential for increasing fish production, maintaining biodiversity and supporting poor peoples' family nutrition. In recent past development efforts facilitated fish culture in flood plain through Community Based Organization (CBO) that helped increasing fish production in the country. A research work on six flood plains under fish culture conducted by the WorldFish Bangladesh in collaboration with Department of Fisheries (DoF) has revealed some observations and made some suggestions for the sustainable flood plain fish culture management. The observations were, the existing fish culture practice in flood plain reduced biodiversity, raised dyke for making ponds in flood plain obstructed fish breeding and migration, lack of technical knowledge of beneficiaries etc. The stocking of small fish mola (*Amblypharyngodon mola*) in ditches during the dry season showed rapid increase in production of both mola as well as other small fish production from the flood plain. The catch assessment results showed increase in overall fish production and income. The suggestions are to use of ditch in flood plain for stocking mola brood and also for early rearing of fingerlings for stocking in dry season. Smooth running of CBO management through holding regular meeting, maintaining proper income and expenditure for transparency, informing all the activities to the general members at least by half-yearly or yearly will be helpful for sustainable management.

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন খাদ্যের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান জলজসম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে দেশের মোট উৎপাদিত মাছের শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগই (মুক্ত ২৮.১৯ ও বদ্ধ ৫৪.৫৪) আসে। বিগত কয়েক দশকের মৎস্য উৎপাদন চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের (১৮%) মাছের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেলেও মুক্ত জলাশয় (৮৪%) থেকে মাছের উৎপাদন তেমন একটি বৃদ্ধি পায়নি (ডিওএফ, ২০১২-১৩)। মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে বিল-প্লাবনভূমি এবং বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে আধা-বদ্ধ প্লাবনভূমি জলজসম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে বিরাজমান। এ বিশাল জলাভূমি নানা প্রজাতির মাছের চারণভূমি ও প্রজননক্ষেত্র হিসেবে জলজ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। এদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ২৬০ প্রজাতির মধ্যে ১৫০ প্রজাতিই ছোট প্রজাতির মাছ। অধিকাংশ দেশীয় প্রজাতির মাছ প্লাবনভূমিতে পাওয়া যেত। মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে এসকল প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ হারিয়ে যেতে বসেছে। এ অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমের ফলে কতিপয় নির্বাচিত প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের কারণে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের বিস্তার ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয়েছে। প্লাবনভূমির সুফলভোগীদের আয়-রোজগারও বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণা পর্যবেক্ষণে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের বেশ কিছু সমস্যার কথাও উঠে এসেছে যা নিম্নরূপ:

- প্লাবনভূমিতে অপরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেশীয় প্রজাতির মাছ, অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।
- সাধারণত প্লাবনভূমির মাছ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ আহরণের ওপর জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল এমন পরিব জনগোষ্ঠীর অনেকেই জলাশয়ে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- বদ্ধ পুকুর তৈরি করে মাছ চাষের ফলে প্লাবনভূমি তার মুক্ত জলাশয়ের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির মাছের জীবন চক্রও ব্যাহত হচ্ছে।
- ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র দল কর্তৃক একচ্ছত্রভাবে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সময় প্রাতিষ্ঠানিক/সামাজিক সমস্যার কারণে জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় যা অনেক ক্ষেত্রে সংঘাতে রূপ নেয়।
- প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সঠিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা প্রযুক্তি ব্যবহার না করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ও আয় অর্জন সম্ভব হয় না।

প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত নির্বাচিত বিল প্লাবনভূমিতে ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছর যাবত অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিচালিত এ সকল গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে প্লাবনভূমিতে স্থায়িত্বশীল মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক নিম্নের কতিপয় বিষয় অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. সমাজভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার
(Use of Community Based Approach)

সরকারি-বেসরকারি অথবা উভয় মালিকানাধীন প্লাবনভূমিতে স্থায়িত্বশীল মাছচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধানত শক্তিশালী সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) প্রতিষ্ঠা করা দরকার যা

ইতোমধ্যে অনেক বেশি কার্যকর ও উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গ্রুপের চেয়ে সিবিও'র ব্যবস্থাপনায় অধিক সংখ্যক প্লাবনভূমি মাছচাষের আওতায় আনয়ন করা সম্ভব এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে ও সঠিক প্রযুক্তি অনুসরণ করে অধিক ফলাফল অর্জন সম্ভব। তবে সিবিও'র ব্যবস্থাপনায় কার্যকরভাবে প্লাবনভূমিতে মাছচাষের জন্য যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হলো:

সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা (Establishment of CBO):

প্লাবনভূমির জমির মালিক, লীজ গ্রহণকারী, স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং দরিদ্র ভূমিহীন সকলকে সম্পৃক্ত করে সংগঠন তৈরি করা। সংগঠন তৈরির প্রাক্কালে এলাকায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, উদ্যোগী, জনহিতৈষী, সার্বিক উন্নয়নে আগ্রহী এমন ব্যক্তিকে সিবিও'র নেতা যেমন সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা। বাস্তবে দেখা যায় এধরনের ব্যক্তিত্ব এলাকার স্বার্থ বিবেচনা করে সকল শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেন, এরূপ সামাজিক সংগঠন তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেন এবং একে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাগমারা উপজেলার দোলা বিল প্লাবনভূমির সমাজভিত্তিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহার আলী মাস্টার এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ফুলবাড়ীয়া উপজেলার কালমিনা প্লাবনভূমির সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম এর নাম উল্লেখ করা যায়।

সমাজভিত্তিক সংগঠন শক্তিশালীকরণ (Strengthening of CBOs):

সমাজভিত্তিক সংগঠনকে শক্তিশালী করতে যা করা দরকার তা হলো:

- **নেতৃত্বের উন্নয়ন (Leadership Development):** শক্তিশালী নেতৃত্বদানের গুণাবলীসম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে আগ্রহী এবং সকলকে নিয়ে মিলেমিশে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ সম্পাদনে পারদর্শী এমন ব্যক্তিত্বকে নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করা।

- **সংগঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ (Stakeholders' Participation):** দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও মহিলাগণ যাতে সংগঠনের সদস্য হওয়ার সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিত করা। একটি ভাল সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি করতে প্লাবনভূমির জমির মালিক ও লীজগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গসহ প্লাবনভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি, ভূমিহীন দিন মজুর ও মৎস্যজীবীগণকে সুযোগ দেয়া যাতে তাঁরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ডফিশ পরিচালিত গবেষণাভুক্ত ছয়টি প্লাবনভূমির সিবিওতে সর্বমোট ৭৪৫ জন (জমির মালিক ৫৩৮ জন, ভূমিহীন ৯৭ জন, এবং মৎস্যজীবী জেলে ১০৯ জন)। সদস্যের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানকারী ৬ টি কার্যকরি কমিটির মোট ১০৭ জন সদস্যের কথা উল্লেখ করা যায়।

- **স্বচ্ছতা বজায় রাখা (Maintenance of Transparency):** ভাল সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হলো সকল কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা বজায় রেখে কার্যকরি কমিটির সদস্যবৃন্দের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকা। এজন্য যৌথ ব্যাংক হিসাব ব্যবহার, আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিকাশ রাখা ও নথি সংরক্ষণ করা দরকার। মাসিক সভায় নিয়মিত এ সকল হিসাব নিকাশ উপস্থাপন ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা এবং কমপক্ষে ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সভা আয়োজন করে সাধারণ সদস্যদেরকে তা অবহিত রাখা।

- **কার্যকরি কমিটির সভা আয়োজন (Holding Regular Meeting):** প্লাবনভূমিতে স্থায়িত্বশীল মাছচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য সংগঠনের কার্যকরি কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন করা এবং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও এর ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা। গবেষণার আওতাধীন সিবিও'র এ ধরণের সভার আয়োজন ও আলোচনা কার্যকরি কমিটির জবাবদিহি ও সিবিও দক্ষভাবে পরিচালনা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

- **সমাজভিত্তিক সংগঠন নিবন্ধন (Registration of CBOs):** সমাজভিত্তিক সংগঠন আরও বেশি শক্তিশালী হয় যখন তা নির্ধারিত সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত ও স্বীকৃত হয়। নিবন্ধনকৃত সিবিও'র পক্ষে সরকারি জলাভূমির লীজ গ্রহণ সহজ ও সহায়ক হয় এবং কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতাও অনেকখানি বৃদ্ধি পায়।

- **পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি (Mutual Cooperation):** সিবিও'র মাধ্যমে সকল শ্রেণির সদস্যদের সংগঠিত করে একত্রে কাজ করার ও মেলা মেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সমস্যা সমাধান সহজ হয়। যেমন- প্লাবনভূমিতে অবস্থিত নিচু জমি বা কুয়ার মালিকগণ এ ধরণের সংগঠনকে নিয়মিত বার্ষিক অর্থের বিনিময়ে লীজ প্রদান করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এমনকি এসকল কুয়া পুনঃখনন করে পানি ধরে রাখার মাধ্যমে স্থায়ী জলজ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

- **যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ (Participation of Youths):** সংগঠনে যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ মাছ চাষ কার্যক্রমকে স্থায়িত্বশীল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও বয়স্ক সদস্যগণ সকল কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন না। উদাহরণ হিসেবে কালমিনা বিল প্লাবনভূমির কথা বলা যায় যেখানে যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে সিবিও কার্যকর হয়েছে।

২. প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল (Fish Production Strategies)

- **প্লাবনভূমির গর্ত বা কুয়া সংস্কার ও সংরক্ষণ (Restoration or Conservation of Ditches):** প্লাবনভূমিতে মজুদকৃত ও অ-মজুদকৃত মাছের উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল হিসেবে শুকনো মৌসুমে নিচু জমি/কুয়া

সংস্কার ও সংরক্ষণ করে সারা বছরে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। ফলে শুকনো মৌসুমে দেশীয় মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে এ সকল কুয়া ব্যবহৃত হতে পারে বা দেশীয় প্রজাতির মাছের ব্রুড সংরক্ষণ বা মজুদের কাজেও ব্যবহার করা যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে দেশীয় মাছের বংশবিস্তারে সহায়ক হয়। আবার প্লাবনভূমিতে মাছচাষের জন্য আগাম মজুদযোগ্য পোনা প্রতিপালনেও কতিপয় কুয়া বা জলাশয় ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সকল উদ্যোগ প্লাবনভূমির সার্বিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে যা গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছবি: প্লাবনভূমি হতে আহরিত মলা

- **প্লাবনভূমিতে দেশীয় ছোট মাছ মজুদ (SIS Stocking in Flood Plain):** প্লাবনভূমিতে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ মলা, দারকিনা প্রভৃতি ছোট মাছের ব্রুড মজুদ বা সংরক্ষণ করে দেশীয় মাছের অধিক উৎপাদন আয় ও পারিবারিক পুষ্টিপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। অতীতে প্লাবনভূমিসহ সকল মুক্ত জলাশয় বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছে সমৃদ্ধ ছিল। অতি আহরণ, ক্ষতিকর আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার, বিষপ্রয়োগ বা মাছের আবাসস্থল ধ্বংস করে মাছ আহরণ ইত্যাদি কারণে এ ধরণের মাছের প্রাচুর্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ ছোট প্রজাতির মাছ মলা, দারকিনা ইত্যাদির ব্রুড শুকনো মৌসুমে প্লাবনভূমির কুয়ায়/গর্তে মজুদ ও সংরক্ষণ করা হলে এ সকল মাছের উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে

ছবি: বাগমারা উপজেলার কোলাবিল পরিদর্শন

কোকড়াডোবা বিল প্লাবনভূমিতে ২০১২ সালে দেশীয় মাছের উৎপাদন ছিল ২,৯৮৪ কেজি এবং ২০১৩ সালে ১১১.৫ কেজি মলা মাছের ব্রুড মজুদ করার ফলে ২০১৩ সালে দেশীয় ছোট মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৮,০৪১ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। মজুদকৃত মলার পাশাপাশি অন্যান্য সকল প্রকার দেশীয় মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র)। কোকড়াডোবার প্লাবনভূমির ন্যায় কালমিনা, গোসাল ও কোলাবিল জলমহলের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল দেখা গেছে। দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নিয়মিত মাছ আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানীয়ভাবে মাছের প্রাপ্যতা ও মাছ খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বাজারে নিয়মিত মাছ বিপণনের ফলে বাড়তি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অতি কম খরচে প্লাবনভূমিতে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে, মাছের জীববৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক প্রজাতির মাছ যা হ্রাস পেয়েছিল তা আবার প্লাবনভূমিতে এখন ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোকড়াডোবা বিলে ২০১২ সালে যেখানে ২৮ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত ২০১৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ টি প্রজাতিতে উন্নীত হয়েছে। বিশেষত: পরিবারের মহিলা ও শিশু অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ নিয়মিতভাবে এ সকল দেশীয় ছোট মাছ যেমন: মলা, দারকিনা ইত্যাদি খেয়ে তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

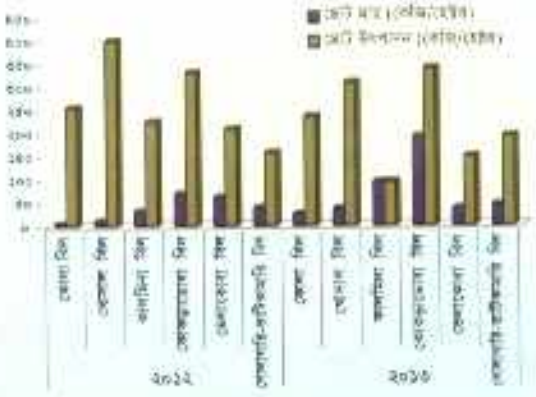

চিত্র: প্লাবনভূমিতে মাছ উৎপাদন

উপসংহার (Conclusion)

দেশের প্লাবনভূমিতে শুকনো মৌসুমে কুয়া বা গর্তে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশীয় ছোট মাছ যেমন মলা-দারকিনা ইত্যাদির ব্রুড মজুদ করা হলে এবং কুয়া আগাম পোনা উৎপাদনে ব্যবহার করে মাছ চাষ করা হলে প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক হবে। ফলে সম্ভাবনাময় এ প্লাবনভূমি ভবিষ্যত মাছের চাহিদা পূরণে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে এবং পারিবারিক পুষ্টি প্রাপ্যতায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমন প্রত্যাশা করা যায়।

জলাভূমি অভয়াশ্রম ঃ অনন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদন কৌশল

Wetland Sanctuary : An Excellent Tool for Coservation of Biodiversity and Fish Production

মোঃ আবুল হাশেম সুমন[১], ড. সৈয়দ আলী আজহার[২] ও তারিক হাসান[৩]

Abstract

'Wetland Sanctuary' the most effective intervention to restore habitat and regenerate aquatic flora and fauna specifically for fish. Sanctuary is like 'Temple' for fish which is a very effective tool for conservation and production of open water fish and non-piscine species. Although around 33% of total area of Bangladesh is wetland or open water which comprises rivers, beels, floodplains etc. with high potentials of aquatic resources; but during 2011-12 only 9,57,095 MT (29.34%) fish production was contributed by 3.925 mill. ha inland open water fisheries against which 7.741 mil. ha inland culture fisheries contributed about 17.361 MT (52.92%) fish of total fish catch. Therefore, this is clear that production trend of wetland is decreasing because of different natural factors and human interventions. On the other hand, required management and conservation tools are not applying in wetland management except in some development projects although for the project period only. But there are some excellent management and conservation tools by applying those fish production and biodiversity in open water can be increased significantly. Out of these tools, establishment of wetland sanctuary is one of the most important and effective tool to increase biodiversity and fish production through having remarkable amount of fish catch throughout the world. Another issue which is traceability problem in cultured fishes due to the presence of different chemicals and antibiotics including harmful microorganisms in prawns and fishes. But in natural or open water environment this risk of traceability is less than the closed water ecosystem. Therefore, we should increase open water fish production by adopting different effective tools and priority should to be given to establish fish sanctuary in rivers, beel and flood plains. In open water environment, sanctuaries increase species diversity, improve habitat, improve attitude, develop group activities and uplift household income (Ahmed and Ahmed, 2002). Therefore, sanctuary or protected area provides more fish through protecting parent fishes to breed in open water and increase yield through recruitment year after year.

দিন দিন বাড়ছে মানুষ- বাড়ছে মুখ, বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা- হচ্ছে দখল জলাভূমি, গড়ছে দালান কমছে ভূমি ফসলী জমি, উজাড় হচ্ছে জলাভূমি। কিন্তু মানুষতো আর না খেয়ে বাঁচতে পারে না তাই বাঁচার জন্য চাই খাদ্য এবং সুষম খাদ্য। আর সুষম খাদ্য যোগানে প্রাণিজ আমিষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এদেশের মানুষ এখনও প্রতি বছর গড়ে ১৮.৯৪ কেজি (ডিওএফ, ২০১২) মাছ গ্রহণ করে থাকে। আমরা এখনও প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ (ডিওএফ, ২০১২) মাছ থেকে পাই। দেশের জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০-২১ সাল নাগাদ দেশে মোট মৎস্য চাহিদার প্রক্ষেপণ ধরা হয়েছে ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন। ২০১১-১২ সালে মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন (ডিওএফ, ২০১২) অর্থাৎ মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে আরও অতিরিক্ত ১২.৮০ লক্ষ মে.টন। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? সম্ভব কেবল উন্নত চাষ প্রযুক্তির প্রসার এবং মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অধিক পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় ৮৪% জলাশয়ই মুক্ত জলাশয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নদী, হ্রদ, সুন্দরবনের জলাভূমি, বিল, কাপ্তাই লেক এবং প্লাবনভূমি (ডিওএফ, ২০১২)। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয় মাত্র প্রায় ১৬%, যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, ডোবা, বাঁওড় এবং চিংড়ি ঘের। মুক্ত জলাশয়ে বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় হয়তো মাছ চাষ করা যাবে না কিন্তু দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো গেলে দেশে মাছের অভাব থাকাতো দূরের কথা বরং রপ্তানি আয়ের তালিকায় মৎস্যখাত

চিত্র: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ (হে:)

গার্মেন্টসকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে এতটুকু বুঝা গেছে যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সবচেয়ে কার্যকর যে সকল টুলস রয়েছে তার মধ্যে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' বা 'জলাভূমি অভয়াশ্রম' স্থাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর টুল বা প্রযুক্তি।

জলাভূমি অভয়াশ্রম
(Wetland Sanctuary)

অভয়াশ্রম (Sanctuary) শব্দটি মূলত মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যা মৎস্য অভয়াশ্রম বা Fish Sanctuary নামে পরিচিত। Fish Sanctuary শব্দটি Bird Sanctuary বা Wildlife Sanctuary শব্দদ্বয়ের সাযুজ্যপূর্ণ। সাধারণ অর্থে অভয়াশ্রম বলতে নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে বুঝায়। Jhingran (১৯৮৪) এর মতে মৎস্য অভয়াশ্রম হলো 'When certain section of rivers, beels or any reservoir is closed for fishing for a certain period or all the year round where fish congregate for breeding or fry or fingerling are found in large number' Mazid (২০০২) মনে করেন 'It is a particular area in the water body which is established to maintain as a permanent shelter for protection of fish for natural propagation' বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই মতো নদী, খাল, বিল এবং প্লাবনভূমি তথা প্রজাতিভেদে মাছের বিচরণ, প্রজনন, আবাসস্থল ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক, পরিবেশ এবং অবস্থলে বিভিন্ন প্রকার অভয়াশ্রম সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে অভয়াশ্রমসমূহ তৈরি করা হয়েছে যার ফলে এখনই এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যেমন- বাইজা বিল, কুলিয়া বিল, হালতি বিল ইত্যাদি বিলও হতে পারে ব্যতিক্রমধর্মী অভয়াশ্রম যার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ এখন থেকেই নেয়া প্রয়োজন।

জলাভূমি অভয়াশ্রমের প্রকারভেদ
(Types of Wetland Sanctuary)

স্থান, কাল ও প্রজাতিভেদে অভয়াশ্রমের প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন: নদী নিবাসী মাছের জন্য নদীতে, বিল নিবাসী মাছের জন্য বিলে, প্লাবনভূমির মাছের জন্য প্লাবনভূমির উপযুক্ত স্থানে অভয়াশ্রম। অভয়াশ্রম স্থায়ী বা মৌসুমি দু'ধরনের হতে পারে। মাছের প্রজাতিভেদে অভয়াশ্রমের স্থান, গভীরতা, মৌসুম ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছের অভয়াশ্রম প্লাবনভূমি বা বিলে, নদীতে নয়। আবার আঁইড়, বেয়াল, চিতল ইত্যাদি মাছের অভয়াশ্রম নদীতে হতে হবে। যা হোক সার্বিকভাবে এগুলো বিবেচনায় রেখে অভয়াশ্রমকে ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. মৌসুমি অভয়াশ্রম (Seasonal Sanctuary)

এ ধরনের অভয়াশ্রম প্রধানত বিল প্লাবনভূমি ইত্যাদি স্থানে স্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ আহরণ বা শিকার বন্ধ থাকে। আবার গাছের ডালপালা, বাঁশ ও অন্যান্য অভয়াশ্রম সামগ্রী বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেও এ ধরনের অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। মাছ ও অন্যান্য প্রাণীদের জীবনচক্রের সঙ্কটকালীন সময়ে যে সকল স্থানে এরা আশ্রয় নেয় ঐ স্থানটিকে সংরক্ষণের মাধ্যমেও মৌসুমি অভয়াশ্রমে পরিণত করা যায়, যেমন- খরার সময় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আশ্রিত মাছকে সংরক্ষণ করা। কৈ, শিং, মাগুর, শোল, টাকি, গজার ইত্যাদি মাছ যে সকল স্থানে ডিম ছেড়ে বাচ্চা নেয় ঐ সকল স্থানে অস্থায়ী বা মৌসুমি অভয়াশ্রমের মাধ্যমে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মৌসুমি অভয়াশ্রম স্থাপন করা যায়।

২. সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম (Yearly Sanctuary)

সাধারণত নদীতে এ ধরনের অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। তাছাড়া কোনো বিশেষায়িত জলাশয়েও এ ধরনের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ধরনের অভয়াশ্রম জলাশয়ের যে অংশে মাছ তার জীবনচক্রের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে এমন সব জায়গায় হওয়া উচিত। কোনো জলাশয়ের কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সারা বছরের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলেও তাকে সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলা হয়। বৃহদাকার সিলেটের অনেক হাওরের বিলে ২-৩ বছর পর পর মাছ আহরণ করা হয়। এগুলোকে পাইল ফিসারি বলা হয়। তা ছাড়া বিল বা নদীর অনেক স্থান থেকেও ২-৩ বছর পর পর মাছ আহরণ হয়। এ সকল পাইল ফিসারিগুলোকেও আমরা এক প্রকার সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলতে পারি

৩. স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি অভয়াশ্রম (Perennial Sanctuary)

যখন কোনো জলাশয় বা নদী বা বিলের সম্পূর্ণ অংশে বা কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকে তখন তাকে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি অভয়াশ্রম বলে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প, চলনবিল প্রকল্প, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ প্রকল্প, ভিজিডিআরপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাচ (MACH) প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪৭০টি স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক টাঙ্গুয়ার হাওরের কিছু বিলে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডির সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (SCBRMP) এর মাধ্যমে ৫০টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ও নিজস্ব উদ্যোগে বেশ কিছু বিলকে প্রাণভূমি ও বিল নিবাসী মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় অনেক অভয়াশ্রম হয়ত বর্তমানে নেই কিন্তু প্রতিটি জলমহালের জন্য গঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রম চলমান রাখাসহ সংশ্লিষ্ট জলমহাল এবং অভয়াশ্রমসমূহকে স্থায়ী ব্যবস্থাপনার রূপ দিতে হলে সংগঠনসমূহের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে যা এখনও সম্ভব হয়নি। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ব্যতিক্রমধর্মী বাইক্কা বিলটি স্থায়ী ইজারা প্রাপ্তির ফলে রূপ নিয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এক বিরল মিলন মেলার অভয়াশ্রমে।

জলাভূমি অভয়াশ্রমের প্রভাব (Impacts of Wetland Sanctuary)

জলাভূমি অভয়াশ্রমের জীববৈচিত্র্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে (Islam et al., ১৯৯৯)। বিবিএফএম প্রকল্পের জলমহালসমূহে অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে দেখা গেছে যে, নদী নিবাসী ছোট মাছের প্রজাতি ও পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে এবং জীববৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে (Thompson, ২০০৩)

দামপাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে (Ahmed and Ahmed, ২০০২)। CBFM-1 প্রকল্পের ১০টি জলাশয়ে ১৯৯৭ সালের বেইজলাইন (৪১টি) এর চেয়ে ২০০৪ সালে মাছের প্রজাতি বেড়েছে ২৮.৩১% (৫০টি) যা অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে সম্ভব হয়েছে (WorldFish Center, ২০০৫)। ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের জলাশয়সমূহে অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫-২০০% পর্যন্ত এবং বিপন্নপ্রায় মাছসহ ২৫টি মাছের প্রজাতি এবং কয়েকটি চিংড়ি প্রজাতি বেড়েছে (FFP, ২০০৫)। অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে এলজিইডির সুনামগঞ্জ সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বিভিন্ন জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে (SCBRMP, ২০১৪)।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, কন্ট্রোল বিল এবং নদীর চেয়ে অভয়াশ্রম স্থাপিত বিল ও নদীর মৎস্য আহরণ বেড়েছে কয়েকগুণ এবং বিলে নদীর চেয়ে অনেক বেশি আহরণ বেড়েছে। তাছাড়া বেনথোসের পরিমাণ ও প্রজাতির সংখ্যাও বেড়েছে অভয়াশ্রমযুক্ত জলাশয়ে। অন্যদিকে তলদেশী মাছের প্রাচুর্যের সাথে বেনথোসের প্রাচুর্যের সম্পর্ক একে অপরের বিপরীতমুখী (Azher, ২০০৯)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জলাভূমি অভয়াশ্রমের ভূমিকা (Role of Wetland Sanctuary on Biodiversity Conservation)

বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অতি সোচ্চারভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পাখিদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পাখির অভয়ারণ্য, বন্য প্রাণীদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন্য প্রাণীদের অভয়ারণ্য, মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম, বন সংরক্ষণে সংরক্ষিত বন এলাকা, অন্যান্য উদ্ভিদ সংরক্ষণে বোটানিকাল গার্ডেন ইত্যাদি নামে জীবের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রায় প্রতিটি দেশেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জলাভূমি অভয়াশ্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সকল ভূমিকা পালন করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো:

১. পরিবেশবান্ধব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম
(Eco-friendly Biodiversity Conservation)

অভয়াশ্রমে কোন প্রকার কৃত্রিম সামগ্রী বা বস্তু ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত। এ ধরনের অভয়াশ্রম জলজ দূষণসহ পরিবেশের কোনো প্রকার ক্ষতি করে না বিধায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম পরিবেশবান্ধব ভূমিকা রাখে। অনেকের ধারণা অভয়াশ্রম পলি থিতিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, তবে এর জন্য শুধু অভয়াশ্রম দায়ী নয়, পানির স্রোতে যে কোনো প্রকার বাধাই ঐ স্থানে পলি থিতিয়ে পড়াকে ত্বরান্বিত করে। তারপরও অবক্ষয়িত উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে এবং অভয়াশ্রমের মত নিরাপদ স্থানেই তারা আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে।

২. মাছের বংশ বৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধিকরণ
(Enhancement of Spawning and Stock)

প্রজননক্ষম মাছ অভয়াশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রজননের সময় তারা প্রজাতিভেদে বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে এসে প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। এ সময় অধিকাংশ প্রজাতির মাছ উন্মুক্ত স্থানে এসে ডিম ছাড়ে। এর মাধ্যমে মাছের বংশ বৃদ্ধি পায় এবং সার্বিকভাবে মাছের মজুদ বৃদ্ধি লাভ করে। কোনো কোনো মাছ যেমন- আঁইড়, রিটা, চিতল, ফলি ইত্যাদি মাছ অভয়াশ্রমের মাঝেই ডিম ছাড়ে এবং পোনা উৎপাদিত হয়।

৩. সঙ্কটময় সময়ে মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে ভূমিকা
(As Shelter During Critical Period)

খরা, শত্রুর আক্রমণ এবং অন্যান্য প্রতিকূল পরিবেশে মাছ অভয়াশ্রমে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করে। নদী, বিল, প্লাবনভূমিতে যখন অনবরত বিভিন্ন প্রকার জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করা হয় তখন অভয়াশ্রমই একমাত্র স্থান যেখানে মাছ নিরাপদে আশ্রয় নেয়। কম পানিতে প্রচণ্ড খরার মধ্যে মাছ ও অন্যান্য জীব আশ্রয়স্থল হিসেবে অভয়াশ্রমকে বেছে নেয়।

৪. বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণ
(Conservation of Threatened Species)

দেশের ৫৪টি মাছের প্রজাতি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় (IUCN, ২০০০)। এছাড়াও এলাকা বা অঞ্চলভেদে কোনো কোনো প্রজাতি হুমকির মধ্যে রয়েছে। একমাত্র অভয়াশ্রমের মাধ্যমেই তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। নদীতে বসবাসকারী ডলফিন বর্তমানে হুমকির মধ্যে রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে যে, নদীতে বসবাসকারী ডলফিন/শুশুক/শিশুর (*Platanista gangetica* Roxburgh, ১৮০১) উপস্থিতি পদ্মা নদীর উজানে ০.০৫ এবং ০.০২ টি/কিমি স্থানে। কিন্তু যমুনা নদীতে পাওয়া গেছে ০.১২ এবং ০.০৫ টি/কিমি (FHRC, ২০১৩) যে স্থানটি বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।

৫. খাদ্যশিকল সচল রাখা এবং খাদ্যের উৎস হিসেবে অভয়াশ্রম
(Role on Sustainable Food Chain and as a Source of Food)

গবেষণায় দেখা গেছে যে, অভয়াশ্রমের মধ্যে স্থাপিত অভয়াশ্রম সামগ্রী যেমন- ডালপালা, পাতা, বাঁশ ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পেরিফাইটন জন্ম নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বেনথোস যেমন- শামুক, ঝিনুক, বিভিন্ন প্রকার অ্যানিলিড, আর্থ্রোপোডের লার্ভা যেমন- ড্রাগন ফ্লাই লার্ভি, ডেমসেল ফ্লাই লার্ভি ইত্যাদি এছাড়াও জলজ উদ্ভিদযুক্ত অভয়াশ্রমে লতানো ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ জন্ম নিলে এগুলো মাছের খাবার উৎপাদন ও প্রজননে সহায়তা করে।

অভয়াশ্রমে চিংড়ি এবং ছোট মাছের প্রাচুর্য কম-বেশি হলে বিভিন্ন প্রজাতির রাক্ষুসে মাছের প্রাচুর্যও কম-বেশি হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে ছোট ছোট মাছগুলো প্রাণীকণা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। অনেক মাছ, প্রাণী ও উদ্ভিদ অভয়াশ্রমে মারা যায় এবং তাদের শরীর পচে গিয়ে অভয়াশ্রমের মাটিতে মিশে যায়। যার ফলে অভয়াশ্রমের মাটিতে পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে যেগুলো প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে কাজে লাগে। এভাবে অভয়াশ্রম খাদ্যশিকল সচল রাখে এবং খাদ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে।

৬. জলাশয়সমূহে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
(Conservation of Biodiversity)

শুধু মাছ নয়, মাছ ছাড়াও বেনথোস, পেরিফাইটন, ফাইটোপ্লাঙ্কটন, কেঁচো জাতীয় প্রাণী, কাঁকড়া, বিভিন্ন প্রকার জলজ কীটপতঙ্গ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি জীবের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ফড়িং জাতীয় কিছু আর্থ্রোপোড যেমন- ড্রাগনফ্লাই, ডেমসেল ফ্লাই, ক্যাডিস ফ্লাই ইত্যাদি অভয়াশ্রম বা এধরনের স্থানে প্রথমে তারা ডিম ছাড়ে এবং তাদের বংশধরদের জীবনচক্র শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে তারা পানি থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে উড়ে চলে যায়।

৭. নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় অভয়াশ্রম
(Sanctuary for Food Security and Food Safety)

অভয়াশ্রমে আশ্রিত মাছ প্রজনন মৌসুমে অভয়াশ্রমের ভেতরে, পার্শ্ববর্তী স্থানে ও প্লাবনভূমিতে প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদিত হয় এবং এগুলো বড় হয়ে এক বিরাট সম্পদে পরিণত হয়। এতে মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বাড়ে, যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে সহায়তা করে। যেহেতু মুক্ত জলাশয়ের মাছকে সরাসরি কোনো প্রকার খাবার প্রদান করা হয় না, তাই এসব মাছে দূষণের সম্ভাবনা বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা
(Sanctuary Management)

কোনো জলাশয়কে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা বা জলাশয়ের কোনো অংশে অভয়াশ্রম স্থাপন করা যত সহজ তার চেয়েও বেশি কঠিন হলো এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা। কিন্তু অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করতে হলে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। এ লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিম্নলিখিতভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে। যথা:

১. ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন
(Formation of Management Committee)

জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথমেই যে কাজটি করতে হয় তা হল সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা। এজন্য প্রথমে কমিটি গঠন করতে হয়। জলমহালের আয়তন ও সদস্য সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে কমিটির পরিধি ছোট বড় হতে পারে। যেমন: সিবিএফএম প্রকল্পে নদী ব্যবস্থাপনা কমিটি (আরএমসি), বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি), ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পে মৎস্য

ব্যবস্থাপনা কমিটি (এফএমসি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের এসসিবিআরএমপি প্রকল্পে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (আরএমসি), ডব্লিউবিআরপি-এর জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সংগঠন ইত্যাদি নামে সংগঠন ও কমিটি গঠন করা হয় যারা অভয়াশ্রমসমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন।

২. কাঠা ব্যবস্থাপনা
(Brush Pile Management)

অভয়াশ্রমের মূল একক হলো কাঠ বা গাছের ডাল পালা, বাঁশ এবং অন্যান্য অভয়াশ্রম সামগ্রী। ব্যবস্থাপনা বলতে অভয়াশ্রমে স্থাপিত অভয়াশ্রম সামগ্রীসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনাকেই বুঝায়। অভয়াশ্রমের কাঠা ব্যবস্থাপনায় নিম্নের কাজগুলোকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যথা:

- **কাঠা প্রতিস্থাপন (Brush Pile Replacement)**
  প্রতি বছরই স্রোত বা ঝড় বাদল ও ঢেউ এর কারণে কিছু কাঠ বিনষ্ট হবে বা অন্য স্থানে সরে যেতে পারে। পলি জমার কারণেও অনেক কাঠা মাটি চাপা পড়ে যেতে পারে। তাই কাঠার ক্ষতিগ্রস্ততার ওপর নির্ভর করে বিল বা নদীর অভয়াশ্রমে স্থাপিত অভয়াশ্রমে নতুনভাবে কিছু ডালপালা ও বাঁশ প্রতিস্থাপন করতে হবে। অনালিকে কিছু অভয়াশ্রম সামগ্রী বা কাঠা নতুনভাবে স্থাপনও করা যেতে পারে।

- **কাঠার পিপিডি ও অন্যান্য সামগ্রীর যত্ন (Take care of PPD and Other Sanctuay Materials)**
  অনেক সময় অভয়াশ্রমের কাঠার মধ্যে টেট্রাপড বা হেক্সাপড স্থাপন করা হয়। এগুলো মাটিচাপা পড়ে গেলে পুনরায় তা উঠিয়ে এনে অভয়াশ্রম এলাকার সমতল স্থানে স্থাপন করতে হবে। এছাড়া পিপিডি (Predator Prevention Devices) হিসেবে বাঁশের চোঙ্গ, আরসিসি পিলার, প্লাস্টিক পাইপের টুকরা, কলসি, বাক্স ইত্যাদিকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এগুলো মাটিচাপা পড়ে গেলে পুনরায় তা উঠিয়ে এনে অভয়াশ্রমে স্থাপন করতে হবে।

- **জলাশয়ে মাছের পোনা মজুদকরণ (Fingerling Stocking in Wetland)**
  অনেক সুফলভোগীদল জলাশয়ে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি মাছের পোনা মজুদকরণের পক্ষপাতি। তবে কোনো অবস্থাতেই যেন বিদেশি মাগুর, পিরানহা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ অভয়াশ্রমযুক্ত জলাশয়ে মজুদ না করা হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিপন্ন প্রজাতির ব্রুড বা বড় পোনা মজুদ করা সমীচীন।

- **পানি দূষণ থেকে অভয়াশ্রমকে রক্ষাকরণ (Protection of Sanctuary from Water Pollution)**
  শিল্পের বর্জ্য বা ধানক্ষেতে ছিটানো কীটনাশক বা পেস্টিসাইড দ্বারা পানি দূষিত হলে সে পানি অভয়াশ্রমের মাছের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। এর ফলে সরাসরি মাছের মড়ক, প্রজাতির বিলোপ, নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছের হ্রাস, খাদ্য শিকল বিনষ্ট হওয়া, মাছের প্রাকৃতিক খাবার বিনষ্ট হওয়া, মাছের ডিম ধ্বংস হওয়া, মাছের প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং মাছের রেণু, ধানী বা জুভেনাইল মারা যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে আগে থেকেই বিশেষ সজাগ থাকতে হবে।

- **অভয়াশ্রম এলাকায় কারেন্ট জাল ও ফিসট্রাপ দিয়ে বেআইনিভাবে মাছ আহরণ (Illegal Fishing by Gill net/Current Jal and Fish Trap)**
  অনেক সময় দিন বা রাতে জোরপূর্বক বা চুরি করে কারেন্ট জাল বা অন্যান্য মাছ ধরার ট্রাপ বা ফাঁদ পানিতে স্থাপন করে বা অভয়াশ্রমকে বাইরে থেকে ঘিরে ফেলে অসাধু ব্যক্তিরা মাছ আহরণ করতে চেষ্টা করে। তাই পাহারার মাধ্যমে এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এগুলো দমন করতে হবে।

- **মাছ বের করার মাধ্যমে আহরণ (Fishing by Agitating)**
  কিছু অসাধু ব্যক্তি অভয়াশ্রমের মধ্যে স্থাপিত অভয়াশ্রম সামগ্রী এবং ডালপালায় বাইরে থেকে আঘাত করে বা ডালপালাকে নাড়াচাড়া করে মাছকে অভয়াশ্রম হতে বের করে আনে। অভয়াশ্রমের বাইরে মাছ চলে আসলে সেখান থেকে জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করতে চেষ্টা করে। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ সজাগ থাকতে হয়।

- **বড়শি দিয়ে মাছ আহরণ (Angling)**
  অনেক অসাধু ব্যক্তি অনেক সময় বড়শি, লাড় বড়শি ও লম্বা সুতা যুক্ত বড়শি দিয়ে বোয়াল, আইড়, বাইম, শোল, গজার, চিতল ইত্যাদিসহ বৃহদাকৃতির মাছ আহরণ করতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে রাতের বেলায় এ ধরনের চুরি বেশি হয়। তাই এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

- **মাছ রোগাক্রান্ত হওয়া (Outbreak of Fish Disease)**
  বিশেষ করে শীতকালে মাছে ক্ষতরোগ দেখা দেয়। তাই আগে থেকেই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

- **জৈবিক সংরক্ষণ (Conservation through Biological Management)**
  কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ যেমন- সিংড়া বা পানিফল ইত্যাদি অভয়াশ্রমে স্থাপন করা হলে এবং কাঁটাযুক্ত ডালপালা যেমন- মান্দার গাছ, খেজুর গাছের পাতা, বরই গাছের ডাল ইত্যাদি কাঠায় আংশিক ব্যবহার করা হলে এমনিতেই চোরের উপদ্রব কিছুটা কম হয়। গভীর পানিতে হিজল ও করচ এবং কম পানিতে নলখাগড়া ও পিতরাজ চারা রোপণ করা হলে মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে। এ গাছগুলোর মূল এবং ডালপালায় অনেক মাছ ডিম দিয়ে থাকে।

উপসংহার (Conclusion)

জলমহাল বা মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আবাসস্থল ও প্রজাতিভেদে মাছের বিচরণ, প্রজনন, আবাসস্থল ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে অভয়াশ্রম স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, অভয়াশ্রম শুধু মাছের জন্য নয় বরং সকল প্রকার জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও শান্তির নীড় হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য অভয়াশ্রম আইন প্রণয়ন বা প্রযোজ্য হলে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিধি প্রণয়নসহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ সংশোধন করা প্রয়োজন। এটি সংশোধন করা সম্ভব হলে আইনগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নতুন নতুন অভয়াশ্রম স্থাপন ত্বরান্বিত হবে এবং পুরাতন অভয়াশ্রমসমূহ স্থায়িত্বশীলভাবে কার্যকর থাকবে। এতে মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। কেননা উন্মুক্ত জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের এ যে এক অনন্য কৌশল।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ জরিপ ঃ অতীত ও বর্তমান
Marine Fisheries Stock Assessment Survey : Past and Present

এবিএম আনোয়ারুল ইসলাম[১], মোঃ শফিকুল ইসলাম[২] ও মোঃ আতিয়ার রহমান[৩]

Abstract

Bangladesh is rich in marine fisheries biodiversity and has increasing demand for the resource for domestic consumption and economic development. Diversified surveys were conducted in the Exclusive Economic Zone of Bangladesh in the Bay of Bengal with technical support from Japan, Russia, Norway, Thailand and FAO of United Nations. Some were exploratory in nature and a few were conducted for stock assessment of fish and shrimps. Four fishing grounds were identified and a checklist of 475 marine fish species was published. Different assessment was made from these surveys. 'Standing stock' was estimated at 60,000-120,000 MT for pelagic fish in 1978-79. 'Standing stock' and 'Maximum sustainable Yield' were estimated at 156,000 MT and 47,500-88,500 MT respectively for demarsal fish and 3,200 MT and 7,000-8,000 MT respectively for shrimp during the latest surveys conducted in 1990s. Global warming has adverse impact on environment and productivity of seas and coastal waters. Increasing trend prevails in exploitation of marine fisheries in Bangladesh. Needs continuous stock assessment survey in coastal and marine waters to prevent over exploitation and also for sustainable marine fisheries management in Bangladesh.

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও আহরণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা সকলের জানা। বিগত শতকের প্রথমার্ধে চ্যালেঞ্জার এক্সপিডিশনের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের প্রাণিজ সম্পদের অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জান অর্জনের সূচনা। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সাল থেকেই নানাবিধ জরিপ কাজ ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সমুদ্র হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণপূর্বক দেশের আমিষ চাহিদা মেটান ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যই এসব কার্যক্রমের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। জাপানসহ অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের 'একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা'য় (EEZ) সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি, পরিমাণ ও আহরণ এলাকা নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তায় বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণের ভিত্তি দাঁড়িয়ে যায়। বঙ্গোপসাগরে বহু প্রজাতির মৎস্যসম্পদের বহুমাত্রিক আহরণ পদ্ধতির কারণে টেকসই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য বিধায় এর মজুদ নিরূপণ অতি জরুরি। সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতিসমূহ জীবনচক্রের শুরুতে উপকূলীয় কম লবণাক্ত পানিতে বৈশের কাটিয়ে যৌবনের প্রারম্ভে গভীর সমুদ্রমুখী হয়। এ পর্যায়ে মৎস্য প্রজাতির একটি প্রজন্ম বিভিন্ন গভীরতায় পোনাজাল, বেহুন্দি জাল, কারেন্ট জাল, ভাসান জাল, ট্রল জালসহ বিভিন্ন জাল সরঞ্জামাদির দ্বারা আংশিক ধৃত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ সাগরে ফিরে গিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের যোগান দেয়। সামুদ্রিক মৎস্যের বংশবিস্তারে উপকূলীয় জলাশয়ের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন সময় উপকূলীয় অঞ্চল ও গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের মজুদ (standing stock) নিরূপণের জন্য একযোগে ন্যাশতার জরিপকার্য পরিচালনা করা। মৎস্য আহরণে নীতিনির্ধারণে জরিপ ফলাফল বিবেচনায় এনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের "সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন" (Maximum Sustainable Yield: MSY) নিশ্চিত করা সম্ভব

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ জরিপ কার্যক্রম
(Marine Fisheries Stock Assessment Survey Activities)

জাপানের গবেষণা জাহাজ 'হোশি মারু' ২৫ নভেম্বর ১৯৫৮ খ্রি. থেকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় ট্রল জাল ও প্লাঙ্কটন জাল দিয়ে গবেষণামূলক জরিপ পরিচালনা করে। এরপর জাপানের অপর গবেষণা জাহাজ 'কাঙয়া মারু' একই ধরনের জরিপ পরিচালনা করে। পরবর্তীতে আরেকটি জাপানি গবেষণা জাহাজ 'কিংকি মারু' ডিসেম্বর ১৯৬১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬২ মাস পর্যন্ত এবং পুনর্বার ১৯৬৩-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের ১৮ মিটারের কম গভীরতায় ভাসান জাল ও প্লাঙ্কটন জাল নিয়ে জরিপ চালায়। জাপান কর্তৃক পরিচালিত এসব গবেষণাধর্মী জরিপে বঙ্গোপসাগরের তলদেশ, পানির স্রোতধারা, চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতা ও বাণিজ্যিক মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্য সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়।

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ 'বিশ্ব খাদ্য সংস্থা'র বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নিজস্ব মৎস্যযান 'এফবি জালুয়া' দ্বারা ডিসেম্বর ১৯৬২ থেকে জুন ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়ে স্টার্ন ট্রল জাল ব্যবহার করে ৬-১৯ মিটার গভীরতায় জরিপকাজ পরিচালনা করে প্রায় ৮,০০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল এলাকায় মৎস্য আহরণ অঞ্চল ও বাণিজ্যিক মৎস্য প্রজাতিসমূহের প্রাচুর্যতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে তদানীন্তন 'পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন' ও "বিশ্ব খাদ্য সংস্থা"র প্রাক-বিনিয়োগ জরিপ প্রকল্প (UNSF-PAK-22)-এর আওতায় ১৯৬৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত গবেষণা জাহাজ 'আর ভি সাগর সন্ধানী' যোগে ৪-৪৮ মিটার গভীরতায় ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। উক্ত সময়ের জরিপকার্যের ফলাফল হিসেবে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে প্রায় ১৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের চারটি 'মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র' আবিষ্কৃত হয় এবং ৪৭৫টি সামুদ্রিক মাছের তালিকা প্রকাশ করা হয়

মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলো হলো: (১) দক্ষিণ তালি; (২) দক্ষিণ তালির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; (৩) মধ্যভূমি ও (৪) অতলস্পর্শী মহীখাদ। রাশিয়ার সহায়তায় ১৯৬৯-৭০ সালে রাশিয়ার গবেষণা জাহাজ 'লেসনয়' দ্বারা বঙ্গোপসাগরের ৭-১৩২ মিটার গভীরতায় কয়েকটি স্বল্পকালীন জরিপকাজ পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য ভান্ডার ও মজুদ নিরূপণ জরিপের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। রাশিয়ার সহায়তায় ১৯৭২ সালে রাশিয়ার গবেষণা জাহাজ 'আরভি টামাঙ্গো'র মাধ্যমে জরিপকাজ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ জরিপের নিমিত্ত জাপানের কারিগরি সহযোগিতায় ১৯৭৬-৭৭ সালে জাপানের দু'টি গবেষণা জাহাজ 'আরভি সাল্লামনিকা' ও 'আরভি ওরিয়ন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'আরভি সাল্লামনিকা' প্রশান্ত মহাসাগরীয় ট্রলজাল ব্যবহার করে ১৩-৮০ মিটার গভীরতায় ও 'আর ভি ওরিয়ন' একই ধরনের জাল দ্বারা একই গভীরতায় জরিপকাজ পরিচালনা করে। এর ফলে বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি আহরণের উপযোগী সামুদ্রিক চিংড়ি সম্পদ সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় ও চিংড়ি আহরণক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বিগত ১৯৭৯ সালে থাইল্যান্ডের 'মৎস্য গবেষণা জাহাজ-২' (RV Fishery Research No. 2) বটম ট্রল জাল ও ভাসান জাল দিয়ে ১০-৮২ মিটার গভীরতায় অল্প সময়ের জন্য (৭-১৮ মার্চ) জরিপকাজ পরিচালনা করে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জরিপ কাজ সম্পাদিত হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯ ও মে ১৯৮০ মাসে 'বিশ্ব খাদ্য সংস্থা'র সহযোগিতায় 'আর ভি ড. ফ্রিটজফ নানসেন' নামের জরিপ জাহাজের মাধ্যমে। এ জরিপ জাহাজ দিয়ে তলদেশীয় ট্রল জাল, উপরিস্তরের ট্রল জাল ও তলদেশীয় বড়শি ব্যবহার করে ১০-২০০ মিটার গভীরতায় তলদেশীয় জরিপ এবং ১২০০ মিটার গভীরতায় অ্যাকোস্টিক (acoustic) জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। অ্যাকোস্টিক জরিপ হলো আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে সম্পাদিত বিশেষ ধরনের জরিপ। 'আর ভি ড. ফ্রিটজফ নানসেন'র জরিপ থেকে সমুদ্রের পানির গুণাগুণ যেমন- লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, স্রোতের গতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ১৯৮২ সালে ড. পেন বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় চিংড়ি ও মাছের মজুদ ও বিস্তৃতি নিরূপণ করেন।

পরবর্তীতে 'বিশ্ব খাদ্য সংস্থা'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তরাধীন 'সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প'র মাধ্যমে জাপানি সহায়তায় প্রাপ্ত 'আরভি অনুসন্ধানী' ও ডেনমার্কের অনুদানে প্রাপ্ত 'এমভি মাছরাঙ্গা' দিয়ে দেশি-বিদেশি মৎস্যবিজ্ঞানী সমন্বয়ে ১৯৮৩-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত একটানা ৫ বছর চিংড়ি ও মৎস্য সম্পদের ওপর মাস ব্যাপী জরিপ কাজ চালানো হয়। এতে চিংড়ি ট্রল জাল, অ্যাঙ্গেল হাই ওপেনিং বটম ট্রল জাল ও অন্যান্য ট্রল জাল ব্যবহৃত হয়। এমভি মাছরাঙ্গা দ্বারা সমুদ্রের ১০-২০ মিটার গভীরতায় ও আর ভি অনুসন্ধানী দ্বারা ১০-২০০ মিটার গভীরতায় জরিপ কাজ চালানো হয়। এসব জরিপ কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে চিংড়ি ও মৎস্য ভান্ডারের মজুদ ও বিস্তৃতি নিরূপণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ও আরভি অনুসন্ধানীর মাধ্যমে তলদেশীয় জরিপ চালানো হলেও পরবর্তীতে জাহাজ ত্রুটি পরিচালনার অযোগ্য হলে ২০০১ সালের পর থেকে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদের মজুদের ওপর কোনো জাহাজভিত্তিক জরিপ কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি।

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড এর সমন্বয়ে গঠিত 'বঙ্গোপসাগরীয় বহুমুখী কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ' (BIMSTEC) এর আওতায় ৫ নভেম্বর ২০০৭ খ্রি. থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি. পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক সীমানায় পেলাজিক লং লাইন ব্যবহার করে উপরিতলের মৎস্যসম্পদের প্রাপ্যতা ও মজুদের ওপর 'এমভি মিয়েকজেক' কর্তৃক মাসব্যাপী জরিপকাজ পরিচালিত হয়। জরিপ এলাকায় সোর্ড ফিস, বড়চোখা হাঙ্গর ও হলুদ পাখনাযুক্ত টুনার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়; তবে সোর্ড ফিসের প্রাচুর্য মজুদ বেশি। মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামস্থ 'সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর' এবং 'সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট' থেকে যথাক্রমে বাণিজ্যিক ট্রলার বহর ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা ধৃত সামুদ্রিক মৎস্যের আহরণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত বাৎসরিক উৎপাদন প্রতিবেদন প্রণয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' এর অর্থানুকূল্যে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'র মাধ্যমে একটি কার্যকর আধুনিক জরিপ জাহাজ ক্রয় করা হচ্ছে যা বর্তমানে মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন। সংগৃহীতব্য জাহাজটির দ্বারা ২০১৫ সালে মৎস্য মজুদ নির্ণয় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্পের ল্যান্ডবেইজড সার্ভে কার্যক্রমের আওতায় উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৩৪টি নির্বাচিত মৎস্য অবতরণকেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা আহরিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জৈব-তাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে, যা মৎস্য মজুদ নিরূপণে সহায়ক হবে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ ও বিস্তৃতি
(Stock and Distribution of Marine Fishes)

সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতিসমূহ পানির বিভিন্ন গভীরতায় বাস করে। পানির উপরের স্তরে বসবাসকারী মৎস্য প্রজাতিসমূহকে (যেমন-হাঙ্গর, টুনা, ইলিশ ইত্যাদি) উপরিতলের (pelagic) মাছ ও পানির নিচের স্তরে বসবাসকারী মৎস্য প্রজাতিসমূহকে (যেমন- পোয়া, কাটা, দাতিনা ইত্যাদি) তলদেশীয় (demersal) মাছ বলা হয়। চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি তলদেশে বসবাসকারী গুরুত্বপূর্ণ খোলসযুক্ত প্রাণী (shellfish)। সমুদ্রের উপরিতলের মাছ, তলদেশীয় মাছ এবং চিংড়ির মজুদ ও বিস্তৃতি নিরূপণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

উপরিতলের মাছ (Pelagic Fish): বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় অধিকাংশ জরিপই তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ির মজুদ নির্ণয়ে পরিচালিত হয়। তবে 'আরভি ড. ফ্রিডজফ নানসেন' জাহাজের ১৯৭৯-৮০ সালে পরিচালিত জরিপে উপরিতলের মাছের মজুদ জানার জন্য অ্যাকুস্টিক জরিপ চালানো হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মোতাবেক ৬০,০০০-১,২০,০০০ মে.টন উপরিতলের মাছের মজুদ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ জরিপকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এর চেয়ে ভালো কোনো জরিপ কাজ অদ্যাবধি পরিচালনা করা হয়নি। অন্যান্য তলদেশীয় মৎস্য জরিপের ফলাফল থেকে আমাদের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় টুনা ও টুনা জাতীয় উপরিতলের মাছের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে। উপরিতলের মাছের মধ্যে মাইট্টা, হাঙ্গর ও ছোট আকারের ক্যারানগিড (carangids) ও স্কমব্রিড (scombrids) বিভিন্ন ফাঁসজালে, বড়শিতে ও তলদেশীয় ট্রলজালে বাই-ক্যাচ হিসেবে ধরা পড়ে। এদের বিস্তৃতি পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও তুলনামূলকভাবে গভীর পানিতে বেশি। উপরিতলের মাছের মধ্যে টুনা অভিপ্রয়াণশীল (migratory) ও আন্তঃসীমান্তবর্তী (trans-boundary) জলাশয়ে অভিপ্রয়াণশীল। আন্তর্জাতিক সমুদ্রে টুনা আহরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি (পার্স সাইন, টুনা লং লাইন ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয় এবং টুনা সংরক্ষণের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে থাকে।

তলদেশীয় মাছ (Demersal Fish): আমাদের সমুদ্রসীমায় পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ থেকে তলদেশীয় মাছের মজুদ সর্বনিম্ন ৫৫,০০০ মে.টন ও সর্বোচ্চ ৩,৭৩,০০০ মে.টন হিসেবে নিরূপিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে এফএও-এর বিশেষজ্ঞ ড. ওয়েস্ট বাংলাদেশের জলসীমায় তলদেশীয় মাছের মজুদ ২,৬৪,০০০-৩,৭৩,০০০ মে.টন ও 'সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন' ১,৭৫,০০০ মে.টন নিরূপণ করেন। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) ১৯৭৪ সালে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যিক মাছ আহরণ শুরু করে। 'আরভি ড. ফ্রিডজফ নানসেন' জাহাজের ১৯৭৯-৮০ সালে পরিচালিত জরিপ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী তলদেশীয় মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন যথাক্রমে ১,৬০,০০০ মে.টন ও ১,০০,০০০ মে.টন নিরূপিত হয়। ১৯৮২ সালে ড. পেন তলদেশীয় মাছের মজুদ ৩৯,২০০-৫৪,৯০০ মে.টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ১০,০০০-১৪,০০০ মে.টন নিরূপণ করেন। আরভি অনুসন্ধানীর ১৯৮১-৮৩ সাল পর্যন্ত পরিচালিত জরিপ মতে তলদেশীয় মাছের মজুদ ১,৫২,০০০ মে. টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ৪০,০০০-৫৫,০০০ মে.টন। একই জাহাজের ১৯৮৪-৮৬ সালের জরিপ তথ্য বিশ্লেষণ করে লামবুফ ১৯৮৭ সালে ১০-১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১,৫৭,০০০ মে.টন ও ১০-২০০ মিটার ১০-১২০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১,৮৬,০০০ মে.টন তলদেশীয় মাছের মজুদ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ৪৭,৫০০-৮৬,৫০০ মে.টন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক তলদেশীয় মাছের পরিমাণ ৪০ মিটার গভীরতায় বেশি, তবে ৭০-৮০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এসব মাছের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা গেছে। মোহনা ও উপকূলবর্তী কম গভীরতায় অপ্রাপ্তবয়স্ক তলদেশীয় মাছের আধিক্য বিদ্যমান।

সামুদ্রিক চিংড়ি (Shrimp): বিভিন্ন জরিপে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক চিংড়ি মজুদের পরিমাণ ১,০০০ মে.টন থেকে ১১,০০০ মে.টন বলে নিরূপিত হয়েছে। ড. ওয়েস্ট ১৯৭৩ সালে চিংড়ির অব্যবহৃত মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন যথাক্রমে ১১,০০০ মে.টন ও ৯,০০০ মে.টন নিরূপণ করেন। তবে ১৯৮৩ সালে ড. পেন বাণিজ্যিক ট্রলার বহর কর্তৃক আহরিত চিংড়ির তথ্য-উপাত্ত থেকে চিংড়ির সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য মজুদ ২,০০০-৪,০০০ মে.টন এবং আহরণযোগ্য ফলন ২০০০-৪০০০ মে.টন নিরূপণ করেন। ১৯৮৫ সালে গবেষণা জাহাজ আরভি অনুসন্ধানীর দ্বারা পরিচালিত জরিপের ফলাফলে চিংড়ির মজুদ ৩,০০০-৩,৬০০ মে.টন এবং ১৯৮৬ সালে ১,৫৫০ মে.টন ও সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য ফলন ৪,০৫০ মে.টন নিরূপিত হয়। ১৯৮৯ সালে উক্ত তিনটি জরিপ ফলাফলের গড়ের ভিত্তিতে সামুদ্রিক চিংড়ির মজুদ দাঁড়ায় ৩,১০০ মে. টন ও এর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য ফলন ৭,০০০-৮,০০০ মে.টন নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সামুদ্রিক চিংড়ির বিস্তৃতি ৪০-৭০ মিটার গভীরতায় বেশি বলে জানা যায়। সে এলাকায় পানির লবণাক্ততা ও অন্যান্য গুণাগুণ চিংড়ির বসবাসের জন্য বেশি উপযোগী। তবে কিশোর বয়সী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক চিংড়ির আধিক্য মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে। সাগরে লইল্যা চিংড়ির পরিমাণ অন্যান্য চিংড়ির তুলনায় বেশি। মোহনা ও অগভীর অঞ্চলে রোডা চিংড়ির পরিমাণ অধিক

উপসংহার (Conclusion)

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একবিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের অস্বাভাবিক ফলন, উপকূলবর্তী মিঠাপানির জলাশয়ে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশসহ সার্বিক প্রকৃতিগত পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যেও প্রভাব পড়বে। সুনামি, সিডর ও আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তন এসেছে, যা ইতোমধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তদুপরি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ তিন দশক আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অতিআহরণ ঠেকানোসহ ঠিকসই মজুদ সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমাদের সমুদ্রসীমায় ধারাবাহিকভাবে লাগসই জরিপ কাজ চালিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

[illegible]

ইলিশ উৎপাদনে জাটকা ও প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণের সুফল
Conservation of Jatka and Parent Hilsa Thriving Production

ড. মোঃ আনিসুর রহমান* ও মোহাম্মদ জাহেদ*

Abstract

Hilsa (*Tenualosa ilisha*), the national fish of Bangladesh, accounts for nearly half of the total marine fish production, equivalent to about 11% of the total fish production of the country. Its contribution to GDP is about 1%. At present, hilsa production has increased about 59.55% in comparison to the base year of 2001-02 due to successful implementation of some management tools like jatka (juveniles of hilsa) conservation, brood hilsa protection and establishment of sanctuary. The hilsa population has been regaining its uniformity which is a good sign for the species. Some other species Chandana (*Tenualosa toli*) and Gurta ilish (*Hilsa kelee*) has also started to revive indicating conservation of biodiversity. It is hoped that hilsa production will be increased upto about 4.0 lakh MT in the next five years if conservation measures with combined efforts (both research and extension agencies) are continued. In this respect research need to be continued with utmost care and efforts in including deep marine zones to develop updated strategies to improve the hilsa fishery in Bangladesh for obtaining sustainable hilsa production year after year without hampering the original stock.

জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১১ শতাংশ এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৫১ লক্ষ মে.টন (২০১২-১৩)। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১ শতাংশ। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে (নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, নির্বিচারে জাটকা নিধন ও অধিক মাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ) ইলিশের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। এ মাছের উৎপাদন সহনশীল পর্যায়ে বজায় রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন- জাটকা সংরক্ষণ, সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধকরণ, অভয়াশ্রম স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছ সারা বছর কম-বেশি প্রজনন করলেও সবচেয়ে বেশি প্রজনন করে অক্টোবর মাসের (আশ্বিন/কার্তিক) বড় পূর্ণিমার সময়। এ সময় শতকরা প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ইলিশ মাছই পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগী অবস্থায় থাকে। আর এ সময়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (মোট ধৃত মাছের ৫০-৬০%) মাছ ধরা পড়ে। একই সাথে বছরের বেশির ভাগ সময়ে নির্বিচারে প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নতুন প্রজন্মের প্রবেশন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। তাই ইলিশ মাছের অবাধ প্রবেশন নিশ্চিতকরণের জন্য ০৫টি নির্দিষ্ট এলাকায় যেমন অভয়াশ্রম ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তেমন অবাধ প্রজনন ও প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম ও পোনা উৎপাদনের জন্য 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০' এর অধীনে সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে (আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার ৫ দিন পূর্বে ও ৫ দিন পরে) প্রধান প্রজনন এলাকায় ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাটকার বিচরণক্ষেত্র ও ইলিশের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং ইলিশের আবাসস্থল নদী-মোহনার ইকোলজির ওপর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ইলিশ উৎপাদনে জাটকা ও প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণের সুফল এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হলো।

ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময়
(Major Breeding Grounds, Banned Area and Period of Hilsa)

ইলিশের প্রধান চারটি প্রজননক্ষেত্র (ঢালচর, মনপুরা, মৌলভীর চর ও কালির চর দ্বীপ) সমন্বিতভাবে প্রায় ৭০০০ বর্গকিমি এলাকায় প্রতি বছর ইলিশের প্রজনন মৌসুমে আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার সময়, বড় পূর্ণিমার ৫ দিন আগে ও ৫ দিন পরে মোট ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাটকার প্রধান বিচরণক্ষেত্র ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময় প্রতি বছর নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ধরার মৌসুম হলেও মার্চ এবং এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে (৬০-৭০%) জাটকা ধরা পড়ে।

সারণি: ইলিশের প্রজননক্ষেত্র ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময়

সীমানা		জিপিএস পয়েন্ট	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
উত্তর-পূর্ব	মায়ানী, মীরেরসরাই	উ.অ. ২২°৪২.৫৯' পূ.দ্রা. ৯১°৩২.১৫'	আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার ৫ দিন পূর্বে ও ৫ দিন পরে মোট ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ
উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম সৈয়দ আউলিয়া, তজুমদ্দিন	উ.অ. ২২°৩১.১৬' পূ.দ্রা. ৯০°৪০.৫৮'	
দক্ষিণ-পূর্ব	গণ্ডামারা, বাঁশখালী	উ.অ. ২১°৫৬.০৪' পূ.দ্রা. ৯১°৫৩.০৫'	
দক্ষিণ-পশ্চিম	লতাচাপলী, কলাপাড়া	উ.অ. ২১°৪৭.৫৬' পূ.দ্রা. ৯০°১২.৫৯'	

তাই নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রয়োজন হলেও জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা, বিকল্প কর্মসংস্থান ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে ঘোষিত ৫টি অভয়াশ্রমে নিম্নলিখিত সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়।

সারণি: অভয়াশ্রম এলাকা ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

অভয়াশ্রমের নাম	মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
১. নিম্ন মেঘনা নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
২. শাহবাজপুর চ্যানেল	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
৩. তেঁতুলিয়া নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
৪. অন্ধারমানিক নদী	নভেম্বর-জানুয়ারি (মধ্য কার্তিক হতে মধ্য মাঘ)
৫. পদ্মা নদীর নিম্নাংশ	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)

ফলাফল
(Result)

প্রজননোত্তর ইলিশ মাছের সংখ্যা, শতকরা হার এবং পরীক্ষামূলকভাবে ধৃত লার্ভি ও রেণু পোনা এবং জাটকার প্রাচুর্য ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রজনন সফলতা নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য
(Success of Natural Breeding of Hilsa)

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য নিরূপণ সমীক্ষায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে প্রায় ৩৮.৭২%, ১৭.৬২%, ৩৩.৬৯%, ৩৬.২৭%, ৩৫.৭৯% ও ৪১.০২% প্রজননোত্তর বা স্পেন্ট ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। অনুরূপ সমীক্ষায় ২০০২ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে ০.৫০% ও ১.৪০% প্রজননোত্তর মাছ পাওয়া যায়। বিগত ২০০২ সালের তুলনায় ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্যের হার যথাক্রমে শতকরা প্রায় ১১%, ৭৭%, ৩৫%, ৬৭%, ৭৩%, ৭২% ও ৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে

ডিম ও জাটকা উৎপাদনে সাফল্য
(Success in Egg and Jatka Production)

প্রজনন মৌসুমে ২০১৩ সালে ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় প্রায় ১.৬৫ কোটি ইলিশ মাছ আহরণ হতে রক্ষা পেয়েছে। আহরণরহিত ইলিশ হতে প্রায় ৪.৪৭ লক্ষ কেজি ডিম প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০% হিসেবে প্রায় ২,৭৯,৪৩৭ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং উক্ত রেণুর বাঁচার হার ১০% হিসাবে প্রায় ২৭,৯৪৪ কোটি পোনা/জাটকা চলতি বছর ইলিশ জনতায় নতুনভাবে সংযুক্ত হবে বলে ধারণা করা যায়।

জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য
(Comparative Abundance of Jatka)

নিম্ন মেঘনা অববাহিকায় কারেন্ট জাল ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে জাটকা ধরা হয়। সমীক্ষায় ২০১৩ সালে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২.৭৭ কেজি জাটকা পাওয়া গেছে, যা ২০০৫ সালের তুলনায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে ১৬৩%, ১৪৫%, ১৬০%, ১৮৯%, ১৯১% ও ১৯৫% বেশি। ইলিশ সংরক্ষণের জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ সালে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জাটকার অভয়াশ্রম) বলবৎ ছিল। কিন্তু ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে জাটকা অভয়াশ্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রধান প্রজনন এলাকায় ১০-১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জাটকার প্রাচুর্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন ও প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের সীমানা ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
(Newly Proposed Area of Sanctuary and Banned Period)

ইলিশ উৎপাদনে অভয়াশ্রমের প্রভাব ও জাটকার প্রাচুর্য নির্ণয়ের জন্য নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। পূর্বে নিম্ন পদ্মা নদীতে জাটকার প্রাচুর্য না থাকলেও সাম্প্রতিককালে জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পদ্মা ও মেঘনা নদীর কিছু এলাকায় গবেষণা সমীক্ষায় জাটকার বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন মেঘনা নদীতে নিম্ন পদ্মা নদীর তুলনায় জাটকার প্রাচুর্য বেশি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে গবেষণা সমীক্ষায় নিম্ন পদ্মায়ও প্রচুর জাটকা পাওয়ার প্রেক্ষাপটে শরীয়তপুর জেলার পদ্মা নদীর নিম্ন অংশে ২০ কিমি এলাকায় জাটকা ইলিশের নতুন একটি অভয়াশ্রম ঘোষণার জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং উক্ত অভয়াশ্রমের প্রস্তাব মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি বর্তমানে ৫ম অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত।

অব্যাহত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জাটকার প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে জাটকার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট, হরিনাথপুর পয়েন্ট ও খুনখোলা পয়েন্ট এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষানচর পয়েন্ট অঞ্চলে মেঘনার শাখা নদী, হিজলা উপজেলার ধর্মগঞ্জ ও নয়াভাঙ্গনী নদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার লতা নদীর ৬০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশ/জাটকার নতুন (৬ষ্ঠ) অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করা হয়। বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন ঘোষণাযোগ্য এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা নির্ধারণ করা হয়। অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত সারণিতে এ নতুন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা সন্নিবেশিত করা হলো। অর্থাৎ বিগত তিন বছরের পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিকভাবে জাটকার প্রাচুর্য এবং পানির গুণাগুণসহ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সকল বৈশিষ্ট্য পূরণ হওয়ায় এ অঞ্চলকে অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, প্রস্তাব গৃহীত হলে এটি ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম হিসেবে গণ্য করা হবে।

সারণি: মেঘনার শাখা নদীতে বরিশালের হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ অঞ্চলে প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রমের সীমানা এবং প্রস্তাবিত মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

সীমানা		জিপিএস পয়েন্ট	মোট আয়তন	মাছ ধরার নিষিদ্ধকালীন সময়
উত্তর-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাহকাটি পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গনী নদী)	২৩°০২.৭৫' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৬.৭৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ	৬০ (ষাট) কিমি	মার্চ ও এপ্রিল
উত্তর-পশ্চিম	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গনী নদী)	২২°৫৮.৬৭' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°২৭.৩৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		
দক্ষিণ-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার খুনজোলা পয়েন্ট (ধর্মগঞ্জ নদী)	২২°৫১.৯১' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৭.৫২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		
দক্ষিণ-পশ্চিম	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষানচর পয়েন্ট (লতা নদী)	২২°৪৭.৪৩' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°২৬.১৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		

চিত্র: প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম এলাকার সীমানা

ইলিশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৌশল ও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি (Implementation of Hilsa Management Technique and Increment of Overall Production)

বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বিষয়ক তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ফিসারিজ রিসোর্স সার্ভে সিস্টেম (FRSS) কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বিগত ২০০১-০২ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল ২,২০,৫৯৩ মে.টন। ২০০১-০২ সালের তুলনায় বর্তমানে (২০১২-১৩) বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫১,০০০ মে.টন অর্থাৎ প্রায় ৫৯.৫৫% এ দাঁড়িয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে ইলিশ জনত সুলভ হয়ে আসছে এবং হারিয়ে যাওয়া ইলিশ (চন্দনা, গুর্তা) কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হচ্ছে।

চিত্র: বিগত ৩০ বছরের ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা

উপসংহার (Conclusion)

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন তথা- জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজননক্ষেত্রে প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকরণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতি বছরই বিভিন্ন নদ-নদীতে জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ বছরে ইলিশের মোট উৎপাদন বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টনে সহনশীল পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে। ইলিশের প্রজননক্ষেত্র এবং জাটকার বিচরণক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে অব্যাহত গবেষণা প্রয়োজন। নতুন প্রজননক্ষেত্র এবং বিচরণক্ষেত্র শনাক্তকরণের জন্যও গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে। ইলিশ বিষয়ক গবেষণায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি আবশ্যক। জাটকা সংরক্ষণের সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলেদের খাদ্য সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম উপকূলের ইলিশ সম্পর্কিত সকল জেলা এবং উপজেলায় সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইলিশ সম্পর্কিত সকল নদ-নদীর সাথে বঙ্গোপসাগরকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সেই সাথে উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় ইলিশ সংরক্ষণজনিত আইন বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সার্ভেল্যান্স জোরদার করা প্রয়োজন।

চিংড়ি শিল্পে এন্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব

Harmful Effect of Uncontrolled Use of Antibioties in Shrimp Industry

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মনজুরুল করিম[১], ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক[২] ও অধ্যাপক ড. এম নিয়ামুল নাসের[৩]

Abstract

Macrobrachium rosenbergii, the giant fresh water prawn, popularly known as Golda is one of the most important commercially produced crustaceans in Bangladesh. A significant limitation to the industry is loss of productivity owing to the emergence of a large variety of pathogenic bacteria and viruses, and their resistance to chemotherapeutic drugs resulting in mass mortality and consequent crop failure. A study, following a disease outbreak in prawn hatcheries of Satkhira, Bagerhat and Khulna regions during May 2012, was conducted to address the PL mortality, and it was found that in contrast to the mere bacterial loads found in hatchery waters and prawn feed, samples of dead golda PL harbored a huge load of bacterial population, most of them were identified pathogenic to prawn as well as multi drug resistant (MDR). The evolution of pathogenic MDR bacteria could be attributed to the overuse or unplanned application of antibiotic drugs, resulting in the failure of disease control. Absence of responsible management could be the other cause of PL deaths. We recommend a number of strategies in this literature need to be implemented for responsible aquaculture, together with the rightful use of recommended drugs, the Good Aquaculture Practice (GAqP) could be the savior to control disease management in hatcheries tanks. Rearing mother shrimp only in increased saline water, control excessive use of calcium based cleaner, collection of stronger PL failing light only in a corner, use of pathogen free water, use of specific drug at specific dose are the major steps of responsible hatchery management.

মৎস্য সম্পদের মধ্যে অন্যতম সুস্বাদু ও জনপ্রিয় প্রজাতি হল চিংড়ি। সারাবিশ্বে এর কদর থাকায় উচ্চ মূল্যের চিংড়ি ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় এই শিল্পের মাধ্যমে। কিন্তু সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রধান বাধা 'রোগ'। লোনা পানির চিংড়ির ক্ষেত্রে চাষ পর্যায়ে এবং স্বাদু পানির চিংড়ির ক্ষেত্রে হ্যাচারি পর্যায়ে রোগের দ্বার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। বিগত কয়েক বছরে স্বাদু পানির চিংড়ি তথা গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে অজ্ঞাত কারণে পিএল এর উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিগত দু বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি সমন্বিত বিশেষজ্ঞ দল এর কারণ উদঘাটনে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে। হ্যাচারি পর্যায়ে পিএল মড়কের কারণ অনুসন্ধানে হ্যাচারিতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসে, সে সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ছয় দশক পরেও ঔষধ হিসেবে মানব সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চিংড়ির রোগবালাই দমনেও এন্টিবায়োটিক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এন্টিবায়োটিক এক ধরনের ঔষধ যা অণুজীবনাশক অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়ার মত রোগবালাই সৃষ্টিকারী অণুজীবগুলোকে মেরে ফেলে কিংবা তাদের প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। তাই ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়াজনিত রোগবালাই থেকে উপশম পেতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক চিংড়ি শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত এন্টিবায়োটিকগুলো হলো: ট্রাইকেইন মিথেন সালফোনেট, ফরমালিন দ্রবণ (বহিঃস্থরে নির্দিষ্ট মাত্রায়), অক্সিটেট্রা সাইক্লিন, সালফাডাই মিথোক্সিন বা অরমেট্রোপিম যৌগ। বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পে নিষিদ্ধ ঘোষিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলো হলো ক্লোরাম ফেনিকল, ক্লোরোফর্ম, ক্লোরোহ্রমাজিন, কোলসিসিন, ডেপসন, ডাই মেট্রিডাজল, মেট্রোনিডাজল, নাইট্রোফিউরান এবং রোনেডাজল।

এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা (Efficiency of Antibiotics)

চিংড়ির ভাইরাসজনিত রোগ দমনে কোনো এন্টিবায়োটিক নেই। তবে, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমনে শুধুমাত্র অনুমোদিত/নিরাপদ এন্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহারে চিংড়ি উৎপাদন করতে পারি। চিংড়ির হ্যাচারিতে বা দেহে রোগ দেখা গেলে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্যকর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে ব্যাকটেরিয়ার ঔষধ-প্রতিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে এন্টিবায়োটিক চিকিৎসায় কোনো সুফল তো পাওয়া যাবেই না, বরং চিকিৎসা করার পথও বন্ধ হয়ে যায়। আর ঔষধে শুধু অর্থের অপচয় হয়, কাজ হয় না। অর্থাৎ, চাষি বা হ্যাচারি অপারেটর যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন, তা কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে আদৌ ভূমিকা পালন করতে পারে না। রোগ সংক্রমণের সময় আবার এন্টিবায়োটিক অন্য ঔষধের সাথে মিশিয়েও প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখা যায়। এতে অন্য ঔষধের বিক্রিয়ায় এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ (Drug Resistance of Bacteria)

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছ এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে চিংড়ির রোগ সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো এন্টিবায়োটিক ঔষধ-প্রতিরোধ (drug-resistance) ক্ষমতা

অর্জন করছে। অর্থাৎ, প্রতিরোধক এন্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে অথবা অকার্যকর হয়ে চিংড়িকে রোগব্যাধির আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। যেহেতু ব্যাকটেরিয়া একটি দ্রুত বর্ধনশীল অণুজীব, এরা খুব সহজেই বিভিন্ন প্রতিকূলতায় বেঁচে থাকার উপায় বের করে ফেলে। এমনকি এরা এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতিতেও বেঁচে থাকার উপায় বের করে, যাকে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ (antibiotic resistance) বলা হয়। এছাড়াও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন এন্টিবায়োটিক সরাসরি পানিতে বা খাদ্যে ব্যবহার করলে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের (target) ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও জলজ পরিবেশে থাকা কিংবা চিংড়ির শরীরে থাকা অন্যান্য উপকারি ব্যাকটেরিয়াগুলোও মারা যায়, যা পরিবেশকে প্রতিকূল করে তোলে। সুতরাং এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অণুজীব এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে না ওঠে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে চিংড়ি হ্যাচারির ও ঘেরের পানিতে এবং খাদ্যের মাধ্যমে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে। খুলনা ও বাগেরহাটের চিংড়ির হ্যাচারি ও ঘেরের পানি, চিংড়ির খাবার এবং মৃত পোনা থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র মৃত পোনাতেই প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছিল, যা মড়কের কারণ হিসেবে অনুমান করা হচ্ছে। এ ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রায় ২০টির অধিক এন্টিবায়োটিক-প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। চিংড়ি হ্যাচারি ও ঘেরে পানি থাকা অবস্থায় ব্যাকটেরিয়াতে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধরে নেয়া যায়, অনিয়ন্ত্রিতভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকারক এ ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূলকথা (Keynote)

ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়, ফলে ঔষধ প্রয়োগে কোন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। পানিতে ঔষধ প্রয়োগে ক্ষতিকর ও অপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো আরও এন্টিবায়োটিক ঔষধ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। মনে রাখতে হবে প্রতিরোধই প্রতিকারের মূল চালিকা শক্তি। উন্নত মানের যুক্তিপূর্ণ (responsible) ব্যবস্থাপনা এ সংকট থেকে মুক্তির প্রধান উপায়। এ লক্ষ্যে তিনটি ব্যাপারে অবশ্যই নজর দিতে হবে। যদিও ব্যাপারগুলো চিংড়ি হ্যাচারির অনেকেই জানেন, তবুও মূলকথা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১. সঠিকভাবে ব্রুড পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ

- ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস থেকে মুক্ত ব্রুড সংগ্রহ
- সুস্থ ও সঠিক ব্রুড সংগ্রহ ও যৌক্তিকভাবে প্রতিপালন

২. হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন

- হ্যাচারির পরিবেশ উন্নয়নে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। জীবাণুমুক্ত উৎস থেকে পানির সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা। ভাল পানির জন্য নিজস্ব নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ জলাশয় বা পুকুর অথবা ডিপ টিউবওয়েল ব্যবহার করা উচিত।
- হ্যাচারির পানির গুণাগুণ নিশ্চয়তা ও ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্তকরণ।
- সঠিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ।

৩. চিংড়ির পুষ্টি ও খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ

- অপুষ্টিজনিত কারণ পরিহার
- অব্যবস্থাপনার জন্য ভাল খাদ্য সংক্রমিত হয়ে খাদ্য নষ্ট হওয়া রোধ করা।

ব্রুড চিংড়ি পরিচর্যায় যুক্তিযুক্ত প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা (Responsible Management for Brood Rearing)

গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় দেখা যায় যে ব্যবস্থাপক বা টেকনিসিয়ান নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ইন্টারনেটের বদৌলতে অনেক ব্যবস্থাপক গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে বাগদা চিংড়ির পদ্ধতি ব্যবহার করেন বা করার চেষ্টা করেন ফলে কোনো উপকার পান না। মনে রাখতে হবে যে বাগদা লোনা পানির চিংড়ি আর গলদা স্বাদুপানির চিংড়ি। তবে জীবনের বিশেষ প্রয়োজনে অল্প লোনা পানিতে উভয় চিংড়িই বসবাস করে। এজন্য বাগদার হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার্য ঔষধ গলদার হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাবে না। রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনায় নিচের প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজ দিতে দেখা যায়:

ক. গলদা ব্রুড সংগ্রহের পর স্বাদুপানিতে ২-৩ বার ধুয়ে নেয়া যেতে পারে।

খ. কয়েক ধাপে ৩ থেকে ৪ পিপিটি করে পানির লবণাক্ততা বাড়িয়ে ৮-১০ পিপিটি করে দিলে ব্রুড গলদা স্বাদু পানির অনেক রোগ থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে মুক্তি পায়। এতে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।

গ. ব্রুড গলদাকে ভাল মানের পিলেট ফিড খেতে দিতে হবে। ভাত, ভেজা ফিড ইত্যাদিতে পূর্ণমানে পুষ্টি থাকে না ও পানির মান নষ্ট করে তাড়াতাড়ি।

ঘ. ৪-৫ দিন পর যখন ব্রুড গলদা লার্ভ ছেড়ে দেবে তখন পুরা ট্যাঙ্কটি মোটা ও কাল কাপড়ে মুড়ে দিয়ে এক কোণায় আলো দিয়ে রাখলে সদ্যোজাত পিএল-গুলো আকর্ষিত হবে। তাদের ছাঁকনির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে এবং ১২ পিপিটি লবণাক্ত জলাধারে রাখতে হবে। এক্ষেত্রেও কোনো ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। তবে প্রয়োজনে শুধুমাত্র

ছবি: পুরুষ গলদা চিংড়ি

সর্বোচ্চ ১০০ পিপিএম ফরমালডিহাইডে ৫ থেকে ৮ সেকেন্ড ডুবিয়ে নিয়ে পালন ট্যাঙ্কে সরাসরি রাখা যেতে পারে।

৬. লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনোভাবে গলদা চিংড়ি হ্যাচারির পানির তাপমাত্রা ৩০° সে. এর উপরে না ওঠে। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. গবেষণায় দেখা গেছে যে আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া পানিতে যোগ হয়। তাই সিস্টকে ফুটানোর আগে ভাল করে নিয়মমত কোনো জীবাণুনাশকে ধুয়ে নিতে হবে।

ছবি: গলদা চিংড়ির পিএল পালন; পানিতে রং দেয়া হয়েছে, খুলনা

ছবি: গলদা চিংড়ি হ্যাচারির অংশ, খুলনা

ছবি: গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধ সামগ্রী, খুলনা

ছবি: গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে নপ্লি উৎপাদন, খুলনা

শেষকথা (Endnote)

গলদা একটি মূল্যবান চাষযোগ্য চিংড়ি। দেশের গলদা চিংড়ি চাষে চিংড়ি পোনা সরবরাহে গলদা চিংড়ির হ্যাচারির কোনো বিকল্প নেই। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে নানা ঔষধ প্রয়োগে যদিও প্রাথমিকভাবে কিছু সুফল পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী চক্রে সকল ক্ষেত্রেই ঔষধ প্রতিরোধ (resistance) ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে রোগ নিয়ন্ত্রণে যুক্তিপূর্ণ (responsible) ব্যবস্থাপনা অনেক সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

প্রভাষক, [illegible] বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সিনিয়র পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্যের বিকল্প হিসেবে কালো সৈনিক পোকার চাষ ও সম্ভাবনা
Black Solder Fly Larvae : An Alternative Feed Option for Aquaculture

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম[১], শাহরিয়ার হাশেম[২] ও কে এম শাকিল রানা[৩]

Abstract

Aquaculture provides animal protein, employment and addresses nutrient deficiency in Bangladesh. Adulterated and low quality fish feed creates environmental hazards and reduces fish farming profitability. An initiative was taken to produce protein, fat and minerals containing non pest insect, Black Soldier Fly (BSF) at Bangladesh Agriculture Univeristy (BAU). The larvae rearing technique will control fish feed cost, boost up fish production and tackle environmental hazards in the country. The wild BSF attracted to lay eggs especially made devices which then hatched and larvae emerged. Newly hatched larvae consumed voraciously the household putrescent wastes. The larvae were collected, analyzed and fish feed prepared by replacing fish meal with BSF and fed to tilapia. Data interpretation showed that the BSF larvae production fluctuated with the temperature and stopped in less than 15°C. The proximate composition of BSF larvae was found 62% moisture, 7% lipid, 16% protein, 3% ash, 3.2% crude fiber and 9% carbohydrate on live wet basis. The BSF larvae containing feed performed well with tilapia farming compared to the control. The survival rate of tilapia fry as well as production and FCR was higher than the control. Further research needed to develop the captive breeding of BSF for sustainable production.

আবহমানকাল হতে বাংলার মানুষ মৎস্য আহরণ ও আহারের সাথে সম্পৃক্ত। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, হাওর-বাঁওড়ে এক সময় বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মাছ ধরা এ অঞ্চলের মানুষের বিনোদন ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ক্রমান্বয়ে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ ভরাট করে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও কৃষিজ উৎপাদনে ব্যবহারের ফলে মাছের প্রজনন ও আবাসস্থল দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মাছের চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ নানাবিধ পদ্ধতিতে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বর্তমানে চাষকৃত মাছ মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করছে। বিগত দু'দশকে সারা বিশ্বে চাষকৃত মাছের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ চাষ ফিসমিলের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। আর এ ফিসমিলের উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ নির্বিচারে আহরণের ফলে মাছের প্রাপ্যতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে মাছের আবাসস্থল, বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া মাছের পুকুরে প্রয়োগকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্যের পচন এবং চাষকৃত মাছের বর্জ্য দ্বারাও পানি দূষণ হয়। দূষিত পানির ফলে প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষে ব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্যে ভেজালের ফলে একদিকে চাষিরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অপরদিকে এ ভেজাল ও দূষিত খাদ্যের বর্জ্যে মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং জলাশয়ের জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

মৎস্যচাষে বিকল্প খাদ্যের অনুসন্ধান
(Search for an Alternative Fish Feed)

২০০৭ সালে বিশ্বব্যাপী এক জরিপের মাধ্যমে জানা যায়, ৩৭,২৪,০০০ মে.টন শুটকি মাছ ও ৪,২৫,০০০ মে.টন মাছের তেল নিবিড় মাছ চাষে ব্যবহৃত হয় যা ১৬.৬ মিলিয়ন মে.টন ভাসমান মাছের সমতুল্য। উল্লেখ্য, শুধু ১৯৭১ সালেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ মে.টন আনচোভি (Anchovy) নামক ছোট ভাসমান মাছ ধরা হয়। এরপর হতে এ মৎস্য প্রজাতিটি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে এবং ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী এ মাছের মোট উৎপাদন দাঁড়ায় মাত্র ৮০ লক্ষ মে.টন। এভাবে এমশ উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকলে মাছ চাষে অবশ্যই ধ্বস নামবে। এ সমস্ত সমস্যা হতে পরিত্রাণের নিমিত্ত মানুষ শুটকি মাছের বিকল্প অনুসন্ধানে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার কনাদার শস্য, সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার, কসাইখানার বর্জ্য, কৃষি উপজাত, অধিক পরিমাণ ডিমধারণকারী শস্য মাছ (sand smelt), জলজ আগাছা (Azola), ব্যাকটেরিয়াল কলোনি এবং সর্বশেষে কালো সৈনিক পোকার লার্ভা মাছের খাদ্য হিসেবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মাঝে শাকসবজির উচ্ছিষ্টাংশ ও Azola দ্বারা তৈরিকৃত খাদ্য রাক্ষুসে মাছ উৎপাদনে খুব একটা ভাল ফল দেয়নি। কারণ উক্ত খাদ্যে রাক্ষুসে মাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আমাইনো এসিড এবং শর্করার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কালো সৈনিক পোকার লার্ভা দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য কেবল মাছের খাদ্য সমস্যার সমাধানই করা হচ্ছে না উপরন্তু শহরাঞ্চলের বর্জ্য পরিশোধনেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

কালো সৈনিক পোকা
(Black Soldier Fly)

কালো সৈনিক পোকা হচ্ছে *(Hermetia illucens)* খুবই সাধারণ এবং সুবিস্তৃত একটি পোকা যা স্ট্রাটিয়োমাইডি (Stratiomyidae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ পোকার আদি নিবাস উত্তর আমেরিকা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বের উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলসমূহে এর বিস্তরণ ঘটে। কালো সৈনিক পোকা আমাদের আশেপাশে বাস করলেও মানুষের সংস্পর্শে

ছবি: কালো সৈনিক পোকার জীবনচক্র

অগে না বললেই চলে। এরা সাধারণত ময়লা আবর্জনার কাছাকাছি ঝোপঝাড়ে বাস করে। পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে অনেকটা মৌমাছির মতো। তবে মাছির মতো এরা কোনো প্রকার রোগের বাহক নয়। পূর্ণ বয়স্ক কালো সৈনিক পোকা মাত্র তিন থেকে পাঁচ দিন বেঁচে থাকে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পর স্ত্রী পোকা ময়লা আবর্জনার আশেপাশে কোনো স্থানে সাদা চালের মতো ৫০০-৭০০টি ডিম দিয়ে থাকে। ডিমপাড়ার পর পরই পূর্ণাঙ্গ পোকা মারা যায়। ডিম ফুটে লার্ভি বের হয়ে ময়লা আবর্জনা ভক্ষণ করে বড় হতে থাকে। লার্ভি সাধারণত ৬ বার খোলস পরিবর্তন করে ৪০-১২০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। তাপমাত্রা অনুকূলে থাকলে ৪০ দিনে এবং তাপমাত্রা অনুকূলে না থাকলে ৪ মাস পর্যন্ত এরা পিউপা অবস্থা অতিবাহিত করতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক কালো সৈনিক পোকা সাধারণ উঁচা পোকার মতো আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে যার সত্যিকারের কোনো মুখ থাকে না। ফলে এরা কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না; তবে তরল জাতীয় পানীয় পান করতে পারে। পূর্ণাঙ্গ পোকার একমাত্র কাজ হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মিলন এবং ডিম পাড়া। একটি পূর্ণাঙ্গ কালো সৈনিক পোকা গড়ে ৫-৭ দিন বেঁচে থাকে। এরা তাপমাত্রার প্রতি খুবই সংবেদনশীল। ২০-৩৫° সে. তাপমাত্রায় এরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। তবে ১৫° সে. এর নিচের তাপমাত্রায় এরা চলাচল বন্ধ করে দেয়। আর ৪° সে. এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় এরা তাদের জৈবিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। পরিবেশের তাপমাত্রা ১৫° সে. বা তার বেশি হলে এরা পুনরায় এদের জৈবিক কার্যক্রম আরম্ভ করে। পরিবেশে খাদ্য ঘাটতি হলে এদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ পোকা কার্যকরভাবে পরিবেশের প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এরা শীতপ্রধান অঞ্চলে শীতকালে কিভাবে বেঁচে থাকে। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে শীতকালে এরা ময়লা আবর্জনার মাঝে গর্ত খনন করে অনেক গভীরে ঢুকে শীতকাল অতিবাহিত করে। পচনশীল দ্রব্যের গভীরে থেকে এরা একদিকে নিজেদের বাইরের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে; অপরদিকে বর্জ্য আহার করে শক্তি সঞ্চয় করে বেঁচে থাকে।

কালো সৈনিক পোকা (Black Soldier Fly)

কালো সৈনিক পোকা সত্যিকারের প্রাকৃতিক বর্জ্য পুনঃব্যবহারকারী প্রাণী। এরা বসতবাড়ির বর্জ্যকে খুব নিপুণভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এদের লার্ভি নিরবে-নিভৃতে জমানো পচনশীল ময়লা আবর্জনার মধ্যে অবশিষ্ট খাদ্য ও পুষ্টি শোষণ করে অন্যান্য প্রাণীকূলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। উপজাত হিসেবে এরা তরল ও ঝুরঝুরে সার উৎপাদন করে যা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। কালো সৈনিক পোকার লার্ভি ময়লা আবর্জনার মধ্যে বড় হলেও যখন প্রি-পিউপা পর্যায়ে উপনীত হয় তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হেঁটে হেঁটে একটি নির্দিষ্ট পাত্রে এসে জমা হয়। এ সময় এরা যথেষ্ট পুষ্টি এবং চর্বিসমৃদ্ধ থাকে যা বিভিন্ন প্রকার মাছ, হাঁস-মুরগি, পোষা পাখি, উভচর প্রাণী এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর পুষ্টি সাধন করে থাকে।

ছবি: প্রি-পিউপার স্বতঃস্ফূর্ত গমন

এদের নাইট্রোজেন ক্যালসিয়াম এবং কাইটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় চিংড়ি এবং ডিম দেয়া মুরগীর আদর্শ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। বাড়ির আঙিনায় কালো সৈনিক পোকার উপস্থিতি ক্ষতিকর মাছি এবং কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। মৎস্য খাদ্যের বিকল্প হিসেবে কালো সৈনিক পোকার সম্ভাবনা আধা-নিবিড় বা নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে মাছ চাষ থেকে নির্গত দূষিত পানির ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। মাছকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় তার সবটুকু মাছ খায় না। অতিরিক্ত খাদ্য এবং মাছের বর্জ্য সাধারণত পরিবেশে অবমুক্তকরণ হয় যা পরিবেশ দূষণের প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত পুষ্টি, বিভিন্ন প্রকার ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য জলাশয়ে দূষণের সৃষ্টি করে। এ দূষিত পানি নির্গমনের ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের অপ্রতুল উৎপাদন এবং ফিসমিলের দামসমূহের ঊর্ধ্বগতির কারণে মৎস্য খাদ্য ক্রয় করা অনেক ক্ষুদ্র মৎস্যচাষির নিকট দুরূহ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় যদি কালো সৈনিক পোকা এবং পোকা দ্বারা তৈরি খাদ্য মাছের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয় তাহলে একদিকে যেমন ফিসমিলের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যাবে এবং অপরদিকে তেমনি পরিবেশ দূষণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হবে।

সৈনিক পোকার উৎপাদন কৌশল ও পুষ্টি গুণাগুণ
Production technique of soldier fly and its nutritional value

মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তি এবং মাছের খাদ্য উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের আওতায় একদল গবেষক ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে কালো সৈনিক পোকার লার্ভা উৎপাদনের উপর গবেষণার কাজ পরিচালনা করে আসছেন। প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান কালো সৈনিক পোকাকে বিভিন্ন প্রকার পচনশীল দ্রব্যের মাঝে ডিম দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়, যেমন- রান্নাঘরের ফলমূল-তরকারির উচ্ছিষ্টাংশ, ফলমূলের খোসা, সরিষার খৈল পচা, গম পচা ইত্যাদি বিশেষভাবে নির্মিত ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রেখে ডিম দেয়ার জন্য স্ত্রী কালো সৈনিক পোকাকে আকৃষ্ট করা হয়। পাত্রগুলোকে ডাস্টবিনের নিকটে, বাসার পিছনের বাগানে, বাসার ছাদে এবং মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের নিকট ঝোঁপঝাড়ে রাখা হয়। পাত্রগুলোতে যাতে স্ত্রী পোকা সহজেই প্রবেশ করতে ও ডিম দিতে

ছবি: কালো সৈনিক পোকার ব্রিডিং চেম্বার

বের হতে পারে তার জন্য কয়েকটি ছিদ্র রাখা হয়। তাছাড়া প্রি-পিউপা যাতে পাত্র থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে পারে তার জন্য একটি সিঁড়ি এবং নির্গমনের পথে একটি সংগ্রাহক পাত্র যুক্ত করা হয়। আমাদের দেশে কালো সৈনিক পোকা সাধারণত মার্চ-সেপ্টেম্বর মাসে সক্রিয় থাকে। শীতকালে এদের খুব একটা দেখা যায় না। এসময় এরা ময়লা আবর্জনার মাঝে নিজেদের লুকিয়ে রেখে শীতকাল অতিবাহিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ডিসেম্বর মাসে অত্যন্ত শীতল পরিবেশেও এরা পচনশীল ময়লা আবর্জনার মাঝে খুব ভালভাবে বেঁচে থাকে। পাত্রে রক্ষিত পচনশীল দ্রব্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী কালো সৈনিক পোকা পাত্রের মাঝে ডিম পাড়ে। চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে পোকার লার্ভি বেরিয়ে আসে যার আকার সাধারণত ০.৫-০.৭ সেমি। সদ্যজাত লার্ভি পচনশীল দ্রব্যাদি খেয়ে খুব দ্রুত বড় হতে থাকে। এ অবস্থায় লার্ভি ২২-২৪ দিন অতিবাহিত করে এবং প্রি-পিউপা অবস্থায় উপনীত হয়। এ প্রি-পিউপা দেখতে কিছুটা কালচে-বাদামি রঙের হয় এবং পুষ্টিমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। এ অবস্থায় এরা খাদ্য গ্রহণের স্থান ত্যাগ করে শুষ্ক ও নিরাপদ স্থানের খোঁজে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। খাদ্যের পাত্রের মাঝে একটি বিশেষ ধরনের সিঁড়ি স্থাপন করে এদেরকে আহরণ করা হয়। এ প্রি-পিউপা উপযুক্ত স্থানে পৌঁছানোর পরে পিউপায় পরিণত হয়। নিশ্চল অবস্থায় পিউপা ১২-১৪ দিন অতিবাহিত করার পর খোলস ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ কালো সৈনিক পোকা বেরিয়ে আসে। প্রি-পিউপা লম্বায় প্রায় ২ সেমি এবং ওজনে ০.১২ গ্রাম হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, শুষ্ক অবস্থায় প্রি-পিউপাতে ৪০-৪৭% আমিষ, ৩০-৩৫% স্নেহ এবং ২০-২২% শর্করা বিদ্যমান থাকে। এছাড়া এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সোডিয়াম বিদ্যমান থাকে। তবে খাদ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে প্রি-পিউপাতে পুষ্টি কমবেশি হতে পারে। অধিকন্তু প্রি-পিউপা দ্বারা মাছের খাদ্য প্রস্তুত করে তেলাপিয়া মাছের উপর পরীক্ষা করে বাজারে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক খাদ্যের চেয়ে অনেক ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে।

ছবি: কালো সৈনিক পোকার পিউপা

উপসংহার (Conclusion)

কালো সৈনিক পোকা পরিবেশবান্ধব এবং মৎস্যচাষিদের বন্ধু। মৎস্যচাষিরা কালো সৈনিক পোকার চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে কম খরচে মাছ এবং হাঁস-মুরগির সম্পূরক খাদ্যের অনেকটাই যোগান দিতে পারে। ফলে মৎস্যচাষে তাদের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি বাড়ির বর্জ্য পরিশোধন করে তারা গুণগতমানের সারও পেতে পারে। তাছাড়া পোল্ট্রি বা ডেইরি ফার্মে কালো সৈনিক পোকার লার্ভি চাষ করে একদিকে যেমন প্রোটিনসমৃদ্ধ জীবন্ত খাদ্য পাওয়া যায়। অপরদিকে ফার্মের বর্জ্য পরিশোধন করাও সম্ভব। চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মত উন্নত দেশসমূহে রেইনবো ট্রাউট, ক্যাটফিস, তেলাপিয়া ও হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে কালো সৈনিক পোকার লার্ভা ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশের জলবায়ু কালো সৈনিক পোকার জন্য উপযোগী হওয়ায় এর ব্যাপক উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে এ পোকার ব্যাপক চাষের মাধ্যমে আমরাও কম খরচে মাছ এবং হাঁস-মুরগির ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি- যা হবে প্রকৃত অর্থেই দেশের জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর।

[illegible]

পরিবেশবান্ধব সুস্বাদু শিং মাছের মিশ্র চাষ
Environment Friendly Polyculture of Delicious Fish, Shing

ড. এএইচএম কোহিনুর[১], মোঃ মশিউর রহমান[১] ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ[২]

Abstract

Among the air-breathing catfishes, stinging catfish, shing *(Heteropneustes fossilis)* is very popular and high valued fish in Bangladesh. It is considered to be highly nourishing, palatable and tasty and well preferred because of its less spine, less fat and high digestibility. Recently many farmers of Mymensingh region are practicing mono culture of shing in their ponds, but they are facing many problems during culture system. Sometimes shing is affected by disease due to lack of proper scientific management. Recently, BFRI developed a shing based polyculture culture technology, which is risk free and environment friendly. In this technology, shing can be cultured with magur *(C. batrachus)*, monosex GIFT *(O. niloticus)*, Rajputi *(B. gonionotus)* and Silver carp *(H. molitrix)* at the stocking density of 50,000, 5,000, 10,000, 2500 and 500/acre, respectively with 30% protein rich supplementary feed. After six months rearing, a production of 6,000 kg/acre could be achieved where the relative contribution of shing is about 50%. Through this culture technology, a net benefit of Tk.7.24 lac/acre/crop could be achieved.

অবহমান কাল থেকেই আমাদের দেশে শিং-মাগুর অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাছ। এ মাছে ফ্যাট/তৈল এর পরিমাণ কম থাকায় এবং সহজপাচ্য উচ্চমানের প্রচুর আমিষ থাকায় সবার মধ্যে বিশেষ করে রোগীদের মধ্যে এসব মাছের প্রচুর চাহিদা ও কদর রয়েছে। তাছাড়া শিং-মাগুরকে জিয়ল মাছ বলা হয়ে থাকে আর জিয়ল মাছের চাহিদা অন্য সব মাছের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই কার্পজাতীয় মাছের চেয়ে এদের বাজারমূল্যও অনেক বেশি। ইদানিংকালে অনেক উদ্যোগী চাষি পুকুরে শিং মাছের চাষ করছেন। শিং মাছ চাষ করে অনেকে লাভবান হয়েছেন আবার অনেকে এ মাছ চাষ করে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন। তাছাড়া মাছের খাদ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার কারণে অনেক চাষি শিং মাছের চাষ থেকে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারছেন না। যার কারণে অনেক চাষি শিং মাছ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, শিং মাছ একক চাষের চেয়ে মিশ্র চাষ বেশি লাভজনক ও ঝুঁকি কম। ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক চাষি শিং মাছের মিশ্র চাষ করে লাভবান হয়েছেন।

শিং চাষে ঝুঁকির বিষয় বিবেচনা করে শিং মাছের সাথে মাগুর, রাজপুঁটি ও তেলাপিয়া মাছের মিশ্র চাষ করা লাভজনক। সহঅবস্থানের মাধ্যমে একই পুকুর থেকে শিং ও মাগুর মাছের আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। নিম্নে মিশ্রচাষ পদ্ধতির ধাপসমূহ বিবৃত করা হলো:

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

(Pond Selection and Preparation)

- শিং মাছের মিশ্র চাষের জন্য ২০-১০০ শতাংশ আয়তনের পুকুর নির্বাচন করা যেতে পারে, যেখানে বছরে কমপক্ষে ৭-৮ মাস ১ থেকে ১.৫ মিটার পানি থাকে।
- শিং মাছ চাষের জন্য পুকুর অবশ্যই শুকাতে হয়। শুকানোর পর তলদেশের পচা কাদা অপসারণ করতে হয় এবং পাড় ভালভাবে মেরামত করতে হয়।
- এরপর তলদেশ ৩-৭ দিন রৌদ্রে শুকাতে হয়। অতঃপর তলা থেকে ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করার জন্য প্রতি শতাংশে ১৫-২০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।
- ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে পুকুর বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ১.০ মিটার পরিমাণ পূর্ণ করতে হয়।
- পানি পূর্ণ করার পর শতাংশে প্রতি ১.০ কেজি কলিচুন পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়।
- চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিতে হয়।

পোনা আহরণ (Fry Collection)

গুণগত মানসম্পন্ন সুস্থ-সবল পোনা সংগ্রহ এবং পরিবহন শিং মাছ চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সময় অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত শিং মাছের পোনা হ্যাচারি হতে সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া ধানক্ষেত ও বিলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পোনা সংগ্রহ করে চাষের জন্য মজুদ করা যেতে পারে। শিং মাছের পোনা পরিবহনকালে ও মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনায় মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এছাড়া অসতর্কতার কারণে স্পর্শকাতর ও নরম চামড়ার এ মাছের শরীরে সামান্যতম ক্ষত হলে তা থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে পোনা মজুদের পর পুকুরে ব্যাপক হারে রোগবালাই দেখা দিতে পারে। সেজন্য নার্সারি পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় এক সাথে বেশি সংখ্যক পোনা না ধরে

কম সংখ্যক পোনা আহরণ করা উচিত। বড় জাল থেকে পোনা সংগ্রহের সময় অল্প অল্প পোনা বালতি বা পাতিলে সংগ্রহ করে ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হয়। ট্যাংক হতে ৫-৬ ঘন্টা পর গ্লাস মইলনের হাপা দিয়ে সতর্কতার সাথে অল্প অল্প করে পোনা পরিবহনের জন্য ধরতে হয়। পরিবহনের সময় শিং এর পোনা যদি ড্রামে খাড়া হয়ে ভাসতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এ পোনা দুর্বল বা রোগাক্রান্ত।

পোনা পরিবহন (Fry Transportation)

শিং মাছের পোনা পরিবহনের সময় প্লাস্টিক ড্রাম ব্যবহার করা উত্তম। দূরত্ব অনুযায়ী প্রতি ড্রামে ১.৫-২.০ ইঞ্চি আকারের ৩-৪ কেজি পোনা অথবা ২,০০০-৩,০০০টি পোনা পরিবহন করা যায়। এরূপভাবে ৮-১০ ঘন্টা সময় দূরত্বে নির্বিঘ্নে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে।

পোনা মজুদ (Fry Stocking)

শিং মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রতি শতাংশে নীচের সারণি অনুযায়ী শিং মাছসহ অন্যান্য প্রজাতির সুস্থ, সবল ও গুণগতমানসম্পন্ন পোনা প্রস্তুতকৃত পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে। শিং মাছের পোনা মজুদের এক মাস পর মাগুর, মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া, রাজপুঁটি ও সিলভার কার্প এর পোনা মজুদ করতে হয়।

সারণি : বিভিন্ন প্রজাতির মাছের আকার ও শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্ব

ক্রমিক নং	প্রজাতি	পোনার আকার (সেমি)	মজুদ ঘনত্ব (শতাংশ)
০১	শিং	৭-৮	৫০০
০২	মাগুর	৭-৮	৫০
০৩	মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া	৫-৬	১০০
০৪	রাজপুঁটি	৫-৬	২৫
০৫	সিলভারকার্প	৮-১০	৫
		মোট	৬৮০

পুকুরে পোনা মজুদকালীন সময় খুব সতর্কতার সাথে করতে হয়। পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় অবশ্যই পোনা ভর্তি পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমতায় এনে ভালভাবে অভ্যস্তকরণ বা কন্ডিশনিং করতে হবে। সাধারণত কম তাপমাত্রায় সকালে বা সন্ধ্যায় পোনা মজুদ করাই উত্তম।

সম্পূরক খাদ্য (Supplemertany feed)

- পোনা ছাড়ার পরের দিন থেকে প্রাণিজ আমিষ (৩০%) সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য মাছের দেহ ওজনের শতকরা ১৫-৫% হারে (নিম্নের সারণি) প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, মুখ্য প্রজাতি হিসেবে শুধুমাত্র শিং মাছের জন্যই সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের জন্য বিবেচনা করতে হবে
- সম্পূরক খাদ্য দুই ভাগ করে সন্ধ্যায় ও সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।

সারণি : শিং মাছের দৈহিক ওজন, খাদ্য প্রয়োগের হার ও দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (প্রতি শতাংশে)

মাস	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)	প্রতি দিনের খাদ্য (গ্রাম)
১ম ২ সপ্তাহ	২	১৫	১২০
২য় ২ সপ্তাহ	৪	১৫	২৪০
৩য় ২ সপ্তাহ	৭	১২	৩৩৬
৪র্থ ২ সপ্তাহ	১১	১০	৪৪০
৫ম ২ সপ্তাহ	১৫	৮	৪৮০
৬ষ্ঠ ২ সপ্তাহ	১৮	৭	৫০৪
৭ম ২ সপ্তাহ	২২	৬	৫২৮
৮ম ২ সপ্তাহ	২৬	৫.৫	৫৭২
৯ম ২ সপ্তাহ	৩১	৫	৬২০
১০ম ২ সপ্তাহ	৩৪	৫	৬৮০
১১তম ২ সপ্তাহ	৩৭	৫	৭৪০
১২তম ২ সপ্তাহ	৪০	৫	৮০০

পানির গুণাগুণ (Water Quality)

শিং মাছ চাষের জন্য পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য নিয়মিতভাবে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা আবশ্যক। ভাল উৎপাদন পেতে হলে পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় রাখার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

- নিয়মিতভাবে পুকুরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়;
- পানির গভীরতা ৩-৪ ফুটের মধ্যে রাখতে হয়;
- পানির তাপমাত্রা ২৪-৩০° সেলসিয়াস এর মধ্যে রাখতে হয়;
- পানির pH সবসময় ৭.০ এর ওপরে রাখা আবশ্যক; এবং
- পানির স্বচ্ছতা ৩০ সেমি এর ওপরে থাকতে হয়।

মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা (Post Stocking Management)

- প্রতি ১৫ দিন পরপর শিং মাছের নমুনায়ন করে সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়;
- পোনা মজুদের এক মাস পর হতে প্রতি ১৫ দিন অন্তর শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম চুন ও পরবর্তী ১৫ দিন পর ২০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করতে হয়;
- প্রতি সপ্তাহে ২দিন হররা টানার ব্যবস্থা নিতে হয়;
- সপ্তাহে কমপক্ষে ০২ দিন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়;
- পুকুরের আয়তন অনুসারে এক বা একাধিক স্থানে কচুরিপানার বেষ্টনী স্থাপন করতে হয়, পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এই বেষ্টনীর নিচে মাছ আশ্রয় নিতে পারে; এবং

- শিং মাছের পুকুরে জাল দিয়ে বেষ্টনী দিতে হয়। কারণ বর্ষায় যাতে মাছ বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য বেষ্টনী দিলে ঝুঁকি কম থাকে।

মাছ আহরণ ও উৎপাদন (Production & Harvesting of fish)

- পোনা মজুদের ছয় মাস পর মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রথমে বেড় জাল দিয়ে মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া, রাজপুঁটি ও সিলভার কার্প আহরণ করতে হয়। অতঃপর পুকুর শুকিয়ে শিং ও মাগুর মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হয়।
- এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে পঞ্চাশ শতাংশ পুকুর হতে ছয় মাসে শিং ১৫০০ কেজি, মাগুর ৩৫০ কেজি, মনোসেক্স গিফট তেলাপিয়া ৮০০ কেজি, রাজপুঁটি ১৫০ কেজি এবং সিলভার কার্প ২০০ কেজি উৎপাদন পাওয়া যায়।
- এ পদ্ধতিতে ছয় মাসে শিং মাছের মিশ্র চাষে ৫০ শতাংশ পুকুরে ৩.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এক ফসলে ৩.৬২ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

চিত্র: মিশ্র চাষে আহরণকৃত শিং মাছ

চিত্র: মিশ্র চাষে আহরণকৃত মাগুর মাছ

চিত্র: মিশ্র চাষে আহরণকৃত তেলাপিয়া মাছ

সারণি: শিং মাছের মিশ্র চাষে এক ফসলে (৬ মাস) আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (৫০ শতাংশ)

ব্যয়ের খাত	পরিমাণ/ সংখ্যা	টাকা
• পুকুর লীজ মূল্য	থোক	১০,০০০.০০
• পুকুর সংস্কার ও প্রস্তুতি	থোক	৫,০০০.০০
• পোনা	৩৪,০০০টি	৭২,০০০.০০
• মাছের খাদ্য	৪,৫০০ কেজি	২,০২,৫০০.০০
• অন্যান্য (শ্রমিক, পানি, চুন, লবণ, মাছ আহরণ, পরিবহন ইত্যাদি)	থোক	২২,৫০০.০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	-	৩,১৮,০০০.০০
• মোট বিক্রয় (শিং-১৫০০ কেজি; মাগুর-৩৫০ কেজি; মনোসেক্স গিফট-৮০০ কেজি; রাজপুঁটি-১৫০ কেজি ও সিলভার কার্প-২০০ কেজি)	৩০০০ কেজি	৬,৮০,০০০.০০
• প্রকৃত মুনাফা	-	৩,৬২,০০০.০০

সুপারিশমালা (Recommendations)

সফলভাবে শিং মাছের মিশ্র চাষ করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:

- নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়;
- সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না;
- অতিরিক্ত গরমে খুব সকালে পানি প্রবেশ করাতে হয়;
- জাল টেনে মাছের নমুনায়ন না করাই উত্তম;
- উন্নতমানের ৩০-৩২% প্রোটিন সমৃদ্ধ সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হয়;
- নিয়মিত পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করতে হয়; এবং পানির পিএইচ সবসময় ক্ষারীয় মাত্রায় রাখতে হয়।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপনা কৌশল
A Multifaceted Hilsa Management Strategy for Conservation and Development

ড. এ কে এম আমিনুল হক

Abstract

Hilsa (*Tenualosa ilisha*), the national fish of Bangladesh, caters high demand in local and international market as food fish for excellent taste, shape and smell. It contributes 1% to GDP and 12% to openwater harvest in Bangladesh and 60% to global hilsa catch. During 2012-13 a total of 0.35 million tons of hilsa was harvested in the country which valued Taka 250 billion. Around one million fishers, investors and labourers are involved in the harvest, transport, processing and marketing of the fish in the country. Environmental degradation, pollution, climate change, shrinkage of waterbodies together with overfishing has led this economic important species in a grave uncertainty. It is time to reorient harvest-oriented hilsa management to some culture-oriented management. It also emphasizes hilsa fishers' rehabilitation for better management of the fishery. Multifaceted local and regional inter-state management strategies to ensure responsible management for sustainable harvest is needed.

ইলিশ (*Tenualosa ilisha*) বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। সুস্বাদু, দৃষ্টিনন্দন ও বিশেষ ঘ্রাণযুক্ত এ মাছের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভালো চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে মাছটির অবদান ১%। এটি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জলাশয় হতে আহরিত মাছের ১২% ও সারা বিশ্বে আহরিত ইলিশের ৬০%। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এদেশে ৩ লক্ষ ৫১ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয় যার বাজার মূল্য ২৫ হাজার কোটি টাকা। এদেশের দশ লক্ষাধিক জেলে, মহাজন ও শ্রমিক ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত। সর্বে ইলিশ মাছ ভোজনবিলাসী বাঙালির প্রিয় ব্যঞ্জন। জামাইষষ্ঠি ও পূজা-পার্বণে ইলিশ উভয় বাংলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। নববর্ষে পান্তা-ইলিশ এখন বাঙালি সংস্কৃতির নব্য অনুষঙ্গ। তবে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জলাশয় সংকোচন ও অতিআহরণে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ এ মাছের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বহুমাত্রিক দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল।

প্রেক্ষিত (Perspective Overview)

ইলিশ একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলজ সম্পদ। এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মোহনা ও উপকূলীয় নদ-নদী এবং সন্নিহিত পারস্য উপসাগর, বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলসীমায় বিচরণ করে। দৈহিক পরিপূর্ণতা ও যৌন পরিপক্বতা লাভের জন্য জীবনচক্রের একটি নির্দিষ্ট অংশে আবশ্যিকভাবে সাগরের লোনা পানিতে বাস করে। আবার প্রজনন মৌসুমে ও পোনা অবস্থায় এতদঞ্চলের নদ-নদী ও খাল-বিলের স্বাদু পানিতে বাস করে। মাছটির বিচরণ কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় জলসীমায় সীমাবদ্ধ নয় এবং এর জীবনচক্র স্বাদু পানি ও সামুদ্রিক উভয় পরিবেশে বিস্তৃত। সুতরাং মাছটির স্থায়িত্বশীল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমন্বিত ও সমান্তরাল দায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা। বর্তমানে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সরকারিভাবে ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত জাটকা (২৫ সেমি নিচের রাচ্চা ইলিশ) সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম, ইলিশের প্রজনন ও বিচরণস্থলে ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন, জাল ও জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি অতিপ্রথা প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও নীতিকৌশল অনুসরণের সাফল্যলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও "রেকা ইলিশ" (জাটকা) সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি নিশ্চয়ই আশার কথা। যেহেতু মাছটির বিচরণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক জলসীমায় বিস্তৃত সেহেতু আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নীতিকৌশল প্রণয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলসীমায় বিস্তৃত কোন একক প্রজাতি বা গুচ্ছ প্রজাতির মৎস্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, ১৯৯৫) অনুসরণ করে ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ও দায়িত্বশীল আহরণের জন্য আমরা নীচের চিন্তাসূত্রে অগ্রসর হতে পারি:

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নীতিকৌশল (In-country Management Strategy)

জাটকা লালন ও অবমুক্তি (Jatka Nursing and Release) ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রাকৃতিক জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় জাটকা ইলিশ লালন ও অবমুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উপকূলীয় জলাশয়সমূহে যি বছর প্রচুর জাটকা উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলো বড় ইলিশে পরিণত হওয়ার জন্য শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনেই এদের সমুদ্রিক অভিপ্রয়াণ প্রয়োজন। কিন্তু পরিণত ও আহরণযোগ্য ইলিশ জনতায় প্রবেশের পূর্বেই এগুলো বিভিন্নভাবে আহরিত হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমিত মতে, বর্তমানে শতকরা মাত্র ১-২ ভাগ জাটকা সামুদ্রিক অভিপ্রয়াণের মাধ্যমে মজুদায়ন বা

পরিণত ইলিশ জলতায় প্রবেশের সুযোগ পায়। বাকি অংশ জটিক অবস্থায়ই বিভিন্ন অবৈধ পদ্ধতিতে মৃত বা জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশের অভাবে বা প্রতিকূল প্রতিবেশে মারা যায়। এগুলো সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন, জেলেদের পুনর্বাসন ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মক্রমের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে কিছু নির্বাচিত উপকূলীয় বাঁওড়, ঘাঁড়ি ও শাখা নদীসমূহে প্রাকৃতিক পরিবেশেই জটিকা লালন করে নির্দিষ্ট সময়ে নিরাপদ সামুদ্রিক অভিগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপকূলীয় প্রাকৃতিক জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত ইলিশ চাষ (Controlled Hilsa Aquaculture in Coastal Waters)

ইলিশ যেমনও শতভাগ আহরণ-নির্ভর। অপরদিকে ইলিশের আহরণ মৌসুম ও প্রকৃতি-নির্ভর। এজন্য বাজার চাহিদানুযায়ী ইলিশের সরবরাহ সম্ভব হয় না। উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের স্বাদুপানির বাঁওড় ও নদ-নদীগুলোতে জোয়ার-ভাটার প্রভাবে প্রায় সারা বছরই সাগরের লোনা পানির মিশ্রণ হয়। ফলে এ সব প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহে নিয়ন্ত্রিত ইলিশ চাষ সম্ভব। উপকূলীয় বাঁওড়গুলোতে জোয়ারের পানিতে আসা জটিকা আটকা পড়ে প্রায়শই বড় ইলিশে রূপান্তর হয় যা জেলেদের জালে ধরা পড়ে। সুতরাং জোয়ারের পানিতে আসা জটিকা পোনা আটকে রেখে অথবা মজুদ করে জোয়ার ভাটার পানি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য ও জলাশয়ের বিদ্যমান খাদ্য শিকল ব্যবহার করেই উপকূলীয় প্রাকৃতিক জলাশয়ে বিদ্যমান স্লুইস গেট নিয়ন্ত্রিত ইলিশ চাষ প্রয়োজন। শতভাগ প্রকৃতি-নির্ভর ইলিশ উৎপাদন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা আজ বড় বাস্তবতা ও প্রয়োজনের নিরিখেই চাষ ও প্রযুক্তি-নির্ভর করা দরকার। জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত প্রতিকূলতা, দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিকূল কূটনীতি তথা আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখে বিষয়টি আরও বেশি বিবেচনার দাবি রাখে। এভাবে ইলিশ আহরণ-নির্ভর জেলেদেরকে ইলিশ-উৎপাদনমুখী করা গেলে অর্থ-সামাজিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বেকারত্ব ও উৎপাদন হ্রাসের বিপরীতে জেলেদের পুনর্বাসন ও আয়-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন (Establishment of Hilsa Sanctuaries)

ইলিশ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বর্তমানে ৫টি মোহিত অভয়াশ্রম রয়েছে। ইতোমধ্যে এগুলো ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধাজনক স্থানে আরও ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

ইলিশ জেলে পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান (Hilsa Fishers' Rehabilitation and Alternative Livelihoods)

মুক্ত জলাশয়ে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সবচেয়ে বড় বাধা অতিআহরণ (growth overfishing) ও অপরিণত জটিকা আহরণ (undergrowth fishing)। এটি করে থাকে বংশানুক্রমিক দরিদ্র, অসহায় ও অশিক্ষিত ক্রমবর্ধিষ্ণু ইলিশ-নির্ভর উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়। এদের জীবন-জীবিকা প্রায় সম্পূর্ণত এসব প্রাকৃতিক জলাশয়ের মৎস্য আহরণ ও বিপণন-নির্ভর। প্রাকৃতিক জলাশয় ও জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা কমছে অথচ মৎস্য আহরণ চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত পরিমান ডিমওয়ালা ইলিশ ডিম ছাড়ার ও জটিকা ইলিশ বড় হবার সুযোগ পাচ্ছে না। কেবলমাত্র মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ অতিআহরণ ও অপরিণত আহরণ সমস্যার সমাধান করা দুরূহ। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত ইলিশ জেলে পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান।

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানকল্পে উপকূলীয় খাল-নদী-মোহনায় ভাসমান খাঁচা ও পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে আপৎকালীন জীবিকায়নে মাছ চাষে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এরা নিষিদ্ধ সময়কালীন মা ইলিশ ও জটিক ধরা হতে শুধু বিরতই থাকবে না নিজেরা পাহারাও দিবে। এসব জলাশয়ে তারা অননুমোদিত জাল অথবা অননুমোদিত ফাঁসের জাল দিয়ে নিজেরাও মাছ ধরবে না এবং অন্যকেও ধরতে দিবে না। এতে জটিকাসহ অন্যান্য পোনা বড় হবার সুযোগ পেয়ে মাছের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এসব জলাশয়ে তাদের মাছ আহরণের একক অধিকার থাকবে। এভাবে অংশিদারিত্বমূলক উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility-CSR) ও বাস্তুসংস্থান সেবা (Payments for the Ecosystem-PES) বিবেচনায়ও সরকার ও প্রগ্রেসর সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এটি করতে পারে। জটিক লালন ও অবমুক্তি, নিয়ন্ত্রিত ইলিশ চাষ, খাঁচা ও পেনে মাছ চাষ প্রভৃতি উৎপাদনমুখী কর্মক্রমে নিয়োজিত করা গেলে একদিকে জেলেদের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন হবে। অন্যদিকে উন্মুক্ত জলাশয়ের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

নদীর প্রবাহ ও পরিবেশ সংরক্ষণ (Maintenance of River Flow & Environment)

উপকূলীয় নদ-নদীসমূহ ইলিশের প্রজননস্থল, জটিকার চারণভূমি ও ইলিশের অন্যতম আহরণস্থল। উজানে বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পলি জমে নদীর গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে, নদীর প্রবাহ শুকিয়ে যাচ্ছে ও স্থানে স্থানে বিশাল চর জেগে উঠায় ইলিশের প্রজননস্থল ও জটিকার চারণভূমি সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলে ইলিশের প্রজনন ও জটিকার বৃদ্ধি বা তথা সার্বিক ইলিশ উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক হিসাব মতে প্রতি বছর কৃষিজমিতে ব্যবহৃত অন্যূন ২,৫০০-৩,০০০ মেট্রন ক্ষতিকর কীটনাশক এসব নদীতে গিয়ে জমছে। উজানের দেশসমূহ থেকে আসা বর্জ্যসহ এ

দেশের অভ্যন্তরের কয়েক হাজার কলকারখানা ও জাহাজের বর্জ্যও এসব নদী ও উপকূলীয় মোহনায় মেশার কারণে ইলিশের জলজ পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রিত ইলিশ আহরণ (Controlled Hilsa Harvest)

ইলিশ একটি মজুদ নবায়নযোগ্য জৈবিক সম্পদ। মূল জনতায় নতুন প্রজন্মের প্রবেশন সাপেক্ষে পুরোনো প্রজন্মের অংশবিশেষ আহরণযোগ্য। টেকসইভাবে নিয়মিত ইলিশ আহরণ নিশ্চিত করতে মজুদ যাচাই ও আহরণযোগ্য ইলিশের পরিমাণ নিরূপন করতে হবে। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক জেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতার যান ও জাল ব্যবহার করে নির্ধারিত আকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ ইলিশ আহরণের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য নৌযান ও জেলে নিবন্ধন, অবৈধ আহরণ রোধ (IU fishing) এবং দায়িত্বশীল ও নিয়ন্ত্রিত ইলিশ আহরণ নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ জরুরি।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন (Implementation of Fish Act)

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা (Protection of Gravid Hilsa Parents)

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রধান প্রজনন মৌসুমে আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার আগে-পিছে ১১ দিন দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও মজুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নেতি, কোস্ট গার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, আড়তদার, জেলে, ক্রেতা ও সাধারণ নাগরিক সকলেই এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকে। ইতোমধ্যে এই কার্যক্রমের সুফল দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে। এ কার্যক্রম ধরে রাখতে হবে।

সাংবাৎসরিক জাটকা সংরক্ষণ (Year Round Jatka Protection)

বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনে কেবলমাত্র ১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ, পরিবহন, বিপণন ও মজুদ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইলিশ সারা বছর প্রজনন করে। ফলে সারা বছর কমবেশি জাটকা ধরা পড়ে। তাই জাটকা সংরক্ষণে এ নিষেধাজ্ঞা সারা বছর বহাল রাখা প্রয়োজন।

জালের প্রকার ও ফাঁস নিয়ন্ত্রণ (Gear and Mesh Regulations)

ইলিশ ও অন্যান্য প্রজাতির মাছের জন্য ক্ষতিকর চর গড়া জাল, বেহুন্দি জাল, কারেন্ট জাল, মশারি জাল ও পাই জাল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। এসব জালে নির্বাচিত প্রজাতির নির্বাচিত মাপের মাছ নির্দিষ্টকৃত করা যায় না বরং প্রজাতি নির্বিশেষে ঢালাওভাবে অনির্বাচিত প্রজাতির মাছও ধরা পড়ে নষ্ট হয় যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল উৎপাদনের অন্তরায়। অনুমোদিত জালের ফাঁসও নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

নির্দিষ্টকৃত ম্যাজিস্ট্রেট (মৎস্য আইন) ও ফোর্স নিয়োগ এবং জনবল বৃদ্ধি (Appointment of Earmarked Magistrate (Fish Act) and Police Force and Enhancement of Fisheries Manpower)

বিচারক ও পুলিশ ফোর্স এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সীমিত জনবল মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। প্রয়োজনীয় জনবল, যান, জ্বালানি ও বিচারক মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন তথা ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। ইলিশ-প্রধান সঙ্কট এলাকায় (troubled zone) মৎস্য আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্টকৃত ম্যাজিস্ট্রেট (মৎস্য আইন) ও পুলিশ ফোর্স নিয়োগ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জনসচেতনতা সৃষ্টি (Public Awareness Campaign)

জনসচেতনতা ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। বিশাল ও বিস্তৃত নদী ও মোহনা জুড়ে ইলিশ ও জাটকার বিস্তৃতি। কয়েক লক্ষ জেলে দিবারাত্রি ইলিশ ধরার কাজে লিপ্ত থাকে। জেলেদের আত্মোপলব্ধি ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা-ভোক্তা তথা সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে মৎস্য আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্য ব্যাপক প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

ধারাবাহিক ইলিশ গবেষণা (Continuous Hilsa Research)

ইলিশের প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ (Identification of Hilsa Spawning Grounds)

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৪টি চিহ্নিত ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রের বাইরে আরও সম্ভাব্য প্রজনন ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। চিহ্নিত ইলিশ প্রজননক্ষেত্রগুলো সর্বপ্রকার দূষণমুক্ত রাখা ও প্রজননের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ইলিশের প্রণোদিত প্রজনন (Induced Spawning of Hilsa)

এখন পর্যন্ত দেশে ইলিশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রজনন হলেও অচিরেই জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাবে ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এজন্য এখন হতেই অন্যান্য মাছের ন্যায় ইলিশেরও প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

নরওয়ে-মডেল খাঁচা ও পেনে নিয়ন্ত্রিত ইলিশ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Controlled Hilsa Production in Norway-Model Cage and Pens)

বহির্বিশ্বে ইলিশের অনুরূপ সামন মাছ নদী ও সমুদ্রে বিশালাকার খাঁচা ও পেনে চাষ করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলেও নরওয়ে মডেল খাঁচা ও খালে পেন ও বাঁওড়সমূহে প্রাকৃতিক (সম্পূরক খাদ্য ব্যতিরেকে) নিয়ন্ত্রিত ইলিশ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রিত ইলিশ চাষে (সম্পূরক খাদ্য সহযোগে) গবেষণা করা প্রয়োজন।

পুকুর-দীঘিতে ইলিশ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন (Innovation of Hilsa Aquaculture Technologies in Ponds)

ইলিশের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় স্বাদু ও লোনা পানির পুকুর-দীঘিতে ইলিশ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। দক্ষিণাঞ্চলের পাথরঘাটা, তালতলী ও আমতলীর উপকূলীয় বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশেই কিছু ইলিশ উৎপাদিত হয়। এ সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইলিশ উৎপাদনের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন

আন্তর্জাতিক ইলিশ ব্যবস্থাপনা নীতিকৌশল (International Hilsa Management Strategies)

অভিন্ন মৎস্য (ইলিশ) সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (Promulgation of uniform Fish Act and Implementation)

অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ইলিশ উৎপাদনকারী দেশসমূহে অভিন্ন মৎস্য (ইলিশ) সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা (Protection of Gravid Hilsa Parents in Peak Spawning Season)

ইলিশ আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলসীমায় বিচরণশীল হলেও কেবলমাত্র বাংলাদেশ জলসীমায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জলসীমায় বিশেষত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মায়ানমারেও এ সময়ে অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

জাটকা রক্ষা (Jatka Protection)

বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনে ১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত ২৫ সেমি পর্যন্ত জাটকা ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহন ও মজুদ নিষিদ্ধ রয়েছে। জাটকা ইলিশ বিচরণ করে পার্শ্ববর্তী এমন দেশসমূহেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকা প্রয়োজন।

ইলিশ অভয়াশ্রম (Establishment of Hilsa Sanctuaries)

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহেরও ইলিশ বিচরণ এলাকায় বাংলাদেশের আদলে ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

ইলিশ উৎপাদনকারী সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন নদ-নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক রাখায় সহযোগিতা (Cooperation among Hilsa Producing Countries in Maintaining River Flows in Common River Systems)

ইলিশ উৎপাদনকারী সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন নদ-নদীর ভাটির প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারে ইলিশের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থেই এটি প্রয়োজন। ইলিশ যেমন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পদ (CSR) তেমনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সাধারণ জনআকাঙ্ক্ষিত সর্বজনীন সম্পদ (common interest resource)

উজানের স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হলে প্রধান ইলিশ উৎপাদনকারী ভাটি রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ ব্যাহত হবে। সুতরাং অভিন্ন ও সার্বজনীন স্বার্থ বিবেচনায় অভিন্ন নদীর পানির প্রবাহ বজায় রাখায় পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

ইলিশ উৎপাদনকারী সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের ইলিশ সংক্রান্ত অভিন্ন গবেষণা পরিচালনা (Launching Common Hilsa Research in Affiliated Hilsa-producing Countries)

ইলিশের বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ইলিশ উৎপাদনকারী সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের ইলিশ সংক্রান্ত অভিন্ন গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান ও স্টাডি গ্রুপ গঠন করা প্রয়োজন।

উপসংহার (Conclusion)

ইলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছটির সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। ইলিশের প্রজনন ও বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল উৎপাদনের জন্য চলমান ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ আরও গতিশীল করা প্রয়োজন। জেলেদের টেকসই পুনর্বাসন ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদনের পূর্বশর্ত। চলমান ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন আপাত ইতিবাচক প্রতিয়মান হলেও স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ও দূর ভবিষ্যতের জন্য এটি এখনও অপর্যাপ্ত। বর্তমান ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপন মূলত উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন নির্ভর। নদীর উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীর গতিপথ ও সাগরের সাথে সংযোগ রক্ষা, পানির পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করা, প্রজনন মৌসুমে নদী অভিমুখী অভিপ্রয়াণের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা,প্রজননোত্তর মাছের সাগরে প্রত্যাগমন নিশ্চিত করা এবং জাটকা ইলিশের সাগর গমন নিরংকুশ করা প্রয়োজন। এসবই বহুমাত্রিক ও বহুপাক্ষিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাসাপেক্ষ। একটি সার্বিক প্রশাসনিক, জীবপ্রতিবেশিত ও অর্থসামাজিক সমন্বিত অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপনা নীতিকৌশল প্রণয়ন মাছটির ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। এজন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত ও অভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে এসপিএফ চিংড়ি প্রবর্তন ঃ সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

Introduction of SPF Shrimp in Bangladesh : New Arena of Possibilities

অমিতোষ সেন[১] ও ড. মোঃ গোলজার হোসেন[২]

Abstract

The shrimp industry worldwide has been encountering enormous problems due to the spread of disease and incurring significant economic losses. The response to these outbreaks has focused on efforts to develop disease resistance. Researchers from the US Marine shrimp Farming Program (USMSFP) have developed novel approaches to mitigate the devastating impact of shrimp viruses including the use of specific pathogen free (SPF) and specific pathogen resistant (SPR) shrimp, as well as the establishment of biosecure production systems that rely on pathogen exclusion. Though SPF animals are assured to be free from specific pathogens does not guarantee against the animal being infected with unknown pathogens or known pathogens which are not screened against. In response to changing disease problems faced by US Shrimp farmers this technology has found tremendous effective to control the problem of diseases. Currently Bangladesh has severely facing the viral disease problems, so the introduction of SPF technologies can greatly help to mitigate the problems. In view of the above, the introduction of Specific Pathogen Free (SPF) shrimp may be a good approach for virus free PL production, for virus free grow-out management, practiced in almost all shrimp seed producing countries in the world. Domesticated shrimps in intensive bio-security for at least 4-5 generations in absence of Organisation of International Epederm c (OIE) listed specific pathogens are used in hatcheries for virus free PL production. Though some specialized infrastructures, facilities, skilled personnel & strict protocols are of prime requirements for the introduction of SPF shrimp, the attempt should be considered with topmost priority.

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাগদা চিংড়ি সম্পদকে ভাইরাসের ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে বিগত দুই দশক ধরে হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনের কাজে এসপিএফ (Specific Pathogen Free- SPF) চিংড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। খামারে মজুদকৃত পিএল ভাইরাসের অন্যতম বাহক। চিংড়ির শরীরে ভাইরাস থাকলে তা ডিম ও লার্ভার মাধ্যমে পিএল-এর শরীরে প্রবেশ করে। তাই ভাইরাসমুক্ত খামার ব্যবস্থাপনার জন্য চাই ভাইরাসমুক্ত পিএল। আর এজন্য প্রয়োজন ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি। প্রাকৃতিক উৎস থেকে লিসিআর'এ পর্যবেক্ষণকৃত ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি ব্যবহার করে হ্যাচারিতে ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদন করা বিধিসম্মত। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে সবসময় সমানভাবে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায় না। তাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে 'নিবিড় পরিচর্যায় ভাইরাস ও অন্যান্য ক্ষতিকর রোগজীবাণুমুক্ত পরিবেশে কয়েক প্রজন্মব্যাপী জীবাণুমুক্ত

ছবি: wssv আক্রান্ত বাগদা চিংড়ি

ছবি: yhv আক্রান্ত বাগদা চিংড়ি

হিসেবে প্রতিপালিত (domesticated) চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্যবহার করে পিএল উৎপাদন' এর ধারণার উদ্ভব ঘটে। এ ধরনের চিংড়িকে এসপিএফ (SPF- Specific Pathogen Free) চিংড়ি বলা হয়। অর্থাৎ এসপিএফ বাগদা চিংড়ি বলতে এমন চিংড়িকে বুঝানো হয়, যার শরীরে কয়েক প্রজন্মব্যাপী বিশেষ বা নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত রোগজীবাণু সংক্রমণের ইতিহাস নেই। তবে 'জীবাণুমুক্ত' অবস্থা এসপিএফ চিংড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এর পাশাপাশি প্রতিপালিত এসপিএফ চিংড়ি থেকে উন্নতমানের পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিম, লার্ভা ও দ্রুত বর্ধনশীল পিএল পেতে হবে এবং এসব পিএল থেকে উন্নত প্রজনন গুণাবলি, রোগজীবাণু প্রতিরোধের উচ্চতর ক্ষমতা, উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত খাদ্যমান সম্পন্ন চিংড়ি পেতে হবে।

এসপিএফ চিংড়ির সুবিধা (Advantages of SPF Brood Shrimp)

এসপিএফ চিংড়ি থেকে হ্যাচারির জীবাণুমুক্ত পরিবেশে

উৎপাদিত পিএল দিয়ে খামারে চিংড়ি চাষ করা হলে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যেতে পারে -

- সারাবছর হ্যাচারির প্রয়োজনমত উন্নত মানের এবং রোগজীবাণুমুক্ত চিংড়ির চাহিদা মিটানো সম্ভব;
- চিংড়িকে জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধ ও রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না;
- এসপিএফ চিংড়িকে হ্যাচারির পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো সহজ, ফলে পীড়ন কমে যায়, যৌনমিলনের প্রবণতা ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনে বেশি সফলতা আসে;
- এসপিএফ চিংড়ি থেকে উৎপাদিত পিএল খামারে মজুদ করে নিশ্চিতভাবে উচ্চতর বর্ধনশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেঁচে থাকার উচ্চ হার, ভাল এফসিআর, অধিক উৎপাদন ও উচ্চফলনশীল চিংড়ির জাত নির্বাচন করা সহজ হয়;
- চিংড়ির উৎসস্থল, অতীত সফলতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে ট্রেসিবিলিটি সহজ হয়; এবং
- চিংড়ি বা পিএল এর মাধ্যমে হ্যাচারি বা চাষের পরিবেশে তালিকাভুক্ত রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

নির্ধারিত বা তালিকাভুক্ত রোগজীবাণু (Specific Pathogen)

মহামারী রোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দপ্তর (OIE) ২০০৮ সালে এসপিএফ ঘোষিত চিংড়ির শরীর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পরিহারযোগ্য রোগজীবাণুর একটি তালিকা প্রকাশ করে। তালিকাভুক্ত সব কয়টি রোগজীবাণু বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের যেকোনো পর্যায়ে আকস্মিকভাবে চরম ক্ষতি করতে সক্ষম। তালিকাটি নিম্নরূপ -

সারণি: বাগদা চিংড়ির জন্য স্পেসিফিক রোগজীবাণুর তালিকা

প্যাথোজেনের ধরন	প্যাথোজেন/প্যাথোজেন গ্রুপ	প্যাথোজেন ক্যাটাগরি[1]
Viruses	WSSV - nimavirus (new family)	C-1
	YHV, GAV, LOV - roniviruses (new family)	C-1
	TSV - picornavirus	C-1
	BP - occluded enteric baculovirus	C-2
	MBV - occluded enteric baculovirus	C-2
	BMN - nonoccluded enteric baculovirus	C-2
	IHHNV - systemic parvovirus	C-2
	HPV - enteric parvovirus	C-2
Procaryote	NHP - proteobacteria	C-2
Protozoa	Microsporidians	C-2
	Haplosporidians	C-2
	Gregarines	C-3

1. Pathogen category (Lotz et al. 1995) C-1 pathogens defined as excludable pathogens cause catastrophic losses; C-2 pathogens are serious, potentially excludable; C-3 pathogens have minimal effects.

এসপিএফ চিংড়ি উপরে উল্লিখিত প্রতিটি জীবাণু থেকে মুক্ত হতে হবে। কয়েক প্রজন্মব্যাপী প্রতিপালনকালে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে হ্যাচারি এবং গ্রো-আউটে এসব জীবাণুর অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

অর্থাৎ এসপিএফ চিংড়ি পূর্ববর্তী ২ বা ৩ বছর যাবৎ তালিকাভুক্ত সকল জীবাণু থেকে মুক্ত থাকার একটি দালিলিক ইতিহাস বহন করে। এসব জীবাণু শনাক্ত করার জন্য পিসিআর, এলাইজা, কলোনি-কাউন্ট, সাধারণ মাইক্রোস্কোপি ইত্যাদি সাশ্রয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এসপিএফ চিংড়ি উপরে উল্লিখিত প্রতিটি জীবাণু থেকে মুক্ত হতে হবে। কয়েক প্রজন্মব্যাপী প্রতিপালনকালে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে হ্যাচারি ও গ্রো-আউটে এসব জীবাণুর অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

ছবি : এসপিএফ বাগদা চিংড়ি

অর্থাৎ এসপিএফ চিংড়ি পূর্ববর্তী ২ বা ৩ বছর যাবৎ তালিকাভুক্ত সকল জীবাণু থেকে মুক্ত থাকার একটি দালিলিক ইতিহাস বহন করে। এসব জীবাণু শনাক্ত করার জন্য পিসিআর, এলাইজা, কলোনি-কাউন্ট, সাধারণ মাইক্রোস্কোপি ইত্যাদি সাশ্রয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এসপিএফ চিংড়ি উন্নয়নের পদ্ধতি (Domestication Protocol of SPF Brood Shrimp)

এসপিএফ চিংড়ি উন্নয়নের কার্যক্রম অত্যন্ত জটিল, শ্রমসাধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি। কারণ চিংড়ির এসপিএফ গুণাবলি বংশপরম্পরায় স্থানান্তরযোগ্য নয়। বরং প্রতিপালনের পরিবেশের জীবনিরাপত্তার উপরে নির্ভরশীল। এসপিএফ চিংড়ি প্রতিপালনে পরিবেশ এবং জীব-নিরাপত্তা একে অপরের পরিপূরক। এ কাজে মুহূর্তের অসাবধানতায় কয়েক বছরের পরিশ্রমে অর্জিত সফলতা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো এমন স্থানে নির্মাণ করা হয়, যেখানে বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। নিম্নে এসপিএফ বাগদা চিংড়ি উন্নয়নের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১ম পদক্ষেপ: ভিত্তি-প্রজন্মের চিংড়ি বাছাই (1st Step: Selection of Founder Generation Brood Shrimp)

এসপিএফ চিংড়ি উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রথমে প্রাকৃতিক উৎস থেকে রোগজীবাণুমুক্ত চিংড়ি বাছাই করা হয়।

বিভিন্ন স্থান থেকে অন্তত ৩ বা ৪টি ভিন্ন ভিন্ন মজুদের চিংড়ি বাছাই করা হয়। এতে 'ইনব্রিডিং'-এর সম্ভাবনা থাকে না। প্রজনন-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রতিটি মজুদ থেকে ১০ বা ১২টি গ্রহণ করা হয়। এসব চিংড়িকে F_0 বা ভিত্তি-প্রজন্ম (founder generation) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২য় পদক্ষেপ: প্রাথমিক কোয়ারেন্টাইন ইউনিটে স্থানান্তর (2nd Step: Transfer in Primary Quarantine Unit)

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত F_0 প্রজন্মের চিংড়ির শরীরে তালিকাভুক্ত রোগজীবাণুর উপস্থিতি শনাক্ত করার জন্য এখানে প্রতিটি চিংড়িকে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ ইউনিটে কোয়ারেন্টাইন ও রোগজীবাণু স্ক্রিনিং এর জন্য বিশেষায়িত ব্যবস্থাসহ সমন্বিতভাবে চিংড়ি প্রতিপালনের সুবিধা থাকে। পর্যবেক্ষণে কোনো চিংড়ির শরীরে তালিকাভুক্ত রোগজীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেলে সাথে সাথে সে চিংড়ি বাতিল করা হয়। আনুমানিক ৩০ দিন ধরে চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে উত্তীর্ণ F_0 প্রজন্মের চিংড়িগুলো F_1 প্রজন্মের জন্য এ ইউনিট থেকে পরবর্তী ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।

৩য় পদক্ষেপ : মাধ্যমিক কোয়ারেন্টাইন ইউনিটে স্থানান্তর (3rd Step: Transfer in Secondary Quarantine Unit)

এ ইউনিটে নিশ্ছিদ্র জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় F_0 প্রজন্মের

চিত্র: স্বাস্থ্যবান বাগদা চিংড়ি পিএল

বেশ কয়েকটি গ্রুপের চিংড়ির পৃথক ম্যাচুরেশান, লার্ভাই, স্পনিং, লার্ভা ও পিএল প্রতিপালন, নার্সিং এবং গ্রো-আউট সুবিধাসহ তালিকাভুক্ত সকল রোগজীবাণু পর্যবেক্ষণের জন্য সাধারণ ও বিশেষায়িত সব ধরনের সুবিধা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ির মধ্যে মিলন নিশ্চিত করার জন্য এখানে কৃত্রিম শুক্রাধান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ ইউনিটে F_0 প্রজন্মের চিংড়ি থেকে প্রথমে F_1 প্রজন্মের PPL (Parent-PL) উৎপাদন করা হয় এবং এসব পিপিএল থেকে F_1 প্রজন্মের এসপিএফ চিংড়ি উৎপাদন করা হয়। F_1 প্রজন্মের কিশোর (জুভেনাইল) চিংড়ি পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত গড়ে ১২০ দিন যাবৎ তাদেরকে প্রতিপালন করা হয়। এখানে ৩০-৪০ দিনের ব্যবধানে এদের শরীরে এবং পরিবেশে তালিকাভুক্ত রোগজীবাণু পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নির্ধারিত কর্মসূচি থাকে।

চিত্র: স্বাস্থ্যবান বাগদা চিংড়ি পিএল

নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রতিপালনের পরে প্রজননের জন্য এখান থেকে F_1 প্রজন্মের এসপিএফ প্যারেন্ট-স্টক (দ্রুত বর্ধনশীল সম্পন্ন পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি) বাছাই করা হয়। এসব এসপিএফ প্যারেন্ট-স্টক পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিউক্লিয়ার ব্রিডিং সেন্টারে (NBC) প্রেরণ করা হয়।

৪র্থ পদক্ষেপ : নিউক্লিয়ার ব্রিডিং সেন্টারে স্থানান্তর (4th Step : Transfer in Nuclear Breeding Centre)

মাধ্যমিক কোয়ারেন্টাইন থেকে F_1 প্রজন্মের এসপিএফ প্যারেন্ট-স্টকের স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ির সিলেকটিভ ব্রিডিং এর মূল কার্যক্রম এখানে পরিচালিত হয়। এ কেন্দ্রে নিশ্ছিদ্র জীব-নিরাপত্তা প্রটোকল পালন করা হয় এবং সিলেক্টিভ ব্রিডিং এর জন্য কৃত্রিম শুক্রাধান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জেনেটিক ডাইভারসিটি বিশ্লেষণ এবং ইনব্রিডিং এড়ানোর জন্য এখানে কার্যকর জেনেটিক ডিজিটাল ডেটাবেইজ পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও এ কেন্দ্রে চিংড়ির বিভিন্ন 'ফ্যামিলি'র এসপিএফ ডমেস্টিকেটেড জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এনবিসি-তে সকল প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে F_1 প্রজন্মের এসপিএফ প্যারেন্ট-স্টকের চিংড়ি থেকে F_2 প্রজন্মের প্রাইমারি স্টক (PPL) উৎপাদিত হলে তা বিভিন্ন ব্রুডস্টক মাল্টিপ্লিকেশান সেন্টার (BMC)-তে স্থানান্তর করা হয়।

চিত্র: যুক্তরাষ্ট্রের ওশানিক ইন্সটিটিউটের নিউক্লিয়ার ব্রিডিং সেন্টার

৫ম পদক্ষেপ: ব্রুডস্টক মাল্টিপ্লিকেশন সেন্টারে স্থানান্তর
(5th Step: Transfer in Broodstock Multiplication Centre- BMC)

এনবিসি হতে প্রাপ্ত F_1 প্রজন্মের সর্বোৎকৃষ্ট জাতের পিপিএল বিএমসি-তে প্রতিপালন করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে F_2, F_3 ও F_4 প্রজন্মের চিংড়ি উৎপাদনের জন্য একই কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এখানে প্রতিপালিত চিংড়িকে এইচএইচ (HH- High Health) চিংড়ি বলা হয়। এখানে নিবিড় জীব-নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনায় প্রতি প্রজন্মের চিংড়িকে ব্রুডস্টক হিসেবে ১০-১২ মাস পর্যন্ত প্রতিপালন করা হয় এবং প্রতি প্রজন্মের চিংড়ি থেকে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় পিএল উৎপাদনের সুযোগ থাকে। একটি এনবিসি এর আওতায় বেশ কয়েকটি বিএমসি থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটি বিএমসি-তে একাধিক স্টকের বেশ কয়েকটি ফ্যামিলিভুক্ত চিংড়ি প্রতিপালনের সুবিধা থাকে।

৬ষ্ঠ পদক্ষেপ : বাণিজ্যিক হ্যাচারিতে সরবরাহ
(6th Step : Supply to Commercial Hatcheries)

বিএমসি থেকে F_2 বা F_3 প্রজন্মের HH চিংড়ি বাণিজ্যিক হ্যাচারিতে জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় পিএল উৎপাদনের কাজে সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ এখান থেকে HH চিংড়ি বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কমোডিটি উৎপাদন (Commodity Production) প্রবাহে প্রবেশ করে। এসব চিংড়ি থেকে উৎপাদিত তালিকাভুক্ত রোগজীবাণুমুক্ত পিএল খামারে চাষের জন্য মজুদ করা হয়। এ পর্যায়ে চিংড়ি রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কারণ এ চিংড়িগুলো না SPF অথবা HH গুণাবলি সম্পন্ন।

চিত্র: প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত চিংড়ি এসপিএফ চিংড়িতে উন্নয়নের ধাপসমূহ

এসপিএফ চিংড়ির অসুবিধা
(Limitations of SPF Shrimp)

উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন সুবিধার পাশাপাশি এসপিএফ চিংড়ি ব্যবহারে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন -

- এসপিএফ চিংড়ি উৎপাদনে শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত রোগজীবাণু মনিটর করা হয়। তাই তালিকাবহির্ভূত রোগজীবাণুর প্রকৃতিতে প্রবেশ এবং সংক্রমণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
- এসপিএফ গুণাবলি বংশপরম্পরায় অর্জনযোগ্য নয়, বরং প্রতিপালনের পরিবেশ ও হ্যাচারির জীব-নিরাপত্তার উপরে নির্ভরশীল। তাই সামান্য অসতর্কতায় সম্পূর্ণ কার্যক্রমে ব্যাপক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে।
- বাগদা চিংড়ি (*P. monodon*) পরিপক্ব হওয়ার উপযুক্ত আকার অর্জনে অনেক বেশি সময় ক্ষেপণ করে। তাই
- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এদের প্রতিপালন এবং পরিপক্বকরণ অন্যান্য সামুদ্রিক চিংড়ি অপেক্ষা জটিল।
- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অসাবধানতায় ইনব্রিডিং এবং জেনেটিক ডিটেরিওরেশনের সম্ভাবনা থাকে।
- এসপিএফ চিংড়ি রোগজীবাণুমুক্ত বিশেষ পরিবেশে প্রতিপালিত হয় বিধায় এদের স্বাভাবিক-ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে থাকে। তাই এরা বহিরাঙ্গনে জীব-নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ভাল ফলাফল নাও দিতে পারে।
- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভাইরাসের মিউটেশন ঘটলে অজ্ঞাত নতুন জাতের ভাইরাসের উদ্ভব হতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

এসপিএফ চিংড়ি উৎপাদনের কার্যক্রম সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়। বর্তমানে একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতীত চিংড়ি উৎপাদনকারী পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সকল বাগদা চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশে এসপিএফ চিংড়ি উন্নয়নের কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশে এ কাজ শুরু করতে হলে প্রথমে দেশের চিংড়ি সেক্টরে তালিকাভুক্ত রোগজীবাণু সার্ভিল্যান্সের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর আওতায় হ্যাচারি থেকে ভাইরাসমুক্ত (WSSV মুক্ত) পিএল বিপণনের আইন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপি চিংড়ি চাষে ভাইরাসের সংক্রমণ বাংলাদেশেও গভীরভাবে আক্রান্ত। এ শিল্পকে রক্ষা করতে হলে এখনই সুচিন্তিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশীয় চিংড়ির নিরাপদ উৎপাদনে ব্যাপক গবেষণা ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিদেশ হতে এসপিএফ চিংড়ি আমদানি ও উৎপাদনের মাধ্যমে এ শিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। ইতোমধ্যে সরকারি উদ্যোগে এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও প্রটোকল প্রণয়ন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশ হতে এসপিএফ চিংড়ি আমদানির মাধ্যমে পিএল উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও এ মুহূর্তে দেশে এসপিএফ চিংড়ি উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করার উপযোগী অবকাঠামো বা সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তথাপি দেশের চিংড়ি সম্পদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে এসপিএফ চিংড়ি উন্নয়নের প্রযুক্তির নবধারার সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ত হওয়া এখন সময়ের দাবী।

সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

বড়ডাঙ্গা মডেল : উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতির দলগত চিংড়ি চাষ

Barodanga Model : A Cluster Based Improved Extensive Shrimp and Prawn Culture Approach

প্রফুল্ল কুমার সরকার[১]

Abstract

Shrimp farming in Bangladesh is mostly traditional in nature with the average production ranging between 280 to 350 kg per hectare. The rate of production is very low mainly due to poor infrastructures and traditional farming practices. Many natural and man-made causes are also putting pressure on the shrimp production of the country. To keep up the production level and to meet up the demand of shrimp, there is no alternative but to increase the rate of production by adopting improved shrimp culture technology. With this realization, a demonstration farmer along with 4 fellow farmers from the Village Barodanga under Dumuria Upazila of Khulna district were selected in 2013 and the Department of Fisheries (DoF), Extension Agents advised to follow some improved shrimp culture management practices. The management practices were to raise water depth up to nearly a meter, stock of disease free certified PL of bagda at the rate of 30-35 thousand and galda Juvenile at the rate of 12-15 thousand per hectare of Gher/Ponds/Canals and to provide supplementary feeds for the shrimp/prawn. The farmers were also suggested to improve infrastructure (raising and strengthening dykes, making earthen pond or hapa nursery in the gher for nursing PL etc.) and to follow good aquaculture practices (GAqP). As per advice, they improved their existing farm's infrastructures, increased water depth up to 3-4 feet of the grow-out ponds/ghers, reared juveniles in the nursery with disease free certified PL and used supplementary feed. Following these advice, the demo farmer got increased shrimp and prawn production of 510 kg bagda, 810 kg galda and 900 kg carp fish and made a net profit of Taka 5.16 lakh per ha. This extension approach has increased shrimp production nearly double, helped farmers to organize in a cluster and adopt GAqP. The impressive outcome of the demo farmers drew attention of neighboring farmers to replicate (nearly 100%) by their own initiative in the following year 2014. This simple improved extensive shrimp farming practices has ultimately evolved a model that is popularly considered as 'Barodanga Model' of DoF.

চিংড়ি চাষ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে চিংড়ি চাষের উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান। জোয়ার ভাটা ও বিভিন্ন মাত্রার লবণ পানি এ উপযোগী পরিবেশ তৈরি করেছে। চিংড়ি চাষের ফলে উপকূলীয় জল ও জমির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ উপকূলীয় মানুষের জীবন-জীবিকায় ইতিবাচক অবদান রাখছে। চিংড়ি চাষ এলাকায় বেশিরভাগ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা - বাড়িঘর, বেশভূষা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হার, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ চিংড়িবিহীন এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল। দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জাতীয় আয়ে চিংড়ির অবদান উল্লেখযোগ্য। রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের অবস্থান দ্বিতীয় বৃহত্তম। মোট রপ্তানি আয়ে এর অবদান শতকরা ২.৭৩ ভাগ। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য থেকে বছরে ৪.৫ থেকে ৫.০ হাজার কোটি টাকা (২০১১-১২ অর্থবছরে ৪,৭০৪ কোটি টাকা) সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। চিংড়ি খামারের অবকাঠামো ও চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে এ অমিত সম্ভাবনাময় খাত থেকে অনায়াসেই ১০-১২ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

সত্তরের দশক হতে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ বিস্তার লাভ করলেও অদ্যাবধি খামারের অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তেমন একটা হয়নি। বিশেষ করে বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি বড়ই সনাতনী। সারা উপকূলে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর চিংড়ি চাষের জমির মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার হেক্টর জমিতে বাগদা এবং ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ির চাষ হয়। চাষের আওতাভুক্ত প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে সনাতনী পদ্ধতির চাষ হয়। এ পদ্ধতির চাষে হেক্টর প্রতি বাগদার উৎপাদন ২৮০ থেকে ৩৫০ কেজির বেশি নয়। এ অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঘের বা পুকুরে সনাতনী ধারার চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন খুবই জরুরি কেননা এ পদ্ধতির চাষে কোনো পরিকল্পিত ঘের বা পুকুর নেই। সাধারণত জমিতে জোয়ারে যে পানি জমে আসেই হয় বাগদা চিংড়ির চাষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পানির গভীরতা ০.৩-০.৬ মিটারের (১-২ ফুট) বেশি নয়। অনায়াসেই এক ঘেরের পানি অন্য ঘেরে যেতে পারে। এতে এক ঘেরে মড়ক লাগলে তা সহজেই অন্য ঘেরে সংক্রমিত হয়। চাষের পুরো মৌসুমে পানির কাঙ্ক্ষিত গভীরতা ধরে রাখার কোনো সুযোগ ও ব্যবস্থা কোনোটিই নেই। সাধারণত সনাতনী ধরার বাগদা চিংড়ি চাষে কোনো খাদ্য ব্যবহার হয় না।

এমতাবস্থায় মূলত পরিবেশের পীড়নজনিত কারণে প্রায়শ বাগদা চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়। ফলে এ পদ্ধতির চাষে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে দিন দিন উপকূলীয় নদ-নদীর নাব্যতা কমেই হচ্ছে অতি দ্রুতলয়ে। উপকূলীয় বেড়িবাঁধের গেইট দিয়ে লবণ পানি উত্তোলনে আসছে নানা বাধা। লবণসহিষ্ণু কৃষি ফসলের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের কারণে দিন দিন বাগদা চিংড়ির চাষ এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে উন্নত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়াতে না পারলে চিংড়ির উৎপাদন ও রপ্তানি

বাগদিতোর চলমান ধারাও ধরে রাখা সম্ভব হবে না, অথচ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে চিংড়ি চাষ উন্নয়নের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। আধা-নিবিড় পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষে হেক্টর প্রতি ৫-৬ মে.টন উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে। তবে এ পদ্ধতির চাষে যথেষ্ট পুঁজি এবং এক জায়গায় বেশি পরিমাণ নিরঙ্কুশ জমির প্রয়োজন হয় বলে তেমন প্রসার লাভ করছে না। পক্ষান্তরে, অপেক্ষাকৃত কম খরচে অনেক সাধারণ চাষি বিদ্যমান খামারের অবকাঠামো কিছুটা উন্নয়ন করে উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতিতে এ চাষ করতে পারেন। এতে সহজেই দেশে চিংড়ির উৎপাদন অনেকটাই বাড়ানো সম্ভব। দেশে বিদ্যমান উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতির চিংড়ি চাষ শতকরা ১০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে ৩০ ভাগ এ উন্নীত করতে পারলে চিংড়ির মোট উৎপাদন অনায়াসেই তিনগুণেরও বেশি করা সম্ভব।

ছবি: বড়ডাঙ্গার পুকুর পাড় এখন বেশ চওড়া, মজবুত ও ঢালু

বড়ডাঙ্গা মডেল (Barodanga Model)

কোন রূপকথা বা গল্প নয়, বড়ডাঙ্গা এখন চিংড়ি চাষের মডেল। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বড়ডাঙ্গা গ্রামের 'চিংড়ি চাষের বাস্তব ঘটনা'। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বড়ডাঙ্গার চাষিরাও ছিল সনাতনী ধারার চিংড়ি চাষে অভ্যস্ত। মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় এসে বড়ডাঙ্গার চাষিরা এখন সনাতনী পদ্ধতির চিংড়ি চাষ থেকে উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতির চিংড়ি চাষে ঝুঁকছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশনায় নির্বাচিত ২০১৩ সালের সংযোগ চাষি সুজিত মণ্ডল ও বন্ধু চাষিদের অভাবনীয় সাফল্য পেটি বড়ডাঙ্গার চাষিদের করেছে উদ্বুদ্ধ। ২০১৪ সালে বড়ডাঙ্গার ১৩৬ জন চাষি দলবদ্ধভাবে একই মাঠে উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতির এ চিংড়ি চাষ শুরু করেছে। বড়ডাঙ্গা গ্রামের সংযোগ ও বন্ধু চাষিদের গত বছরের চাষে লাভটাই বড় কথা নয়। সুজিত মণ্ডল ও তাঁর সঙ্গীদের সাংগঠনিক দক্ষতায় রয়েছে আরো বড় চমক। তাঁরা এখন সুসংগঠিত চাষিদল। উক্ত মাঠের প্রায় সকল ঘেরকে দু'টি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও চাষিদের উদ্যোগে ঘের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধার্থে রেজিস্ট্রেশন নম্বর খামারিদের মোবাইলে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রায় সকল ঘেরে মাটি তুলে গভীরতা বাড়ানো হয়েছে; প্রায় সকল খামারে নার্সারি করা হয়েছে। জিএকিউপি (Good Aquaculture Practiced) বাস্তবায়ন করতে খামার এলাকা থেকে গরু, ছাগল ও মুরগি পালনের ঘর অপসারণ করা হয়েছে; চাষে গোবর ও হাঁস-মুরগির মল প্রয়োগ বন্ধ করা হয়েছে; খামার এলাকায় হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল চরানো বন্ধ করা হয়েছে। বাড়ির ময়লা-আবর্জনা যাতে ঘেরে না যায় সেজন্য পৃথক গর্ত তৈরি করা হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রায় সকল খামারে রেকর্ড বই খোলা হয়েছে। এ উদ্যোগের খবর ছড়িয়ে পড়ায় এ সেক্টরে নিয়োজিত উন্নয়ন সংস্থা ও কর্মীদের ভিড় এখন বড়ডাঙ্গায়। নানা উন্নয়ন সংস্থার গাড়ি এখন গ্রামের সরুপথ বেয়ে ঢুকে পড়ে বড়ডাঙ্গার চিংড়ি খামারে। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণও পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ও বিটিভি কর্তৃক মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে গৃহীত চিংড়ি চাষে বড়ডাঙ্গা মডেলের সাফল্য গাথা প্রচারিত হয়েছে।

ছবি: ২০১৩ সালে সংযোগ চাষির পুকুরের এক ক্ষেপে আহরিত চিংড়ি

বড়ডাঙ্গা মডেলে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি (Barodanga Model Shirmp Culture Method)

বড়ডাঙ্গার প্রাপ্ত ফলাফল ও অভিজ্ঞতার আলোকে চিংড়ি চাষের এ উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

পানির গভীরতা বৃদ্ধি: পানির গভীরতা বৃদ্ধি এ পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান কাজ। পানির গভীরতা '৩ ফুটের নিচে নয়, ৪ ফুট হলে ভাল হয়'। কোথাও কোথাও ঘেরের তলার মাটি কেটে এবং কানেল চওড়া ও গভীর করে পানির গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে। কোথাও শুধুমাত্র কানেল চওড়া ও গভীর করে এবং পানির সরবরাহ বাড়িয়ে গভীরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ছবি: বড়ডাঙ্গার চাষিরা ঘের প্রস্তুতকালে পানির গভীরতা বাড়াতে ব্যস্ত

খামারে নার্সারি: চিংড়ির ভাল ফলন পেতে হলে খামারে নার্সারি থাকা প্রয়োজন। নার্সারিতে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চিংড়ি পোনা মজুদ করতে হয়। ঘেরে ছোট একটি পুকুর কেটে নার্সারি করা যেতে পারে। সম্ভব না হলে ঘেরের হাপায় নার্সারি করা

যেতে পারে। নার্সারিতে পানির গভীরতা ১ মিটার রাখা ভাল। তলার কাদা তুলতে হয়। শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। পানির রং হালকা সবুজ অথবা বাদামি রাখা প্রয়োজন। নার্সারিতে নারিকেল বা তালপাতা পুঁতে অথবা নেট ঝুলিয়ে আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হয়। সকাল বা সন্ধ্যায় সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত পোনা পানির সাথে খাপ খাইয়ে অবমুক্ত করতে হয়। অবশ্যই ফিসিঅর পরীক্ষিত ভাইরাসমুক্ত পোনা সংগ্রহ ও পরিবহনজনিত পীড়নমুক্ত পোনা মজুদ করতে হবে।

ছবি: প্রস্তুতকৃত ঘেরে পানি দেয়া হচ্ছে

চাষের ঘের প্রস্তুতি: প্রতি বছর চিংড়ি সম্পূর্ণ আহরণের পর সুবিধাজনক সময়ে চাষের ঘেরের তলার কাদা তুলতে এবং পাড় মেরামত করতে হয়। পাড় মজবুত, চওড়া ও বেশ উঁচু হতে হয়। পানি যত কম চোয়ায়ে ততই রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সময়মত শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। ঘেরে পরিমিত পানি হলে হালকাভাবে রাসায়নিক সার অথবা ঘের প্রোটি ও আগাছামুক্ত হলে রাইস পলিস ও চিটাগুড়ের মিশ্রণ ব্যবহার করে পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামি করতে হবে।

চাষের ঘেরে পোনা মজুদ: অবশ্যই ভাইরাসমুক্ত সুস্থ ও সবল পোনা ঘেরে মজুদ করতে হবে। নার্সারিতে প্রতিপালিত বাগদা পোনা হেক্টর প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার দিনের ঠাণ্ডার সময় মজুদ করতে হবে। পরিকল্পিত চাষে পোনা একবারে মজুদ করাই উত্তম। অবস্থা ও অবস্থানভেদে বাগদা চিংড়ির দ্বিতীয় ফসল নেয়া যেতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে বাগদার সাথে অথবা পরে একটি গলদা ফসল নেয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে শতকে ৫০-৬০টি (হেক্টর প্রতি ১২ থেকে ১৫ হাজার) কিশোর গলদা চিংড়ি মজুদ করা যেতে পারে।

ছবি: বড়চাঙ্গার চাষিরা দল বেঁধে ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি করছে

ছবি: ঘেরের পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামী

পরিচর্যা: পোনা ছাড়ার পর ঘেরের পরিচর্যাগুলো ভালভাবে সম্পাদন করতে হয়। পুরো মৌসুম পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামি রাখতে হয়। পানি স্বচ্ছ হলেই পরিমিত ইউরিয়া ও টিএসপি অথবা রাইস পলিস ও চিটাগুড়ের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয়। মাঝে মাঝেই পানির স্বচ্ছতা, পিএইচ, লবণাক্ততা, অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি প্যারামিটার পরিমাপ করে অনুকূলমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পুরো মৌসুম পানির বর্ণ হালকা সবুজ বা বাদামি, পিএইচ ৭.৫ থেকে ৮.৫ বজায় রাখতে হয়।

খাবার প্রয়োগ: অবশ্যই মানসম্পন্ন খাবার সময়মত ও পরিমিত পরিমাণে দিতে হয়। নার্সারিতে দিনে ৪ বার ও মজুদ পুকুরে সকাল ও সন্ধ্যা ২ বার খাবার দিতে হয়। খাবার ঠিকমত খায় কি না দেখতে হয়। মাঝে মাঝে চিংড়ির গড় ওজন নিয়ে চিংড়ির পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। চিংড়ির পরিমাণ অনুযায়ী খাবারের দৈনিক পরিমাণ ঠিক করতে হয়। প্রতি ৭-১০ দিন পর পর চিংড়ির স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

ধরা/মারা ও নাড়াচাড়া: চিংড়ি ধরা/মারা ও নাড়াচাড়ায় যত্নবান হতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক চিংড়ি ধরতে হবে। ধরার আগে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পর্যাপ্ত বরফ ও চিংড়ি আহরণ সরঞ্জাম যোগাড় রাখতে হবে এবং পটাশ-পানিতে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। চিংড়ি ধরার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে খাবার বন্ধ করে দিতে হবে। কোন ঔষধ ব্যবহার করা হলে তার রেকর্ড রাখতে হবে এবং অপদকাল শেষ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে চিংড়ি ধরতে হবে। পাড়ে পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর জাল ঝাড়তে হবে। সাথে সাথে বরফ জলে চিংড়ি মারতে হবে। পরিমিত বরফ পরতে পরতে সাজিয়ে সাজিয়ে পরিমিত পরিমাণে প্যাকিং করতে হবে। ঢাকনাযুক্ত ভ্যানে চিংড়ি পরিবহন করতে হবে। চিংড়ি ঢালা-ঢালা, মাথা ছাড়ানো ও নাড়াচাড়া স্বাস্থ্যসম্মতভাবে করতে হবে।

চিংড়ির গুণগত মান সংরক্ষণ: চাষের সকল পর্যায়ে জিএকিউপি বা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। চাষে দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে। দূষণ উৎস হতে নিরাপদ দূরত্বে ঘের করতে হবে। মানুষ অথবা পশুপাখির মল চিংড়ি চাষে

ছবি: বড়ডাঙ্গার ঘেরে গুড অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস

ব্যবহার করা যাবে না। খামারে গরু, মহিষ, ছাগল ও হাঁস-মুরগি চরানো যাবে না। ভালভাবে না জেনে, না বুঝে কোন ক্ষতিকর ঔষধপত্র কীটনাশক অথবা রাসায়নিক দ্রব্য (বোতল/প্যাকেটজাত ঔষধ) চিংড়ি চাষে ব্যবহার করা যাবে না। খামারের ভেতর-বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। চাষে শিশুশ্রম বর্জন ও নারী শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১. **এ চাষে করণীয় বিষয়:** বিদ্যমান ঘেরের অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। তলার মাটি কেটে অথবা অন্যবিধ উপায়ে পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করতে হবে; খামারে নার্সারি করতে হবে; সুস্থ ও রোগমুক্ত পোনা মজুদ করতে হবে; সম্পূরক খাবার দিতে হবে; পুরো মৌসুম পানির গুণাগুণ ও মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে; সর্বদাই চাষে জিএকিউপি অনুসরণ করতে হবে।

২. **চিংড়ি চাষির অনুসৃত চাষ পদ্ধতি:** ২০১৩ সালে বড়ডাঙ্গা গ্রামের সুজিত মন্ডলকে মৎস্য অধিদপ্তরের স্বাভাবিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় সংযোগ চাষি নির্বাচন করা হয়। উদ্বুদ্ধকরণ সভায় ভাল সাড়া পেয়ে একই গ্রামের আরও পাঁচজনকে বন্ধু চাষি নির্বাচন করা হয়। পরামর্শ মোতাবেক সবাই তাঁদের ঘেরের তলার কাদা তোলেন; পানির গভীরতা যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করেন; ক্যানেলের গভীরতা বাড়ান এবং ঘেরে নার্সারি করেন। পরিমিত সংখ্যায় ভাইরাসমুক্ত পোনা মজুদ করেন। সম্পূরক খাবার ও অন্যান্য পরিচর্যা করেন।

ছবি: ২০১৩ সালে সংযোগ চাষির ফলাফল পর্যবেক্ষণ

৩. **বড়ডাঙ্গা মডেলের ফলাফল:** বড়ডাঙ্গার সংযোগ ও বন্ধু চাষিদের হেক্টর প্রতি ৫১০ কেজি বাগদা উৎপাদনের সাথে একই জমিতে হেক্টর প্রতি ৮১০ কেজি গলদা চিংড়ি এবং একই সাথে হেক্টর প্রতি ৯০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছ উৎপাদিত হয়। পাড়ে কীটনাশকবিহীন শাকসবজির আবাদও চলে। সব মিলিয়ে এ মাঠে নির্বাচিত সংযোগ ও বন্ধু চাষিদের হেক্টর প্রতি নীট লাভ ৫.১৬ লক্ষ টাকা।

৪. **মডেলের হালনাগাদ বিস্তার:** ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও বড়ডাঙ্গা মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণমূলক কাজের একটি সাফল্য। বড়ডাঙ্গার চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ সাফল্য এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে। আশেপাশের চাষিরা দেখতে আসছে। চিংড়ি নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও ও উন্নয়ন সংস্থার কর্মীরা বড়ডাঙ্গা পরিদর্শন করছেন এবং প্রশিক্ষণসহ সম্প্রসারণ কাজে বড়ডাঙ্গাকে অনুসরণ করছেন। খুলনা অঞ্চলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফিল্ডট্রিপ এখন বড়ডাঙ্গাতে সম্পন্ন হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে এফএও ও ওয়ার্ল্ডফিস এর সহযোগিতায় এসসিডিএফ প্রকল্পের আওতায় দলভিত্তিক চিংড়ি চাষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে বড়ডাঙ্গাকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে খুলনা জেলায় ৫টি উপজেলায় ৫৫টি প্রদর্শনী খামার নির্বাচন করা হয়। এসব খামারিদের চলমান চাষ পদ্ধতি ও খামারের অবকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরিবর্তিত চাষ পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৫১৫ কেজি পাওয়া গেছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে খামারের অবকাঠামোগত ও চাষ পদ্ধতির সামান্য উন্নয়ন করলে অনায়াসেই হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৩০০ কেজির স্থলে ৫০০-৬০০ কেজি অর্জন করা সম্ভব। অন্যান্য দলের মধ্যে ইতোমধ্যেই প্রতিযোগিতার মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায় বড়ডাঙ্গা মডেল অন্যান্য চিংড়ি এলাকায় বিস্তার লাভ করবে।

উপসংহার (Conclusion)

বড়ডাঙ্গার চিংড়ি চাষিরা স্থাপন করেছে এক অভিনব দৃষ্টান্ত। চাষিদের সাফল্য ও লাভজনকতার মাপকাঠিতে হলেও উন্নত চিংড়ি চাষের এ পদ্ধতি টেকসই হবে বলে আশা করা যায়। উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতির এ চিংড়ি চাষের মডেল দলবদ্ধভাবে মাঠে মাঠে বাস্তবায়ন করতে পারলে বাগদা চিংড়ির মড়ক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বাগদা ও গলদা উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। ক্রমহ্রাসমান বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ঘাটতি পূরণসহ মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। খামারে ট্রেসিবিলিটিসহ জিএকিউপি বাস্তবায়ন করে চিংড়ির গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব। যেহেতু এ চাষ পদ্ধতি একেবারে নতুন কিছু নয়; বিদ্যমান ঘেরের কিছু অবকাঠামোগত এবং ব্যবস্থাপনার সামান্য উন্নয়ন মাত্র। এতে আনুপাতিক হারে ব্যয়ও বেশ কম। ফলে এ চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্ব অনেকটাই সহজ হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

হালদা নদীর বর্তমান অবস্থা ও সংরক্ষণে করণীয়
Present Status of Halda River and Measures for Conservation

ড. মোহাঃ সাইনার আলম[১] ও প্রভাতী দেব[২]

Abstract

The River Halda, a tidal influenced river, only natural breeding ground of Indian major carps in Bangladesh. The river is almost 82 km long and originates from Halda Chora of Patachora Union in Ramgar Upazila under Khagrachari District. It flows through Fatikchhari, Raozan, Hathazari Upazila and Chandgaon Thana of Chittagong Metropolitan City before discharging into the Karnaphuli River confluence. The main sources of water for this river are numerous hill-streamlets and canals. From the time immemorial the river bank dwellers especially local fisherman and egg collectors collect naturally fertilized major carp *(Catla catla, Labeo rohita, Cirrhinus cirrhosus and Labeo calbasu)* eggs in a festive mood during April to June in almost every year. The collected eggs are hatched in shallow earthen pond near river bank to produce carp fries. If the egg collectors failed to collect the real time released eggs then this natural gift simply ruin in the Bay saline water by ebb tide pull. Halda major carps are unique because of pure gene pool having fast growing and disease resistant quality that is the prime requirement for sustaining aquaculture industry. Now a day's Halda is considered as natural gene bank for major carp fishes in Bangladesh. Due to natural and manmade interventions, the production of Halda spawn has considerably been declined in the past days. A development project entitled 'Restoration of the Natural Breeding Habitat of the Halda River with the objectives to improve hatchery facilities to reduce mortality of spawn and to improve socio-economic condition of Halda dependent fishermen and egg collectors and also to declare 40 km long river as sanctuary' has been implemented since 2007. The project facilitated socio-eco-friendly environments that increased production of carp spawn in the Halda river than the previous years. The short span of project period is not adequate to conserve the river for sustainable carp eggs production and maintenance of fisher's livelihoods. The river as one of the national resource should be given due importance and use this resources very carefully.

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বয়ে চলা হালদা নদী বাংলাদেশের একমাত্র বৃহৎ রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র যা একটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক। এটি বিশ্বের একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী, যেখান থেকে সরাসরি রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। কাজেই মৎস্য সেক্টরের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি তথা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক এ জিন পুল বাঁচিয়ে রাখার জন্য হালদা নদীর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য।

রুই জাতীয় মাছের (কাতলা, রুই, মৃগেল ও কালিবাউশ) গুণগত মানসম্পন্ন পোনার নির্ভরযোগ্য উৎস তথা মৎস্যখনি হিসেবে বিবেচিত হালদা নদী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী পাহাড়শ্রেণি থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলা হয়ে চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলি নদীতে মিশেছে। অসংখ্য ছোট ছোট ছড়া, খিরি, ক্রমাগত একত্রিত হয়ে হালদা নদীর সৃষ্টি। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮২ কিলোমিটার এবং নদীর প্রস্থ স্থানভেদে ৪৫ মিটার থেকে ২১৫ মিটার। উৎসমুখের পর থেকে লোয়ালিয়া, চ্যাংখালি, সোনাইমুখি, কাগতিয়া, পরালি, তোপদাই, কুমারখালি, মদারি, বইজ্জাখালি, কাটাখালি, খন্দকিয়া ও সাকরদারাসহ প্রায় ২০টি খাল ও প্রায় ৩৪টি ছোট পাহাড়ি ছড়া হালদা নদীতে মিশেছে। কাপ্তাই লেক ও জোয়ার ভাটা হালদায় পানি সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কর্ণফুলী মোহনায় মৌসুমভেদে জোয়ার ভাটায় ২ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত পানি ওঠানামা করে। ভরা বর্ষায় পানির গভীরতা স্থানভেদে ৪/৬ থেকে ১০ মিটার। হালদা স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। স্মরণাতীত কাল থেকে হালদা সংলগ্ন কর্ণফুলী, শিকলবাহা, সাঙ্গু ও চান্দখালি নদী

তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস ঃ গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড ও পোনা উৎপাদন কৌশল
Tilapia Breeding Nucleus : A Strategy for Improved Quality Brood and Seed Production

ড. মোঃ নাহিদুজ্জামান[১], ড. মোঃ মাহবুবুল আলম খিঞা[২] ও ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন[৩]

Abstract

Aquaculture production in Bangladesh has been significantly increased in recent years. Such increase is affected due to several constraints including the genetic deterioration, inbreeding, poor broodstock management in the hatcheries. The stock genetic deterioration has shown negative impact on the growth of the fish ultimately resulting poor production. The hatcheries are producing sufficient numbers of fish seeds but the seeds produced, in most cases, are reported to be poor quality. The purpose of the establishment of Tilapia Breeding Nucleus (TBN) is to produce Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) broodstock ensuring production and supply of improved quality GIFT strain tilapia seeds to be used as brood fish by tilapia hatcheries involved in production and distribution of tilapia seed to grow-out farms in the country. WorldFish Bangladesh and South Asia have established six TBN under USAID CSISA-BD and AIN and DANIDA funded RFLDC projects in both public and private hatcheries throughout Bangladesh. The Breeding Nucleus established in the meantime showed a lot of success in production and distribution of improved germplasm of tilapia for broodstock development to the hatcheries and improve quality tilapia seeds to grow-out farmers located in different areas of Bangladesh.

গত এক দশকে বাংলাদেশে তেলাপিয়া চাষে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিদ্যমান স্বাদুপানি ও লোনাপানি বা উপকূলীয় জলাশয়ে উন্নত জাতের তেলাপিয়া চাষাবাদ বিস্তার লাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণত তেলাপিয়ার একক চাষ, কার্পের সাথে মিশ্রচাষ, পাঙ্গাসের সাথে মিশ্রচাষ এবং ধানক্ষেত বা ঘেরেও চাষ করা হয়ে থাকে। ২০০২ সালে বাংলাদেশে তেলাপিয়ার উৎপাদন ছিল ৪,০০০ মে.টন যা ২০১২ সালে ১,৫৮,০০০ মে.টনে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ২০১৫ সালে তেলাপিয়ার উৎপাদন ১,৫০,০০০ মে.টন ছাড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তেলাপিয়ার মিশ্র লিঙ্গ এবং মনোসেক্স (পুরুষ জাতের) পোনা উৎপাদনের জন্য প্রায় ৪০০টি বাণিজ্যিক হ্যাচারি গড়ে উঠেছে। এ সব হ্যাচারিতে প্রায় ৩.৫-৪.০ বিলিয়ন মনোসেক্স বা মিশ্র লিঙ্গের পোনা উৎপাদিত হয় যা সারাদেশের ৬,০০০টি বাণিজ্যিক খামারে সরবরাহ করা হয়।

ছবি: মানসম্পন্ন তেলাপিয়া ব্রুড

বাংলাদেশের অধিকাংশ তেলাপিয়া হ্যাচারিতে ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনা ও ব্রুড প্রতিস্থাপনের সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে কম সংখ্যক ব্রুড মাছ দিয়ে তেলাপিয়ার প্রজননের প্রবণতা

ছবি: হাপায় তেলাপিয়া পোনা লালন-পালন

লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ব্রুডস্টকের মান খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং প্রায়শ তেলাপিয়ার হ্যাচারিতে অন্তঃপ্রজনন ঘটছে। তেলাপিয়ার চাষিরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন, পুকুরে তেলাপিয়ার আশানুরূপ বৃদ্ধি হচ্ছে না। এজন্য তারা গুণগত মানসম্পন্ন তেলাপিয়ার পোনার অভাবকেই দায়ী করেন। সত্যিকার অর্থে, খারাপ মানসম্পন্ন তেলাপিয়ার পোনার জন্য দায়ী হচ্ছে- ব্রুডস্টকের জেনেটিক মান হ্রাস, দুর্বল হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, ভাল জাতের ব্রুডের অভাব ইত্যাদি।

তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস
(Tilapia Breeding Nucleus)

হ্যাচারিতে ব্রুডস্টক অব্যবস্থাপনার কারণে প্রায়শ অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে প্রতি জেনারেশন উৎপাদনে সংক্ষিপ্ত সময়কাল এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া অন্তঃপ্রজননের মাত্রা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বিশেষ করে হ্যাচারিতে সীমিত পর্যায়ে পোনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় স্বল্প সংখ্যক ব্রুড মাছের ব্যবহারে এ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। অন্তঃপ্রজননের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বাঁচার হার হ্রাস, ডিম ধারণ

ক্ষমতা হ্রাস, বিকলাঙ্গতা ইত্যাদি। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রুডস্টকের জেনেটিক অবক্ষয়তা তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা। এসব কারণ বিবেচনা করে, ওয়ার্ল্ডফিশ-বাংলাদেশ নোয়াখালী, বরিশাল, যশোর, ময়মনসিংহ ও রংপুরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৬টি 'তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস' স্থাপন করেছে।

তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ভাল মানের তেলাপিয়ার জার্মপ্লাজম উৎপাদন করা এবং তেলাপিয়া হ্যাচারিগুলোতে সরবরাহ করা যাতে হ্যাচারিগুলো সেগুলো হতে উৎপাদিত ব্রুডস্টক ব্যবহার করে মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন করতে পারে। ওয়ার্ল্ডফিশ-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) ও মালয়েশিয়ার জিত্রা খামার থেকে তেলাপিয়ার উন্নতমানের গিফট জাত (GIFT strain) এর ১৪তম জেনারেশনের বেইজ পপুলেশন সংগ্রহ করে নির্বাচিত হ্যাচারিগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করে। RFLDC/DANIDA প্রকল্পের আওতায় ২টি (গ্রীন ফিল্ড হ্যাচারি, লক্ষ্মীপুর ও সোনার বাংলা হ্যাচারি, বামনা, বরগুনা), Aquaculture for Income and Nutrition (AIN) প্রকল্পের আওতায় ২টি (সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বেজপাড়া, যশোর ও জেনেটিক হ্যাচারি, নোয়াপাড়া, যশোর) এবং CSISA-BD প্রকল্পের আওতায় ২টি (নোভা হ্যাচারি, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ ও সন্ধি এ্যাকোয়া এন্ড এগ্রোফার্ম, তারাগঞ্জ, রংপুর)- অর্থাৎ মোট ৬টি তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস স্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এসব ব্রিডিং নিউক্লিয়াস থেকে ৩-৪ মিলিয়ন উন্নত জাতের তেলাপিয়া ব্রুড প্রায় ১০০-১৫০টি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য বর্তমানে দেশে বিদ্যমান ৪০০টি তেলাপিয়া হ্যাচারির চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বছর প্রায় ১০.২ মিলিয়ন তেলাপিয়ার ব্রুড দরকার (Hussain *et al.*, ২০১৪)।

তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াসে কোহর্ট ব্রিডিং প্রটোকল (Cohort Breeding Protocol in Tilapia Breeding Nucleus)

সিলেক্টিভ ব্রিডিং ও রোটেশনাল ব্রিডিং কৌশলের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন তেলাপিয়ার ব্রুড ও পোনা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এ কৌশলের অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে-উচ্চ জেনেটিক গুণাগুণসম্পন্ন ব্রিডিং পপুলেশন তৈরি করা যা হ্যাচারিতে প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে। ব্রিডিং নিউক্লিয়াসে ৬০টি পরিবারভুক্ত তেলাপিয়া ৮টি কোহর্টে বিভক্ত করে আলাদা পুকুরে প্রতিপালন করা হয়। প্রত্যেক জেনেরেশনে প্রজননের সময় প্রত্যেক কোহর্ট থেকে নির্বাচিত পুরুষ তেলাপিয়ার সাথে অন্য কোহর্টের স্ত্রী মাছকে প্রজনন করে ডিম সংগ্রহ করা হয়। রোটেশনাল প্রজননের (rotational mating) জন্য, প্রথম জেনেরেশনের ১ নম্বর কোহর্টের পুরুষ তেলাপিয়াগুলোকে ২ নম্বর কোহর্টে স্থানান্তর করা হয় এবং ঐ কোহর্টের স্ত্রী তেলাপিয়ার সাথে প্রজননের সুযোগ দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে যথাক্রমে ২ থেকে ৩, ৩ থেকে ৪, ৪ থেকে ৫, ৫ থেকে ৬, ৬ থেকে ৭, ৭ থেকে ৮ এবং ৮ থেকে ১ নম্বর কোহর্টের পুরুষ তেলাপিয়াগুলোকে স্থানান্তর করা হয় এবং ঐ কোহর্টের স্ত্রী তেলাপিয়ার সাথে প্রজননের সুযোগ দেয়া হয় যা নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।

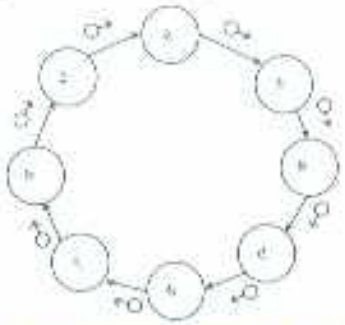

চিত্র: ব্রিডিং নিউক্লিয়াসে প্রথম জেনারেশনে তেলাপিয়ার কোহর্ট ব্রিডিং প্ল্যানের মডেল

দ্বিতীয় জেনারেশনে, ১ থেকে ৩, ২ থেকে ৪, ৩ থেকে ৫, ৪ থেকে ৬, ৫ থেকে ৭ এবং ৬ থেকে ৮ নম্বর কোহর্টের পুরুষ তেলাপিয়াগুলোকে স্থানান্তর করা হয় এবং ঐ কোহর্টের স্ত্রী তেলাপিয়ার সাথে প্রজননের সুযোগ দেয়া হয় যা নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।

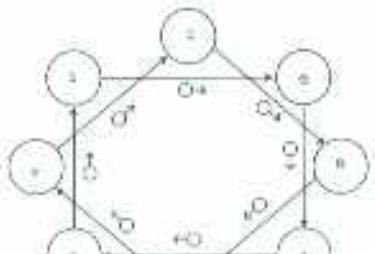

চিত্র: ব্রিডিং নিউক্লিয়াসে দ্বিতীয় জেনারেশনে তেলাপিয়ার কোহর্ট ব্রিডিং প্ল্যানের মডেল

এ পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে, আউটব্রিডিং (outbreeding) এর কারণে ব্রুডস্টকের অবস্থা ভাল থাকে এবং প্রত্যেক জেনারেশনে কিছু পরিমাণ কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়ন (genetic gain) সম্ভব হয়। যার ফলে, তেলাপিয়া হ্যাচারি এ ধরনের রোটেশনাল ব্রিডিং কৌশলের মাধ্যমে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে উন্নতমানের ব্রুডস্টক পেতে পারে এবং মানসম্মত পোনা উৎপাদন করতে পারে। এ পদ্ধতিতে অনির্বাচিত গিফট স্ট্রেইনের চেয়ে ২০% বেশি তেলাপিয়ার উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

উপসংহার (Conclusion)

তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস থেকে প্রাপ্ত ব্রুড প্রজনন কাজে ব্যবহার করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন মানসম্মত পোনা পাওয়া সম্ভব এবং জেনেটিক ভিন্নতার হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে এবং অন্তঃপ্রজননের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা সম্ভব। এ সব ভাল মানের পোনা তেলাপিয়া চাষে ব্যবহার করলে অধিক বৃদ্ধির হার তথা অধিক তেলাপিয়ার উৎপাদন নিশ্চিত হবে।

[illegible], ওয়ার্ল্ডফিশ, বাংলাদেশ
[illegible], ওয়ার্ল্ডফিশ, বাংলাদেশ
[illegible], ওয়ার্ল্ডফিশ, বাংলাদেশ

ইফকাস-এ মাছ ও সবজি চাষ : টেকসই খাদ্য-নিরাপত্তার নতুন সম্ভাবনা

Aquaculture and vegetable farming in IFCAS: A New Horizon to Sustain food Security

ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক রিপন[১], মোঃ রোসনে আলম[২] এবং ড. খন্দকার মোরশেদ-ই-জাহান[৩]

Abstract

A participatory action research was collegially carried out by Bangladesh Agricultural University, Patuakhali Science and Technology University, WorldFish and Bangladesh Fisheries Research Forum inovating a technology as acronymed IFCAS (Integrated Floating Cage Aquageoponics System) for shaded ponds in Barisal region under Agriculture and Nutrition Extension Project (ANEP). Here aqua, geo and ponics means pond water, pond mud/soil and cultivation, respectively. In the shaded ponds, growing vegetable on pond dyke and, fish production in pond water and its regular harvest for household consumption had difficulties. To overcome the difficulties, IFCAS was trialed through a participatory action research at the farmer level. In shaded ponds (highly shaded pond and moderately shaded pond), IFCAS (3.66 m X 2.44 m = 9 m^2) was set, in which tilapia was stocked at the rate of 100/m^2 cage, and in ponds carps were stocked at the rate of 14,820/ha. Tilapia was fed with floating feed and carps with supplementary feed. On the scaffold of IFCAS, vegetables were grown and in the net-cage of that in-built underneath, tilapia was grown. The overall fish and vegetable production was relatively higher in moderately shaded ponds compared to highly shaded ponds. Household women participation in the action research was remarkable due to the production of vegetables and fish together in IFCAS. Within three months of research observation started from July 2013, it was found that individual household consumed about 25 kg of vegetables including cucumber, snake gourd, bitter gourd and Indian spinach. In the winter season, bottle gourd, tomato etc. were grown well. After 4 months of stocking tilapia in cage of IFCAS, households started eating tilapia within a month. The average fish consumption was 20 kg/household within six months, of which more than 50% was tilapia from IFCAS. Fish and vegetables production from IFCAS continued in the rainy seasons when there was almost no vegetable production in the wet homestead due to shower and flash flood in the trial area of Barisal. Thus, IFCAS has contributed to household nutrition in critical time of the year contributing to the nutritional smoothing. The financial analysis showed the benefit-cost ratio of 1.5, which indicated the higher investment efficiency to the IFCAS at the farmer level.

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই বরিশাল অঞ্চলের গ্রামীণ পরিবারভিত্তিক পুকুরগুলো বসত ভিটা তৈরির জন্য খনন করা হয়েছে। প্রথাগতভাবে এসব পুকুরগুলো ছোট মাছের ফ্যান-পুকুর হিসেবে ব্যবহার হয় যেখানে কম সংখ্যক কার্প জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করে শুধু পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য মাছ চাষ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে পরিবারের পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়াকালচারের ওপর ভিত্তি করে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (BBD) এর সহায়তায় এগ্রিকালচার এন্ড নিউট্রিশন এক্সটেনশন প্রজেক্ট (এএনএপি), বরিশাল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এনজিও, ওয়ার্ল্ডফিস এ প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে অন্যান্য পার্টনারদের সহযোগিতায় অ্যাকোয়াকালচার কম্পোনেন্টকে বাস্তবায়ন করছে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে এ অঞ্চলের পুকুর পাড়ে প্রচুর গাছপালা থাকে যেগুলো সাধারণত রান্নার জ্বালানি, ফল এবং কাঠ উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য রোপণ করা হয়। পুকুরের পাড়ে এসব গাছ পুকুরের পানিতে ছায়া তৈরি করে সূর্যালোক অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে। এতে করে পুকুরের জলে মাছের উৎপাদন ও পুকুরের পাড়ে সবজি উৎপাদন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। তবে পুকুরের পানিতে যেখানে সূর্যালোক পড়ে সে স্থানে সবজি উৎপাদনের একটি সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়।

পুকুরের পাড়ে ছায়াময় প্রকৃতি এবং পানিতে সূর্যালোক এক্সপোজার এলাকা বিবেচনা করে, অ্যাকশন রিসার্চের মাধ্যমে একটি নতুন বিশেষ সমন্বিত অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম, ইফকাস (IFCAS: Integrated Floating Cage Aquageoponics Systems) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এখানে Aquageoponics-এর aqua বলতে পুকুরের পানি, geo বলতে পুকুরের তলার কাদা বা মাটি এবং ponics বলতে চাষকে বোঝানো হয়েছে। ইফকাসের মৌলিক ধারণাটি হচ্ছে পুকুরস্থিত খাঁচায় ও পানিতে মাছের জন্য যে খাবার দেয়া হয় তাতে নাইট্রোজেনযুক্ত ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় যা মাছের বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক কিন্তু উদ্ভিদের জন্য চমৎকার সার। ইফকাসের কাঠামোতে সবজির মাদায় ব্যবহৃত পুকুরের কাদায় যে জৈব সার থাকে তাও উদ্ভিদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সার। মাদায় ব্যবহৃত পুকুরের কাদা এক দিকে সবজির চারা রোপণের মিডিয়া হিসেবে এবং অন্যদিকে সারের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ দিক বিবেচনা করে এরকম সমন্বিত পদ্ধতিতে পুকুরের পানির পরিবেশ ঠিক রেখে অত্যন্ত টেকসই উপায়ে মাছ ও সবজি উৎপাদন সম্ভব।

অ্যাকশন রিসার্চ (Action Research)

এ গবেষণা বরিশাল সদর উপজেলার দিনার গ্রামের চাষিদের নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ এবং এএনএপি'র অ্যাকোয়াকালচার পার্টনার ওয়ার্ল্ডফিস যৌথভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ৯ জন মাছ চাষিকে প্রথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইফকাসের নকশা এবং এটি তৈরির প্রক্রিয়া চাষি ও এএনএপি'র মাঠকর্মীদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। ইফকাসের মৌলিক ফ্রেম/কাঠামোটি লোহার পাত দ্বারা তৈরি করা হয়। একটি ৯ বর্গমিটার (৩.৬৬ মি. × ২.৪৪ মি.) আয়তনের লোহার বার দিয়ে তৈরি ফ্রেমকে ভাসিয়ে রাখার জন্য কাঠামোটির চার কোণে ফ্লোট বসানোর জন্য চারটি খাঁজ তৈরি করা হয়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্লাস্টিকের কন্টেইনার (৬০-৭০ লিটার) দিয়ে তৈরি ফ্লোট ইফকাসকে ভাসিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। লোহার ফ্রেমের প্রস্থ বরাবর দুটি ফ্লোটের মাঝে সবজি রোপণের জন্য একটি করে দুপাশে দুটি মাচা তৈরি করা হয় যেখানে উক্ত পুকুরের শুকনো কাদার সাথে সমপরিমাণ জৈব সার যেমন গোবর মিশিয়ে দেয়া হয়।

ছবি: ছায়াযুক্ত পুকুরে স্থাপিত ইফকাসে সবজি উৎপাদন

মাদক নিম্নাংশ পুকুরের পানিতে লেগে থাকার কারণে পানি থেকে উদ্ভিদ পুষ্টি সহজে গ্রহণ করতে পারে। এতে করে উদ্ভিদের জন্য কোনো সেচের প্রয়োজন হয় না। লোহার কাঠামোর নিচে সমগ্র এলাকা একটি আয়তাকার নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে দেয়ার জন্য ১.২৫ মি. গভীরতা বিশিষ্ট খাঁচা বা কেইজের অনুরূপ গঠন তৈরি করা হয়। কাঠামোর উপরিতলের গঠন বরাবর সবজি গাছ বেয়ে চলার জন্য বাঁশের ফালি ও নাইলন সুতা দিয়ে একটি মাচা তৈরি করা হয়।

চাষিদের পছন্দানুযায়ী লতানো সবজি এবং পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে পারে এ ধরনের সবজির চারা মাদায় রোপণ করা হয়। জালের খাঁচার ভেতর মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা ১০০টি/ঘনমিটার হারে মজুদ করে ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। ইফকাসের বাইরে পুকুরের অবশিষ্ট এলাকা প্রচলিত কার্প চাষ কৌশল অনুযায়ী রুই-কাতলা চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কার্প জাতীয় মাছ হেক্টর প্রতি ১৪,৮২০ টি হারে (কাতলা : রুই : মৃগেল : কার্পিও = ১ : ২ : ২ : ১) মজুদ করা হয়। রুই-কাতলা মাছের খাদ্যের জন্য পুকুরে সার ও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া ও গমের ভুসি দেয়া হয়।

ফলাফল (Result)

গবেষণার প্রথম চক্রের (জুলাই-অক্টোবর, ২০১৩) শুরুতে নির্বাচিত ৯টি পরিবারের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক, যেখানে ৫টি পরিবারের মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। চাষিরা সবচেয়ে ইফকাস পুকুরের সূর্যালোক এক্সপোজার এলাকায় স্থাপন করে। প্রায় সকলেই মাচার উচ্চতা মূল নকশা থেকে কিছুটা উঁচু করেছিল যাতে করে লম্বা সবজি যেমন- চিচিঙ্গা বা লাউ মুক্তভাবে বৃদ্ধি হতে পারে। চাষিরা তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী সবজি যেমন- শশা, চিচিঙ্গা, পুঁইশাক, করলা, শিম ইত্যাদি লাগানো সবজি হিসেবে রোপণ করে। অর্ধ-ছায়াময় পুকুরে মাছ ও সবজির বৃদ্ধি অধিক ছায়াময় পুকুরের চেয়ে বেশি ছিল।

ছবি: ইফকাসে মাদায় সবজি গাছের শিকড় পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ

গবেষণার ৩ মাসের মাথায় অংশগ্রহণকারী পরিবারের মধ্যে ইফকাস থেকে সবজি খাওয়ার পরিমাণ ছিল ২৫ কেজি/পরিবার। যে সময় সবজি উৎপাদিত হয়েছিল সে সময় বর্ষাকালে অতি বৃষ্টিপাতের কারণে চাষিদের কাদাময় বসতভিটায় সবজি উৎপাদন প্রায় অসম্ভব ছিল। অর্ধ-ছায়াময় ও অধিক-ছায়াময় পুকুরে ইফকাসে তেলাপিয়ার উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৫২ ও ৩১ কেজি/৯ বর্গমিটার। এ সময় পুকুরে রুই-কাতলা জাতীয় মাছের বৃদ্ধি অর্ধ-ছায়াময় পুকুরে অধিক-ছায়াময় পুকুরের চেয়ে বেশি ছিল। বিশেষ করে, অর্ধ-ছায়াময় পুকুরে কার্পিওর বৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত বেশি এবং কাতলার বৃদ্ধি অন্যান্য মাছের তুলনায় উভয় ধরনের পুকুরে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফলশ্রুতিতে কার্পিও মাছকে ছায়াময় পুকুরে কার্প-পলিকালচার পদ্ধতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাছ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিক-ছায়াময় পুকুরের ইফকাসে তেলাপিয়ার উৎপাদন কম হওয়ার কারণ ছিল পুকুরের পানিতে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইটের উপস্থিতি, যা পুকুরে গাছের পাতা ও অন্যান্য জৈব অংশ পচে তৈরি হতে পারে। যাহোক, গবেষণার চার মাসের মধ্য পুকুর থেকে প্রতি পরিবার যে পরিমাণ মাছ খেয়েছে (গড়ে ২০ কেজিরও অধিক) তার অর্ধেকের বেশি ছিল ইফকাসের তেলাপিয়া। তেলাপিয়ার পছন্দানুযায়ী খাঁচা থেকে খাদ্য গ্রহণ সহজতর হওয়ায় তেলাপিয়ার বৃদ্ধি কার্পের তুলনায় দ্রুত এ কারণে চাষি অতি দ্রুত এর মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টি যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে।

ছবি: ইফকাসে সবজি উৎপাদন

ছবি: ইফকাস থেকে সবজি আহরণ

শীতকালে ইফকাসে প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপাদিত হয়েছে, বিশেষ করে লাউ ও টমেটোর উৎপাদন ছিল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। গবেষণার ছয় মাসের মাথায় মোট সবজি উৎপাদন চাষি প্রতি ৭০ কেজি পর্যন্ত হয়েছে। এতে করে অংশগ্রহণকারী পরিবারের মহিলাদের ভেতর ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এর কারণ ছিল স্থানীয় বাজারে সবজির অধিক মূল্য, ছায়াযুক্ত বাড়ির আঙ্গিনা বা পুকুরের পাড়ে সবজির অগ্রতুল ফলন বা একেবারেই উৎপাদন সম্ভব নয় -এ অবস্থায় অব্যবহৃত পুকুরে ইফকাস পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো

ছবি: ইফকাসের সবজি পেয়ে চাষি পরিবারে মায়ের আনন্দ

প্রাথমিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে, ইফকাসের লেহ ও প্লাস্টিক ড্রামের তৈরি ফ্রেমের ৮-১০ বছর টেকসই-এর বিষয়টি বিবেচনা করে এর চার মাসের খরচ মাত্র ৩৪৬.০০ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ সময়ে ইফকাস থেকে নীট লাভ ১৭৫৪.০০ টাকা এবং লাভ-খরচের অনুপাত ১.৫ হিসাব করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মৎস্যচাষি ইফকাসে ১.০০ টাকা খরচ করলে ১.৪০ টাকা মূল্যের মাছ এবং ০.১০ টাকা মূল্যের সবজি উৎপাদিত হবে।

ছবি: ইফকাসের মাছ ও সবজি রান্না

সারণি: একটি ইফকাস তৈরি ৯ বর্গমিটার ও পরিচালনার লাভ খরচ সংক্রান্ত চার মাসের প্রাক্কলিত হিসাব

ক্রমিক নং	উপকরণ/উৎপাদন	পরিমাণ (কেজি/সংখ্যা)	একক মূল্য (টাকা)	মোট (টাকা)
ক	ইফকাস কাঠামো			
	লোহার বার	৪৫ কেজি	৫৫.০০	২৪৭৫.০০
	প্লাস্টিক কন্টেইনার (৬০-৭০ লি.)	৪টি	৩৫০.০০	১৪০০.০০
	প্লাস্টিক কন্টেইনার (৪০ লি.)	১টি	২৫০.০০	২৫০.০০
	ওয়েল্ডিং খরচ			৭০০.০০
	মোট খরচ			৪৮২৫.০০
	বছর প্রতি খরচ (৮ বছর টেকসই হবে)			৬০৩.১৩
খ	ইফকাস নেট ও মাচা			
	ইফকাসের খাঁচা তৈরির নাইলন নেট	২২ মি.	৩২.০০	৭০৪.০০
	খাঁচার নেট সেলাইয়ে দর্জি মজুরি			৩০০.০০
	মাচা তৈরির জন্য, বাঁশ, দড়ি, সুতা, সবজি বীজ/চারা ইত্যাদি খরচ			৩০০.০০
	মোট নেট ও মাচা তৈরি বাবদ খরচ			১৩০৪.০০
	বছর প্রতি খরচ (৩ বছর টেকসই হবে)			৪৩৪.৬৭
গ	ইফকাস তৈরির অবচয় খরচ			
	বছর প্রতি ইফকাস গঠন খরচ			১০৩৭.৮০
	চার মাসের জন্য প্রতি ইফকাস গঠন খরচ			৩৪৫.৯৩
ঘ	ইফকাস পরিচালনা খরচ			
	তেলাপিয়ার পোনা	৯০০টি	১.০০	৯০০.০০
	তেলাপিয়ার ভাসমান খাদ্য	৫৪ কেজি	৫০.০০	২৭০০.০০
	মোট পরিচালনা খরচ			৩৬০০.০০
	সর্বমোট খরচ (গঠন + পরিচালনা)			৩৯৪৫.৯৩
ঙ	ইফকাস থেকে লাভ			
	তেলাপিয়া উৎপাদন	৪৫ কেজি	১১০.০০	৪৯৫০.০০
	সবজি উৎপাদন	২৫ কেজি	৩০.০০	৭৫০.০০
	সর্বমোট লাভ			৫৭০০.০০
চ	প্রতি ইফকাসের নীট লাভ			
	সর্বমোট লাভ - সর্বমোট খরচ			১৭৫৪.০৭
ছ	লাভ-খরচ অনুপাত			
	সর্বমোট লাভ/সর্বমোট খরচ			১.৫

উপসংহার (Conclusion)

এ গবেষণা প্রকল্পটি এখনও চলমান যা ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এখানে অংশগ্রহণমূলক অ্যাকশন রিসার্চের মাধ্যমে এএনএপির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম থেকে দরিদ্র ও হতদরিদ্র কৃষকদের জন্য ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়াকালচার - এগ্রিকালচার সম্পর্কিত ইফকাস বাংলাদেশ প্রথম নতুন প্রযুক্তি হিসেবে উদ্ভাবিত হলো। ইতোমধ্যে কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এ প্রযুক্তিটি তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে এএনএপির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এটি নেপালে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং চাষিরা ইতোমধ্যে সুফল পাচ্ছে। আশা করা যায় এ চলমান গবেষণার শেষে এর সার্বিক দিক, বিশেষ করে পুকুরে কার্প চাষসহ আর্থিক খরচ-লাভ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণের পর ইফকাসের সম্প্রসারণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে যাতে করে ইফকাস শুধু স্থায়ী পুকুরের জন্যই নয় বরং এটি বহুমালিকানা পুকুর, খাল, বিল, নদী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধ এলাকা ইত্যাদিতে ব্যবহার করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১অধ্যাপক, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
ই-মেইল: mahaque1974@yahoo.com
২প্রফেসর, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়
[illegible], ঢাকা

ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ উপকরণ ব্যবহার ঃ মৎস্য সম্পদের ওপর বিরূপ প্রভাব
Use of Harmful Fishing Gears : Impact on Fisheries Resource

মোঃ জাহেদুল হাসান[১], ড. মাসুদ হোসেন খান[২] ও মোহাম্মদ জাহের[৩]

Abstract

Fish production from inland openwater especially from river is showing a declining trend over the past couple of years because of many natural and anthropological reasons. Over exploitation by using many kinds of detrimental fishing gear in riverine habitat is one of the most important reason among them. Fishing gears like Behundi Jal, Chor Ghera Jal, Katha Ber Jal etc. are capable of capturing a wide variety of fish species and thus harming the riverine biodiversity. Again fish trap such as Pangas Chai involved in fishing of under sized fry of Pangas *(Pangasius pangasius)* is a terrible threat for the existence of the species. During peak season (April-June), huge incidence of killing Pangas fry occurs by a Pangas Chai where more than 100 kg was killed in one haul of 8 to 10 hours duration.

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলসম্পদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রাপূর্ণ। বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর, যার মধ্যে ০.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর নদী ও মোহনা, ২.৭ মিলিয়ন হেক্টর প্লাবনভূমি, ০.১ মিলিয়ন হেক্টর বিল এবং ০.০৫ মিলিয়ন হেক্টর কাপ্তাই লেক। এ সুবিশাল জলরাশির মৎস্যসম্পদ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং খাদ্যাভাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর মাটি ও পানি এবং সুবিশাল প্লাবনভূমি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে ২০১১-১২ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ছিল ২৬.৮৩ লক্ষ মে.টন। তন্মধ্যে নদী ও মোহনা থেকে উৎপাদন ছিল ১.৪৬ লক্ষ মে.টন। আমাদের দেশে নদীগুলো থেকে এক সময় পর্যাপ্ত মাছের উৎপাদন হতো, যা বর্তমানে নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে নিম্নমুখী। মনুষ্যসৃষ্ট যে সমস্ত কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন নিম্নমুখী তার মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার।

বাংলাদেশের প্রায় সব নদ-নদী মৎস্যসম্পদে বৈচিত্র্যময়। এ মৎস্যসম্পদ আহরণে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা মূলত জেলেদের ইচ্ছা ও অর্থনৈতিক সংগতি, মাছের প্রাচুর্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া কিছু কিছু মৎস্য আহরণ উপকরণের ব্যবহার, আড়তদার বা জেলেদেরকে ঋণ দানকারী ব্যবসায়ী/দাদনদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ক্ষেত্রে জেলেদের ইচ্ছার তেমন কোন মূল্য থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক লাভের জন্য যে সমস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (ফিশিং গিয়ার) ব্যবহৃত করা হয় তা নদীর নিজস্ব পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ সমস্ত ক্ষতিকর ফিশিং গিয়ার ব্যবহারের ফলে নদীর মৎস্যসম্পদের প্রবেশন (recruitment) মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে নদীর মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত উপকরণাদির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারের সময় ইত্যাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ উপকরণসমূহ
(Harmful Fishing Gears)

আমাদের দেশের নদ-নদীতে মৎস্য আহরণের জন্য ব্যবহৃত উপকরণের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই নদীর জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। যে সমস্ত ফিসিং গিয়ার নদীর জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ তার মধ্যে বেহুন্দি জাল (Set Bag Net), কাঁথা বেড় জাল (Small Mesh Seine Net), চরাঘেরা জাল (Barrier Net), ভেসাল জাল (Lift Net), কারেন্ট জাল (Monofilament Gill Net), পাঙ্গাস চাই ইত্যাদি অন্যতম। নিম্নে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত ক্ষতিকর উপকরণাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. বেহুন্দি জাল (Set Bag Net)

এটি অত্যন্ত প্রসারিত ব্যাগের মুখবিশিষ্ট একটি থলে সদৃশ জাল যা গোড়ার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে একটি ব্যাগের আকার ধারণ করে যার দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৩০ মি পর্যন্ত হতে পারে। এ ধরনের জালে মুখের দিক হতে শেষাংশের দিকে জালের ফাঁসের আকার (mesh size) ক্রমশ ছোট হয়ে কড প্রান্তে (cod end) শূন্য মেস (zero mesh) বিশিষ্ট কাপড় সংযুক্ত থাকে যা

ছবি : বেহুন্দি জাল

নির্বিচারে সকল আকারের মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের জাল সাধারণত নদীর এমন স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে জোয়ার-ভাটার পানির টান বেশি। বাংলাদেশের নদ-নদীতে বেহুন্দি জাল সাধারণত নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। বেহুন্দি জাল এর কড বা শেষ প্রান্তে ফাঁসের আকার (mesh size) খুব ছোট হওয়ার কারণে এ জাল থেকে অত্যন্ত ছোট আকারের মাছের পোনা এমন কি চিংড়ির পোনাও রেহাই পায় না। এ ধরনের একটি ছোট আকৃতির জালেও ৬-৮ ঘণ্টার টেইয় ৫-২০ কেজি বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে যার বেশির ভাগই ধরার উপযুক্ত আকারের (allowable size) নয়। বেহুন্দি জাল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় মেঘনা নদীর নিম্নাংশের এলাকা যেমন-চাঁদপুর, হাইমচর, চরভৈরবী, চর লুধুয়া, চর আলেকজান্ডার, রামগতি, মনপুরা, হাতিয়া, নৌলতখান ইত্যাদি এলাকায়।

২. কাঁথা বেড় জাল (Fine Mesh Seine Net)

এটি এক ধরনের বেড় জাল যার মেস সাইজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মশারির মেসের চেয়েও ছোট। তাই কোথাও কোথাও একে মশারি বেড় জাল বলে। এ ধরনের জাল সাধারণত ২০০-৫০০ মি পর্যন্ত লম্বা এবং ৫-১০ মি প্রশস্ত হয়। বাংলাদেশের সব নদ-নদীতেই এ ধরনের জালের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ২-৪ ঘণ্টার টেইয় এ ধরনের জালে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৫-২০ কেজি মাছ ধরা পড়ে। এ ধরনের জাল সব ঋতুতেই কম বেশি ব্যবহৃত হয়।

ছবি: ক্ষতিকর বেড় জাল

৩. চরমেরা জাল (Barrier Net)

নদীর অপেক্ষাকৃত কম গভীরতাসম্পন্ন স্থান যা ভাটার সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উন্মোচিত হয় সে সকল স্থানে এ ধরনের জাল ব্যবহৃত হয়। জোয়ারের সময় পানি যখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে তখন নদীর তীরবর্তী একটি নির্দিষ্ট স্থান (৫০০-১,০০০ মি দীর্ঘ) অনেকগুলো বাঁশের খুঁটির সাথে শূন্য মেসবিশিষ্ট (কাপড়ের মত) জাল সংযুক্ত করে ঘিরে ফেলা হয়। পরবর্তীতে ভাটার সময় পানি নেমে গেলে ঐ বেষ্টনীর ভেতর আটকে পড়া মাছসমূহ ধরা হয়। ফলশ্রুতিতে নদীতে বিদ্যমান সব আকারের মাছ কম-বেশি ধরা পড়ে বলে নদীর জীববৈচিত্র্যের ওপর এ ধরনের জালের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ধরনের জাল দ্বারা ৬-৮ ঘণ্টার চেইয় বিভিন্ন আকৃতির এবং প্রজাতির ১০-৮০ কেজি মাছ ধরা হয়। চাঁদপুর, হাইমচর, চরভৈরবী, চর লুধুয়া, চর আলেকজান্ডার, মনপুরা, হাতিয়া ইত্যাদি এলাকায় এ ধরনের জাল বেশি ব্যবহৃত হয়।

ছবি: চরমেরা জাল

৪. ডেশাল জাল (Lift Net)

নদী-তীরবর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে নির্মিত বাঁশের মঞ্চ থেকে বিকোণাকৃতির বাঁশের ফ্রেমে শূন্য মেসবিশিষ্ট জাল জড়িয়ে এ ধরনের ফিশিং গিয়ার প্রস্তুত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৌকা থেকেও এ ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের সব নদ-নদীতেই বর্ষা মৌসুমে (জুন-অক্টোবর পর্যন্ত) ডেশাল জালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের জাল দ্বারা বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Species-SIS) ধরা হলেও এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির বড় মাছের পোনা ধরা পড়ে বলে নদীর জীববৈচিত্র্যের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।

৫. কারেন্ট জাল (Monofilament Gill Net)

অতি সূক্ষ্ম মনোফিলামেন্ট প্লাস্টিক সুতা দ্বারা এ ধরনের জাল প্রস্তুত করা হয়। দেশের সব নদীতেই কারেন্ট জালের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। স্থানভেদে এ ধরনের জালের মেস সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমাদের দেশে মূলত মেঘনা ও পদ্মা নদীতে ভাটকা মৌসুমে ছোট মেসবিশিষ্ট (সর্বোচ্চ ২৫ মিমি) কারেন্ট জালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে যে সব কারেন্ট জাল ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগেরই মেস সাইজ ৩৩ মিমি এর কম। এ সমস্ত কারেন্ট জাল নিয়ে যে সব প্রজাতির মাছ ধরা হয় তা বেশির ভাগের আকারই ধরার উপযুক্ত আকারের (allowable size) চেয়ে ছোট। তাই ছোট মেসের কারেন্ট জাল নদীর জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৬. পাঙ্গাস টাই (Pangas Trap)

এটি এক ধরনের মৎস্য আহরণ ফাঁদ। এ ধরনের ফাঁদ প্রধানত দেশি পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*) মাছের পোনা ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাঙ্গাস টাই বেলুন আকৃতির ২.৫-৩.০ মিটার লম্বা এবং ১.৫-২.০ মি ব্যাসবিশিষ্ট বাঁশের চাটাই তৈরি যাতে একটি ভাঙ্গ বিদ্যমান। পাঙ্গাসের পোনাকে আকৃষ্ট করার জন্য আটা, খৈল, গুটকি, চিটাগুড় ইত্যাদি দ্বারা মণ্ড তৈরি করে এ ধরনের ফাঁদের ভেতরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

সারণি: বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ফিশিং গিয়ারের বিস্তৃতি এবং এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য প্রজাতির তালিকা

স্থানীয় ও ইংরেজি নাম	ধরন	বিস্তৃতি	ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাতি
বেহুন্দি জাল Set Bag Net	জাল (Net)	মোহনপুর, এখলাসপুর, আমিরাবাদ, আনন্দবাজার, চাঁদপুর, পুরানবাজার, নীলকমল, চরভৈরবী, হাইমচর, কালিগঞ্জ, চরদুখিয়া, চরআলেকজান্ডার, রামগতি, হাতিয়া, মনপুরা	চাপিলা, চেউয়া, বেলে, সিলন, বাটা, ফেলা, চিংড়ি, গাউরা, জাটকা ইত্যাদি
মশারি বেড়জাল Small Mesh Seine Net	জাল (Net)	পদ্মা ও মেঘনা নদীর সব স্থানে	পোয়া, চাপিলা, ফাইসা, রিটা, বেলে, বাচা, গাউরা, চেউয়া, চিংড়ি, ইলিশ ইত্যাদি
চরঘেরা জাল Barrier Net	বেড়া (Barrier)	চাঁদপুর, হাইমচর, হাতিয়া, মনপুরা	চাপিলা, চেউয়া, বেলে, সিলন, বাটা, ফেলা, গাউরা, চিংড়ি, জাটকা ইত্যাদি
কারেন্ট জাল Small Mesh Monofilament Gill Net	ফাঁস জাল (Gill Net)	পদ্মা ও মেঘনা নদীর সব স্থানে	প্রধানত ইলিশ ও জাটকা
পাঙ্গাস চাঁই Fish Trap	ফাঁদ (Trap)	চাঁদপুর, হাইমচর, হাতিয়া, মনপুরা	প্রধানত পাংগাস

ছবি: পাঙ্গাস চাঁই

ছবি: পাঙ্গাস চাঁই দ্বারা ধৃত পাঙ্গাসের পোনা

মেঘনা নদীর নিম্নাংশে চাঁদপুর, হাইমচর, রামগতি, মনপুরা, হাতিয়া ইত্যাদি এলাকায় মধ্য এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত চাঁই দ্বারা পাঙ্গাসের পোনা নিধনের মহোৎসব চলে। উল্লিখিত এলাকাগুলোতে সর্বোচ্চ মৌসুমে (মে মাস) ছোট বড় প্রায় ৫০০টি পাঙ্গাস চাঁই ব্যবহার করে প্রতিদিন গড়ে ২০.০ কেজি হিসেবে অন্তত ১.০ টন পাঙ্গাসের পোনা নিধন করা হয়। এভাবে একটি মৌসুমে কমপক্ষে প্রায় ১০.০ লক্ষ পাঙ্গাস পোনা নিধন হচ্ছে যা রক্ষা করতে পারলে প্রায় ৫-৬ হাজার টন অতিরিক্ত দেশি পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*) উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

উপসংহার (Conclusion)

আবহমান কাল থেকে নদীমাতৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে পরিপূর্ণ। যদিও বিগত কয়েক দশক ধরে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে মৎস্যখাতের অবস্থা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত। প্রচলিত আইন না মানার কারণে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক ফিশিং গিয়ার দ্বারা মুক্ত জলাশয়গুলোতে অবাধে মৎস্য আহরণ এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্ত ও বিলুপ্তির পথে। মুক্ত জলাশয়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিদ্যমান মৎস্য আইন অনুসরণ করে সঠিক মৎস্য আহরণ উপকরণ ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।

[1]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
[2]মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
[3]মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে চলমান কার্যক্রম
Ongoing Programme to Control of Formalin Abuse in Fish

ড. জি এম শামছুল কবীর[১] ও শেখ মনিরুল ইসলাম[২]

Abstract

Formalin is a kind of preservatives generally used in different works such as disinfectant, in wooden industries etc. It is unfortunate that some dishonest fish traders sometimes use formalin to preserve fish as to make fish stiff and keep them fresh long time. Formalin preserved fish is very dangerous for human health due to its toxic and volatile nature. It may cause various diseases like skin disease, diarrhoea, respiratory, blindness, kidney etc and even cancer. For the sake of human health, it is obligatory to stop the abuse of formalin as fish preservative. So, mass awareness campaign for the fish traders, consumers and other stakeholders regarding toxic and injurious effect of formalin abuse in fish should be carried out. In this circumstance, the present democratic government has taken an initiative to stop abuse of formalin in fish. As part of it Department of Fisheries is implementing a project namely 'Control of Formalin use in Fish Preservation and Mass Awareness Campaign'. Rampant formalin abuse in fish has significantly decreased in the country due to implementation of different activities of the project.

প্রাকৃতিকভাবে মাছ একটি অতি পচনশীল খাদ্য। আহরণের পর সঠিক সংরক্ষণ ও পরিচর্যায় মাছের পচনের গতিকে হ্রাস করা যায় এবং ভোক্তার হাতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পৌঁছে দেয়া যায়। কতিপয় অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ী মাছের বাহ্যিক চেহারাতে টাটকাভাব বজায় রাখা ও দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ করার জন্য মাছে ফরমালিন ব্যবহার করে। প্রাথমিকভাবে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ে জনমনে উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ফরমালিন অপব্যবহার রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মাছে ফরমালিন মেশানোর প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফরমালিন একটি রাসায়নিক যৌগ যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফরমালিনযুক্ত মাছ খেলে চর্মরোগ, কিডনি, ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়, এমনকি ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলশ্রুতিতে, জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং মৎস্যচাষে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

নিরাপদ ফরমালিনমুক্ত মাছ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফরমালিনের অপব্যবহার কঠোরভাবে প্রতিহত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ফরমালিন ব্যবহারের অপকারিতা, ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ অবহিত করে এর ব্যবহার প্রতিরোধে মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, বাজার/আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ক্রেতা, বিক্রেতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফরমালডিহাইড বা মিথানল গ্যাসের ৪০% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলা হয়। ঐ মিথানল গ্যাসকে পানিতে চালনা করে ৩০-৪০% জলীয় দ্রবণ বা ফরমালিন উৎপন্ন করা হয়। ফরমালিন এক ধরনের কার্বনাইল যৌগ এবং একটি কার্যকরি জীবাণুনাশক। প্রায় ৫০০°সে তাপমাত্রায় উত্তপ্ত সিলভার অথবা কপার প্রভাবকের উপর দিয়ে মিথানল বাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণকে চালনা করলে মিথানল আংশিক জারিত হয়ে ফরমালডিহাইড ও জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয়। ফরমালডিহাইড সাধারণ তাপমাত্রায় বর্ণহীন গ্যাস, তীব্র গন্ধযুক্ত এবং সহজ দাহ্য।

ফরমালিনের ব্যবহার
(Uses of Formalin)

ফরমালিন অপব্যবহার রোধে নানাবিধ কাজে এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের Champion Encyclopedia এর তথ্যমতে বিশ্বব্যাপী মোট উৎপাদিত ফরমলডিহাইডের শতকরা ৬০ ভাগ কাঠ এবং কনস্ট্রাকশন কারখানায় ব্যবহৃত হয়। শতকরা ৩০ ভাগ ফরমালিন ফেনটাইরাইথ্রিটল, হেক্সামিথাইল ইনটিট্রামইন, বিউটানিডিয়ল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা দ্বারা অন্যান্য বাণিজ্যিক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। শতকরা ৭ ভাগ ফরমালডিহাইড থার্মোপ্লাস্টিক রেজিন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং শতকরা ২ ভাগ পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। শতকরা ১ ভাগ ফরমালডিহাইড প্রিজারভেটিভ অ্যান্টিটিক হিসেবে সাবান, লোশন, শ্যাম্পু তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়। বিশ্বব্যাপী মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপকরণ হচ্ছে ফরমালডিহাইড। তবে মৃতদেহ সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার শতকরা ১ ভাগেরও কম। ফরমালডিহাইড ল্যাবরেটরিতে, শিল্পোৎপাদনে, রসায়নশিল্পে, পার্টিকাল বোর্ড, প্লাইউড, ফাইবার বোর্ড, আঠা, কাগজের কোটিং, স্থায়ী প্রেস ফেব্রিক ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারিতে জীবাণুমুক্তকরণে ক্ষুদ্রাকনাশক এবং জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাছের প্রোটোজোয়া এবং ক্ষুদ্রাকজনিত রোগের চিকিৎসায়ও ফরমালিন ব্যবহৃত হয়।

মাছে ফরমালিন এর অপব্যবহার
(Abuse of Formalin in Fish)

কতিপয় অসাধু ও লোভী ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় মাছকে বাজারে দীর্ঘক্ষণ সতেজ ও টাটকা রাখার উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বাজারের মাছ বিক্রেতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে,

মাছকে সতেজ রাখার জন্য ড্রাম কিংবা বালতিতে পানির সাথে ফরমালিন মিশ্রিত করে মাছকে অল্পক্ষণ চুবিয়ে রাখা হয় কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে ইনজেকশন সিরিঞ্জ দিয়ে মাছের পেটে অর্থাৎ নাড়িভুঁড়িতে ফরমালিন ঢুকানো হয়। আরও জানা যায় যে, মাছ সংরক্ষণের জন্য ফরমালিন মিশানো হয় বরফ পানিতে। মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও হুমকিস্বরূপ।

মানবদেহে ফরমালিনের ক্ষতিকর প্রভাব
(Detrimental Effect of Formalin in Human Body)

জনস্বাস্থ্যের জন্য ফরমালিন একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর যৌগ। দীর্ঘমেয়াদে ফরমালডিহাইডের সংস্পর্শে কাজ করলে হজের লিম্ফোসাইট পরিবর্তন, নাসিকা চিস্যুতে মিউটেটিভ প্রভাব ইত্যাদি ঘটতে পারে। ফরমালিন নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের নাকের প্রদাহ, শ্বাস কষ্ট এবং চর্ম প্রদাহ, অ্যাজমা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। তবে স্বল্প সময় সংস্পর্শে আসার কারণে এগুলো কাটিয়ে ওঠা যায়। ফরমালডিহাইড এর উচ্চ মাত্রায় অথবা দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শ মানবদেহের জন্য সম্ভাব্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উদ্দীপক। ফরমালডিহাইডের সংস্পর্শে যারা কাজ করেন তাদের নাজাল ক্যান্সার, নাসোফেরিঞ্জিয়াল ক্যান্সার এবং লিউকোমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবচ্ছেদবিদ (অ্যানাটমিস্ট) এবং অ্যাম্বলমার (যারা মৃতদেহ সংরক্ষণের কাজ করে) পেশার যারা ফরমালিন নিয়ে কাজ করেন তাঁর সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় লিউকোমিয়া এবং ব্রেন ক্যান্সারের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। ফরমালিন ফুসফুস ক্যান্সারের জন্যও দায়ী। বিভিন্ন গবেষণায় ফরমালডিহাইডকে জিনের বিবর্তনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের ফরমালিন নিয়ে কাজ করা নিষেধ। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুর অস্বাভাবিকতা, গর্ভপাত, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং প্রসবজনিত অন্যান্য জটিলতা দেখা দেয়। অধিকন্তু স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহের পাশাপাশি ফরমালিন মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণের কারণে মানুষ পরিপাকতন্ত্র, কিডনী সমস্যা এবং নানাবিধ জটিলতা যা গেস্ট্রো-ইন্টেস্টাইনাল ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিলতায় ভুগতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি
(Mass Awareness Creation Against Abuse of Formalin)

মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে সর্বসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের এ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক ১,০০০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, স্থানীয় মৎস্য বাজার বা মৎস্য আড়ৎ বা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, মাছ প্যাকিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ এসকল সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করেন। গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০ জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মাছ বিক্রেতা ও আড়তদার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্যজীবী প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এবং মৎস্য অধিদপ্তরের

ছবি: মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ফরমালিনের অপব্যবহার রোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হচ্ছেমাছে ফরমালিন শনাক্তকরণ, সংরক্ষণের জন্য মাছে ফরমালিন প্রয়োগের ক্ষতিকর প্রভাব ও ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উপায়, নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি। সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৪ টি জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ৎ ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এর ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, মাছ প্যাকিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রমুখ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশন এর যৌথ উদ্যোগে ফরমালিনের অপব্যবহার ও এর প্রতিরোধ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও গবেষকবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

ছবি: মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন

ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স
(Formalin Detection Digital Kitbox)

মৎস্য অধিদপ্তরের 'মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প' এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় ১টি করে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল ও স্প্রে পদ্ধতির অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিট বক্স সরবরাহ করা করা হয়েছে। ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল স্প্রে পদ্ধতিতে নিমুভাগে এই কিটবক্স

ছবি: ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

০ (শূন্য) হতে ৩৪ পিপিএম মাত্রা পর্যন্ত সহজেই ফরমালিন শনাক্ত করতে পারে। এর রেজুলেশন হচ্ছে ০.০১ পিপিএম এবং -২০°সে হতে +৪০°সে তাপমাত্রা পর্যন্ত কার্যকরি। এই কিটবক্স অত্যন্ত ব্যবহার উপযোগী এবং সহজেই বহনযোগ্য (ওজন মাত্র ১৭০ গ্রাম)।

মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন, জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সামরিক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, এসিআই, রোটারী ক্লাব ও বিভিন্ন চেইন শপিং মল একই ধরণের ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স সংগ্রহ করে ফরমালিন বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরই সর্বপ্রথম ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স সংগ্রহ করে এবং যার মাধ্যমে যে কোন মাত্রায় ফরমালিন শনাক্ত সম্ভব হচ্ছে

ছবি: ফরমালিন শনাক্তকারী ডিজিটাল কিটবক্স

ফরমালিন বিরোধী মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা (Mobile Court Operation)

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ফরমালিন শনাক্তকরণ অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিটবক্সের মাধ্যমে এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন, র‍্যাব ও পুলিশ প্রশাসন এর সহায়তায় বিভিন্ন মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ৎ, শপিং মল ইত্যাদিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে

এ প্রকল্পের সহায়তায় দেশব্যাপী এ পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৭,৯৬৫ টি এবং ঢাকাস্থ মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ এ ১৯১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৬.৮৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে, ৬ জনকে ১ মাস করে জেল দেয়া হয়েছে এবং ৮.৮৯ টন মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এধরনের উদ্যোগ ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ছবি: ঢাকাস্থ মৎস্য বাজারে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ফরমালিনমুক্ত উপজেলা/বাজার ঘোষণা (Declaration of Formalin Free Upazila/Market)

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলা ও কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলাকে মডেল হিসেবে ফরমালিনমুক্ত

ছবি: ঢাকাস্থ মৎস্য বাজারে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

উপজেলা ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও ঢাকা বিভাগের প্রতিটি জেলার একটি উপজেলাকে অতিসত্বর ফরমালিনমুক্ত ঘোষণা করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, এফবিসিসিআই ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ৩৪টি বাজারকে ফরমালিনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন চেইন শপিং মল এধরনের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিট সংগ্রহ করে এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব চেইন শপিং মলসমূহকে ফরমালিনমুক্ত ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচিকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ফরমালিনের আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (Import, Sale and Controlled use of Formalin)

ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ফরমালিন আমদানি, ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করেছে। ফরমালিন আমদানির আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে, ফরমালিন আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা রেজিস্টারগুলো নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন; ফরমালিন অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

স্থানীয় উদ্যোগে করণীয় পদক্ষেপসমূহ (Steps to be Taken Locally)

বাজারে ফরমালিনমুক্ত মাছ প্রাপ্তির বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১) সকল স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা;
(২) ফরমালিনের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কিটবক্স সরবরাহ করা;
(৩) প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে সমন্বিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা;
(৪) ফরমালিন ব্যবহারকারী ও ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি;
(৫) স্থানীয়ভাবে মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ;
(৬) ব্যাপক প্রচারণার জন্য লিফলেট, পোস্টার, ফেস্টুন, বুকলেট ইত্যাদি বিতরণ;
(৭) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ;
(৮) বিভিন্ন বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন এবং
(৯) ফরমালিনের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা রেখে আইন সংশোধন।

ছবি: ফরমালিন ব্যবহার প্রতিরোধে মৎস্য আড়তদারদের অঙ্গীকার

ফরমালিন অপব্যবহার বিরোধী আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা (Obstacles Against Formalin Abuse Campaign)

মাঠ পর্যায়ে ফরমালিন অপব্যবহার বিরোধী আন্দোলন সফল করতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নরূপ:

- বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং কোন কোন সংস্থার এ বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল না হওয়া,
- ফরমালিন বিষয়ে গবেষণাভিত্তিক তথ্যের অভাব,
- মানদন্ড নির্ধারণ ব্যতিরেকে ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষণা দেওয়া এবং পরবর্তীতে যথাযথ তদারকি না করা,
- অসাধু ব্যবসায়ীদের ফরমালিন শনাক্তকরণ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও অপপ্রচার;
- উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা এবং ফরমালিনের অপব্যবহারের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অপ্রতুলতা।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্য অধিদপ্তরের 'মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প' বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারণের মধ্যে মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে অনেকাংশে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অসাধু মাছ ব্যবসায়ীদের মাছে ফরমালিন মিশিয়ে বাজারজাতকরণ আশাতীতভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফরমালিনমুক্ত নিরাপদ মাছ প্রাপ্তিতে এ প্রকল্পের অবদান দৃশ্যমান হয়েছে। উল্লেখ্য, খাদ্যসামগ্রীতে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। দেশের সকল মানুষের জন্য মাছসহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কার্প ও মলার মিশ্রচাষ ঃ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের সহজ উপায়
Carp-Mola Polyculture : A Simple Endeavour to Ensure Family Nutrition

ক্ষিরোদ কুমার পাল* ও মোঃ ফেরদৌস আলী*

Abstract

Mola *(Amblypharyngodon mola)*, vitamin-A and micronutrient rich, small indigenous fish species (SIS) was usually found everywhere in Bangladesh. Now a day, this fish is not easily found due to various reasons. Carp-mola polyculture technology of WorldFish Center in collaboration with DoF was successfully demonstrates in ponds and rice field at Shajahanpur Upazila, Bogra. Before this intervention, the evidence of mola culture in that locality was absent. Results of carp-mola pond demonstration showed remarkable increase in overall mola production and as well as income of contact farmers and technology adapters. The sustainability of this technology largely depends on overcoming some challenges such as ensuring mola brood supply, trained up farmers and easy transportation system. The article ensures eventually that this technology will contribute some sorts of supports to conserve our endangered mola species. Simultaneously, it may be a grandiour source of family nutrition for marginal and poor people.

বাংলাদেশের মৎস্যচাষের পরিধি বর্তমানে ক্ষুদ্র চাষি থেকে শুরু করে কর্পোরেট মৎস্য চাষি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এক সময় মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম নির্দিষ্ট শ্রেণিগোষ্ঠীর ও পেশাজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবসাকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পেশা হিসেবে দেখা হতো। এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ ও বাণিজ্যিকীকরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের পুষ্টি-চাহিদা ও আমিষ প্রাপ্যতার জন্য সুযোগ ও সামর্থ্য দুই-ই রয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক চাষি ও গরীব সাধারণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর সহজ উপায় হলো 'কার্প-মলা মিশ্রচাষ প্রযুক্তি'র সফল প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ।

প্রাকৃতিক মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে অন্যান্য মাছের পাশাপাশি ছোট মাছ বিশেষ করে মলা, ঢেলা, নরকিনা প্রভৃতির উৎপাদন নানা কারণে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ছোট মাছ উৎপাদনের জন্য তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এখনও চাষি পর্যায়ে চাষের জন্য প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হয়নি। অধিকন্তু, বিগত কয়েক বছরে মাছ চাষ ও সংরক্ষণে গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়নি। জলাশয় সম্পূর্ণ সেচে বা বিষ প্রয়োগে মাছ মারা, ছোট মাছের বংশবৃদ্ধির প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এছাড়াও প্লাবনভূমি ফসলের জন্য দখল, ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে মাছ পুরোপুরি নিধন প্রভৃতি কারণেও ছোট মাছের হ্রাস হয়েছে। বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে পুকুর এবং ধানক্ষেতে কার্প জাতীয় মাছ ও ছোট মাছ (মলা, ঢেলা, নরকিনা) একত্রে সফলভাবে চাষ করা যায়। ছোট মাছ কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদনকে ব্যাহত করে না, বরং তাদের একত্রে চাষ সামগ্রিক উৎপাদন, আয় এবং পারিবারিকভাবে মাছ খাওয়ার পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয় (Roos, *et al.*, ২০০৬; Wahab *et al.*, ২০০৮)। যদিও বিষয়টি চাষি পর্যায়ে নতুন কিন্তু কিছু সংখ্যক অগ্রসর চাষি ইতোমধ্যেই তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টারের 'ছোট মাছ ও পুষ্টি প্রকল্প' এর আর্থিক সহযোগিতায় মলা মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কার্প-মলা চাষে একজন মজনু'র সফলতা
(Success Story of Maznu as Carp-Mola Farmer)

মলা মাছ চাষে ব্যাপক সফলতার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হয়েছেন বগুড়ার শাজাহানপুরের চোপীনগর গ্রামের আব্দুল মজিদের পুত্র মহিবুর রহমান মজনু। শুধু মলা চাষ নয়, ব্যাপক চাহিদার কারণে এর উৎপাদন করে বিক্রি করছেন তিনি। ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টারের কারিগরি সহায়তায় এবং শাজাহানপুর উপজেলা মৎস্য অফিসের তত্ত্বাবধানে গত ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ২০ শতাংশ আয়তনের একটি ছোট পুকুরে পরীক্ষামূলকভাবে ২ কেজি মলা ব্রুড মজুদ করা হয়। 'কার্প-মলা মিশ্র চাষ প্রকল্প' এর আওতায় পুকুরে ব্রুড মজুদ করার মধ্য দিয়েই মলা মাছ চাষ শুরু করেন মজনু। কার্প জাতীয় মাছ চাষ ও রেণু উৎপাদনে দক্ষ মজনু মিয়া মলা চাষেও অর্জন করেন অভাবনীয় সাফল্য। মলা ব্রুড মজুদের পর ৯ মাসে ৩ দফা ডিম ছাড়ার চোপীনগর এলাকায় এ পর্যন্ত অন্তত শত কেজির অধিক মলা মাছ উৎপাদন হয়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে মলা চাষির সংখ্যাও। মলা মাছ প্রচুর ভিটামিন 'এ' এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ হওয়ায় বাজারে এর চাহিদা এবং মূল্যও অনেক।

ছবি: উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংযোগ চাষি মজনুর মলা চাষের সফলতা পর্যবেক্ষণ করছেন

মলা চাষি মজনু মিয়া জানান, কার্প-মলা মিশ্রচাষে বাড়তি খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় না। অতিরিক্ত পরিচর্যারও প্রয়োজন পড়ে না। এ ছাড়া কার্প মাছের উৎপাদনে এর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না; বরং বাড়তি আয়ের সুযোগ আছে। ইতোমধ্যে কয়েক ডজন নতুন মলা চাষি মজনুর নিকট থেকে 'মলা ব্রুড' সংগ্রহ করে মলা চাষ শুরু করেছেন।

মলা মাছের পুষ্টিগুণ (Nutritious Value of Mola)

মলা মাছে প্রচুর ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও আয়রন থাকে। ছোট মাছের ক্ষেত্রে প্রোটিন বা আমিষ অপেক্ষা ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বেশি থাকে। বিশেষ করে মলাতে অণুপুষ্টি প্রাপ্যতার সম্ভাবনা অধিক, এতে সর্বোচ্চ ২৬৮০ μg RE/100 g raw fish (SD=220, n=7) পর্যন্ত ভিটামিন থাকে। নিম্নে তুলনামূলক অণুপুষ্টি দেখানো হলো।

সারণি: বিভিন্ন ছোট মাছের অণুপুষ্টির পরিমাণ

প্রজাতি	বৈজ্ঞানিক নাম	ভিটামিন এ RE/১০০ gm raw fish	Fe (mg/100 g raw fish)	Ca (mg/100 g raw fish)
মলা	*Amblypharyngodon mola*	>১৫০০	৫.৭±০.২	৮৫৩±১৮০
চান্দা	*Parambassis ranga*	১০০-৫০০	১.৪±০.৭	৭৫৫±২৮৪
দারকি	*Corica soborna*	<১০০	২.৬±১.৮	৮৭১±১৫৭
পুঁটি	*Puntius sophore*	<১০০	৩.০±০.৯	১১৭৫±২২৬

মলা মাছের দেহের শতকরা ৫৯ ভাগ ভিটামিন চোখ তথা মাথায় থাকে। ছোট মাছে ভিটামিন-এ সাধারণত রেটিনল ও ডিহাইড্রোরেটিনল আইসোমার হিসেবে থাকে। মলা মাছে প্রাপ্ত-এ ভিটামিনের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ ডিহাইড্রোরেটিনল হিসেবে থাকে যার জৈবিক কার্যক্ষমতা প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ।

মলা মাছ ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা
(Mola and Nutrition Related Education)

খাবারে মলা মাছের অধিক পরিমাণ ব্যবহার গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মা এবং শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ এদের মাথা, অঙ্গ ও হাড় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ, আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ। সাধারণত এ মাছ খাওয়ার জন্য তৈরির (কাটা, বাছা, ধোয়া, রান্না) সময় পুষ্টির অপচয় হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রায় ক্ষেত্রে শিশুরা ছোট মাছ গলায় কাঁটা লাগার ভয়ে খেতে চায় না। এ জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে মলা মাছকে প্রক্রিয়াজাত করে শিশুদের গ্রহণ উপযোগী করা প্রয়োজন। দেখা গেছে রান্না করে আধা সিদ্ধ মলা মাছ বেটে খিচুড়ির সাথে মিশিয়ে শিশুকে খুব সহজেই খাওয়ানো যায়।

মলা মাছের উৎপাদন কৌশল
(Method of Mola Production)

১. চাষ উপযোগিতা

- এ মাছ ছোট-বড় সব ধরনের পুকুরেই চাষ সম্ভব। সাথী ফসল হিসেবে এর চাষ লাভজনক।
- মলা বছরে ৩-৪ বার পুকুর, ডোবাতে ডিম দেয়।
- প্রথমবার ডিম দেওয়ার পর থেকে ১৫-২০ দিন পর পর পুকুর থেকে আংশিক মলা মাছ আহরণ করা যায়।
- পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন ঠিক রেখে মলা মাছের বাড়তি উৎপাদন সম্ভব এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো সহজ হয়।

২. পুকুর প্রস্তুতি ও পোনা মজুদ

পুকুর প্রস্তুতির উপর মাছের উৎপাদন নির্ভর করে। পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো কার্প মাছের অনুরূপ। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে মলা সংগ্রহ করে মজুদ করতে হবে। সকালে বা বিকালে ঠান্ডা পরিবেশে পোনা পরিবহন ও মজুদ করা যায়। প্রতি শতাংশে মজুদ ঘনত্ব ১২০-১৪০ টি (মলা ৮০-১০০ টি, রুই ১২ টি, সিলভার কার্প ১০ টি, কাতলা ৬ টি, মৃগেল ১২ টি)।

৩. মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পোনা মাছ ছাড়ার পরের দিন থেকে কার্প জাতীয় মাছ ও মলার দৈহিক ওজনের শতকরা ৩-৪ ভাগ হারে আটা/চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল ২:১ অনুপাতে পুকুরে ব্যবহার করতে হবে। তবে গুণগত মানসম্পন্ন খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ ২৫-৩০% নিশ্চিত করা উচিত। মাছ মজুদের পর প্রতিমাসে ১ বার জাল টেনে মাছের নমুনায়নের মাধ্যমে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

৪. ব্রুড ব্যবস্থাপনা

মজুদকৃত ব্রুডের দেহের ওজনের ৫% হারে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। ব্রুড ব্যবস্থাপনাকালীন পানির রং সবুজ রাখতে হবে।

ছবি: বিদেশি প্রতিনিধিদলের মত বিনিময় সভা

ব্রুড মাছ আহরণের জন্য এমন ফাঁস সাইজের জাল ব্যবহার করতে হবে, যেন প্রাপ্তবয়স্ক মলা মাছ ধরা পড়ে এবং বাকি মাছগুলো জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কাটাই জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। মলা মাছ পুকুরের কিনারা ঘেঁষে ভাসমান লতাপাতায় ডিম দেয়, তাই জলাশয়ে ৫% জলজ উদ্ভিদ থাকা ভাল। প্রজননের এক সপ্তাহ পর পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে ভাসতে দেখা যায়। এ সময় জাল টানা উচিত নয়। এতে পোনা মাছের ক্ষতির আশংকা থাকে।

৫. মলা মাছ আহরণ ও বিক্রয়

মলা মাছ বছরে ৩-৪ বার ডিম দেয়। ডিম ছাড়ার ২-৩ সপ্তাহ পর থেকে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর মলা মাছের আংশিক আহরণ করা প্রয়োজন। পোনা মজুদের ৬ মাস পর কার্প জাতীয় মাছের আংশিক আহরণ করে মাছ বাজারজাত করা যেতে পারে।

৬. পুকুরে মলার ব্রুড সংরক্ষণ

যেহেতু বেশির ভাগ পুকুরই মৌসুমি পুকুর এবং শুধু তলায় সারাবছর কিছুটা পানি থাকে এবং যাতে চাষির সারাবছরই কিছু পরিমাণ মাছ রাখার চেষ্টা করে সেজন্য ব্যবস্থাপনায় সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্য আংশিকভাবে গর্ত বড় করা, চারদিকে জালের বেড়া দেয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ মলা ব্রুড মজুদ রাখার কাজ করতে হবে।

ছবি: বিদেশি অতিথি কর্তৃক পুকুরে মলা ব্রুড অবমুক্তকরণ

কার্প ও মলার মিশ্রচাষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ (Adoption and Extensionof Carp-Mola Poly Culture Technology)

সংযোগ চাষি এবং নতুন মলা চাষির (অ্যাডাপটার) মলা উৎপাদন প্রযুক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে লাগিয়ে ২০১৩ সালে প্রায় পাঁচ শতাধিক কেজি মলা মাছ উৎপাদন করেছেন। উল্লেখ্য ২০১২ সালে বগুড়া এলাকায় কোন মলা মাছের চাষ হতো না। কার্প ও মলার মিশ্রচাষ পুকুর পাড়ে মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টারের পুষ্টি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ নেপাল, মায়ানমার, ভারত ও মালয়েশিয়ার ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের উল্লেখযোগ্যরা হলেন নেপালের চিৎওয়ান এগ্রিকালচার ও ফরেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুনিল রায়, এসডিআইই'র বোর্ড অব ডাইরেক্টর'স সানু কাঞ্চা টিটং, মায়ানমারের ন্যাশনাল মাইফিস প্রজেক্ট এর অ্যাডভাইজার ইউ. খিন মং, ভারতের অদিশা সংস্থার সেক্রেটারি বিভূদন শেঠী, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. উমেশ চন্দ্র গোস্বামী এবং অস্ট্রেলিয়ান পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো লাবা কাঙ্কিন। পরিদর্শন শেষে পুকুর পাড়ে প্রতিনিধি দলটি সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং-এ অংশ নেন। ব্রিফিংকালে তাঁরা বলেন, যে কোন কৃষি প্রযুক্তি চাষি থেকে চাষির কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশে মজুদের ক্ষেত্রে সে কঠিন কাজটিই অনেক সহজভাবে হয়েছে। ফলে গ্রামীণ জীবনযাত্রায় পুষ্টি ও বিলুপ্তপ্রায় মলা উৎপাদনে নব দিগন্তের সূচনা ঘটেছে। কার্প ও মলার মিশ্রচাষ প্রকল্পে সহায়তা করার জন্য প্রতিনিধি দল ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার এবং মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পুকুর প্রদর্শনীতে মৎস্য উৎপাদন কৌশল ও ফলাফল বর্ণনা করা হয়। এতে স্থানীয় কিছু নতুন মাছ চাষি অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের নিজস্ব জলাশয়ে মলা ব্রুড মজুদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ছবি: ওয়ার্ল্ডফিস টিম কর্তৃক পুকুর পরিদর্শন

উপসংহার (Conclusion)

যেহেতু ছোট মাছের মধ্যে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ এবং বিশেষ করে মলা মাছের চাহিদা ও বাজারমূল্য দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই এর বাণিজ্যিক চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কার্প ও মলার মিশ্রচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, পুকুর-দীঘিতে সাধারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মলা মাছের অধিক উৎপাদন সম্ভব। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের খাদ্য ও আয় দুই-ই সংস্থান হবে। পাশাপাশি অপুষ্টি ঘাটতি পূরণকল্পে মলা মাছের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্বশীলতা ও অগ্রগামী প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হবে।

[1]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[2]উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বিলকুমারী বিল ঃ এক সফল সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার নাম
Beelkumari Beel : A Success Story of Community Based Fisheries Management

মোহাঃ গোলাম রাব্বানী[১] ও মোঃ বায়েজিদ আলম[২]

Abstract

Department of Fisheries' intervention in the establishment of fish sanctuary, beel nursery, cause way (spill way) and its maintenance through Community Based Fisheries Management (CBFM) approach by the Fishers' Co-operative Society in Beelkumari Beel have been proved to be beneficial to conserve small indigenous species (SIS) as well as other endangered fish species. Before DoF intervention, this beel had been facing various problems in its management. The valuable fisheries resources of this beel were going to be ruined. With the introduction of DoF project support e.g., Fisher's group formation, rendering training, releasing fingerlings, monitoring fishermen co-operative society etc. have been proved effective that contributed positive impact on augmenting fish production and enriching fish diversity. Being drought prone, located in climatically vulnerable area, the beel faces severe water scarcity and that is aggravated due to indiscriminate use of water for irrigation in dry season. This jeopardized fish habitat and posing menace to the livelihoods of economically distressed fisherman. Concerted efforts and coordination with other government departments and eco-friendly water management strategy can ensure fish habitat restoration and help to cope up with the adverse impact of climate change.

বিলকুমারী বিল (Beelkumari Beel)

রাজশাহী জেলার ৩০ কিমি উত্তরে অবস্থিত তানোর উপজেলা। উপজেলা সদর দপ্তরের পাশে অবস্থিত বিলকুমারী বিল যার মাঝখান দিয়ে উজান ও ভাটিতে শিব নদী প্রবাহিত। অতীতে এ নদীই রাজশাহী শহরের সাথে তানোর উপজেলার যোগাযোগের একমাত্র নৌপথ হিসেবে ভূমিকা রাখত। বিলের চারপাশে ৪টি মৎস্যজীবী গ্রামের জেলেরা এক সময় এ বিল হতে প্রচুর মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। ২০০৩ সালের পর থেকে বিলে আশঙ্কাজনক হারে পানি কমতে থাকে এবং খরা মৌসুমে বিলের সাথে সংযোগকারী শিব নদীর প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। মৎস্যজীবীদের অনিয়ন্ত্রিত মাছ আহরণ, বিলে ধান চাষ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বিলে মাছের প্রাচুর্য কমে আসে। বর্ষাকালে বিলের গড় গভীরতা ৫ ফুটের বেশি থাকলেও খরা মৌসুমে ১.৫০ ফুটে নেমে আসে। ফলে ১৫৭ হেক্টর আয়তনের এ বিলটি শুষ্ক মৌসুমে মাত্র ৫০ হেক্টরে পরিণত হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প সহায়তা
(Assistance of Development Project)

ঐতিহ্যবাহী বিলের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার কথা বিবেচনা করে মৎস্য অধিদপ্তরের সমাপ্ত 'অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৮ সালে ১০ বছর মেয়াদি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিলকুমারী বিল জলমহালটি ন্যস্ত করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ২০০৮ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিলকুমারী বিল মৎস্যজীবী সমিতির মাধ্যমে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা মডেলের আলোকে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রথমে সুফলভোগী দল গঠন, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, পোনা অবমুক্তি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সময় প্রকল্প সহায়তায় বিলে মাছের বংশবিস্তারের জন্য ১.০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ২টি স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং বিলের পাড়ে ০.৫ হেক্টর জমিতে ৩টি নার্সারি পুকুর খনন করে বিল নার্সারি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। বিলের সাথে নদীর সংযোগ থাকায় শুষ্ক মৌসুমে বিলের তলদেশে পানির গভীরতা কমে যাওয়ার ফলে অভয়াশ্রমে মা মাছের সংরক্ষণ দুরূহ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ভাটির দিকে একটি ২০০ ফুট কজ-ওয়ে (cause-way) নির্মাণের মাধ্যমে পানির গভীরতা সহনশীল পর্যায়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয় ফলে মাছের প্রাচুর্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছবি: শুকনো মৌসুমে বিলকুমারী বিল

স্থানীয় বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলির প্রভাব
(Impact of Activities of Local Beel Management Committee)

বিল সংলগ্ন এলাকার ৪টি মৎস্যজীবী গ্রামের ৪৬৮ জন সদস্য নিয়ে বিলকুমারী মৎস্যজীবী সমিতি গঠিত। এ সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের পরামর্শক্রমে বিল ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কমিটির সদস্যগণ সারা বছর স্থায়ী অভয়াশ্রম এলাকায় মাছ আহরণ বন্ধে পাহারার ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও কমিটি অভয়াশ্রম সংলগ্ন উজান-ভাটির অংশে প্রায় ২ কিলোমিটার এলাকায়

ছবি: বিলকুমারী বিলে স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম

চিত্র: বিলকুমারী বিলে বছরভিত্তিক মাছের উৎপাদন

প্রতিবছর ১৫ শ্রাবণ হতে ১৫ পৌষ পর্যন্ত (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর) সকল প্রকার মাছ ধরা বন্ধ রাখে। এ সময় সুফলভোগী কমিটি স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। এর ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালের পূর্বে এখানে বাইম, শোল, টাকি, গুতি, টেংরা, আইড়, ফলি ও সরপুঁটি প্রভৃতি মাছের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সমাজভিত্তিক বিল ব্যবস্থাপনার ফলে এ সকল প্রজাতির উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিলে পাবদা, বৈঁচা, চিতল প্রভৃতি প্রজাতির মাছ দেখা না গেলেও বর্তমানে এ সকল প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম এবং বিল নার্সারিতে উৎপাদিত কার্প জাতীয় মাছের পোনা বিলে অবমুক্তির ফলে বর্তমানে এ বিলে রুই, কালিবাউস, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, কমনকার্প প্রভৃতি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, অনুকূল পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক খাবারের প্রাচুর্যের কারণে গত দু' বছরে বিগহেড কার্প ও কমনকার্প মাছের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালে এ বিলের মোট আহরিত মাছের পরিমাণ ছিল ১২০ মে.টন যা ২০১৩ সালে প্রায় ১৩৮ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

ছবি: বিলকুমারী বিলের ভাটি অংশে নির্মিত কজ-ওয়ে (cause-way)

মৎস্য মেলা আয়োজন
(Arrangement of Fish Fair)

২০০৯ সাল হতে প্রথম বিলকুমারী মৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক বিল সংলগ্ন জেলা পরিষদ ডাকবাংলো মাঠে স্বল্প পরিসরে মৎস্য মেলার আয়োজন শুরু হয়। ২০১০ সালে কজ-ওয়ে স্থাপনের পর বিলে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এরপর ২০১১ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাধারণত পৌষের মাঝামাঝি বিল পাড়ে প্যান্ডেল নির্মাণ করে নিয়মিত মৎস্য মেলার আয়োজন করে আসছে। ঐ দিন উৎসবমুখর পরিবেশে বিলের আহরিত মাছ তানোরসহ আশপাশের বাজার থেকে মেলায় আগত আড়তদার, পাইকার, খুচরা বিক্রেতাগণ মাছের বেচাকেনা করে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা সাধারণগণও এ মেলায় মাছ কেনার জন্য ভিড় জমায়। মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার আড়তে মাছের বেচাকেনার শুভ সূচনা করা হয়। এ মৎস্য মেলা বর্তমানে তানোর উপজেলায় বিলকুমারী বিলের একটি অনন্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিবছর পালিত হচ্ছে। বিলকুমারী বিলে মেলার দিনটিতে অভয়াশ্রমের বাইরে ইতঃপূর্বে নিষিদ্ধ ২.০ কিলোমিটার এলাকার মাছ আহরণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মেলার দিন মাছ ধরা উপলক্ষে জেলেদের নিকট গিয়ার ফি বাবদ ৫০ টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা হিসেবে ২৪০ টাকা সমিতির ফান্ডে জমা নেয়া হয়। মেলার দিনেই প্রধানত অধিকাংশ মাছ আহরিত হলেও পরবর্তী ২-৩ দিন যাবৎ এ উপলক্ষে মাছ আহরণ করা হয়।

স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশমালা
(Recommendations for Sustainable Management)

মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় বিলকুমারী বিল পাড়ের প্রায় ৫০০ টি জেলে পরিবারের জীবিকার উন্নয়ন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যা ধরে রাখতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

- মাছের পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ ও বিলের অগভীর অংশ এবং অভয়াশ্রম স্থলের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য পুনঃখনন;

ছবিঃ ২০১২ সালে মাননীয় প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মৎস্য মেলা উদ্বোধন

ছবিঃ ২০১২ সালে মাননীয় প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মেলা পরিদর্শন

- বিলের পানির সাহায্যে সেচ নির্ভর ফসলের আবাদ কমিয়ে আমনের আবাদে চাষিদের আগ্রহী করা;
- মাটির ক্ষয় রোধে মৎস্যজীবী সুফলভোগী সদস্যদের তত্ত্বাবধানে বিলকুমারী বিলের চারিদিকে বৃক্ষরোপণ করা;
- বিলে মৎস্য আহরণকারীদেরকে অতি আহরণ ও অবৈধ উপায়ে মাছ আহরণ নিরুৎসাহিত করা;
- বিলের সাথে সংযুক্ত শিব নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- বিলে পানি ধরে রাখতে কস্তু-গুড়ের পাশে সৃষ্ট ক্যানেলের মাধ্যমে পানির অপচয়রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়তা প্রদান এবং মৎস্যজীবীদেরকে উৎসাহিত করা;
- বিল নার্সারিতে পোনা উৎপাদন ও পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং এ বিষয়ে সুফলভোগীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- খরা মৌসুমে বিলে মৎস্য আহরণ থেকে বিরত রাখতে জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান অথবা ভিজিএফ এর মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা এবং এ বিষয়ে মৎস্যজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- দশ বছর মেয়াদে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্তকৃত জলমহালের মেয়াদ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে পুনরায় বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- বিলের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং জেলেদের জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ;

ছবিঃ ২০১৩ সালে জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী কর্তৃক মৎস্য মেলা পরিদর্শন

উপসংহার (Conclusion)

বিলকুমারী বিলে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। মৎস্য আবাসস্থল হিসেবে বিলে প্রয়োজনীয় পানি ধারণ নিশ্চিত করা গেলে আশা করা যায় যে, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ফলে বিলকুমারী বিলে মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশ রক্ষা, এলাকার জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিলকুমারী বিলের মৎস্যজীবী সুফলভোগী দল কর্তৃক নিয়মিত মৎস্য মেলা আয়োজন দেশের অন্যান্য সমাজভিত্তিক দলের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে সেতুবন্ধনের সৃষ্টি করে এবং সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্বশীলতা আনয়নে সহায়ক হবে।

[1]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[2]উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

কার্পজাতীয় মাছে অ্যাংকর ওয়ার্ম এর সংক্রমণ ঃ প্রতিকার ও প্রতিরোধ
Infestation of Carp Fishes by Anchor Worm : Control Measures

মোঃ শরীফুল ইসলাম[১], মোঃ আমিনুল ইসলাম[২] ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ[৩]

Abstract

Aquaculture plays an important role to meet up animal protein demand in the country. In future it needs further intensification. Farmer will have to use high stocking density, more supplementary feed, more medicines and more chemicals in the water bodies for higher fish production. Ultimately fishes become much more vulnerable to diseases in intensive culture system. Infestation of carps by the ectoparasite, Anchor worm Lernaea in brood ponds and nursery ponds is one of the most important problem encountered by the hatchery owners of Jessore area. The fish disease Lernaeasis in carp brood and carp nursery has huge impact on the production of quality fish seeds causing economic loss for the farmer. The article describes the characteristics of Anchor worm, its life cycle, symptom of Lernaeasis and its treatment.

বাংলাদেশে প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতেও মাছের যোগান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উন্নত মৎস্যচাষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে। মাছ চাষের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে মাছের রোগবালাই অন্যতম। বর্তমানে মৎস্যচাষ পদ্ধতির নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগবালাই সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। অধিক উৎপাদনের আশায় অনেক মৎস্যচাষি অধিক ঘনত্বে পোনা মাছ মজুদ, মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য, সার বা রাসায়নিক প্রয়োগ করে থাকে ফলে জলজ পরিবেশ দূষিত হয়। অপরিকল্পিত খামার ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত কারণে মাছের পুকুরে বা খামারে রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের চাষকৃত মাছ প্রতিনিয়ত পরিবেশের তারতম্য, অব্যবস্থাপনা যেমন অপরিকল্পিত নাড়াচাড়া, অধিক ঘনত্বে চাষ করা, বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার, অপুষ্টি, তাপমাত্রার পরিবর্তন, পানি দূষণ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ সমস্ত অব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের তারতম্যের জন্য মাছের পীড়ন হয়। ফলে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও জীবাণু দ্বারা বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে বহিঃপরজীবী চাষকৃত মাছে এবং নার্সারি পুকুরে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে কার্প হ্যাচারিতে ব্যবহৃত ব্রুড মাছে ও চাষকৃত কার্প মাছে পরজীবীঘটিত (লার্নিয়া, আর্গুলাস) রোগের সংক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের পরজীবীঘটিত রোগের সম্ভাব্য কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্পের রেণু উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত যশোরের চাঁচড়া অঞ্চলে পরিচালিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৮০ শতাংশ হ্যাচারির ব্রুড মাছ অ্যাংকর ওয়ার্ম বা লার্নিয়া (*Lernaea*) পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। রোগের সঠিক প্রতিকার কী হবে তা অজানা হওয়াতে হ্যাচারি মালিকগণ নানাবিধ কীটনাশক, নিষিদ্ধ অর্গানোফসফেট ব্যবহার করছে যা জলাধারের জন্য হুমকিস্বরূপ। এতে বিগত ২/৩ বছরে হ্যাচারি শিল্পে মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং জলজ পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। ফলে কার্প হ্যাচারি শিল্পসহ গোটা মৎস্য সেক্টরে এর প্রভাব পড়েছে।

ছবি: কার্প মাছে অ্যাংকর ওয়ার্ম

অ্যাংকর ওয়ার্ম
(Anchor Worm)

এ পরজীবীর মাথাটি দেখতে অনেকটা নৌকা বা জাহাজের অ্যাংকর বা নোঙরের মত। কাজেই একে অ্যাংকর ওয়ার্ম বলা হয়। নোঙরের শিং দিয়ে এ পরজীবী মাছের শরীরে আঁইশের ভেতরে এমনভাবে ঢুকে থাকে যে, তা টেনে বের করা কঠিন।

অ্যাংকর ওয়ার্মের সংক্রমণ
(Infestation by Anchor Warm)

অ্যাংকর ওয়ার্মের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Lernaea* spp. আমাদের দেশের কার্প জাতীয় মাছ সাধারণত *Lernaea cyprinacea* পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে কৈ এবং গোল্ডফিশও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। লার্নিয়া পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় বলে এর দ্বারা সংঘটিত রোগের নাম দেওয়া হয়েছে লার্নিয়াসিস (Lernaeasis)

লার্নিয়াসিস উচ্চ মাত্রার একটি সংক্রামক রোগ। সাধারণত পুকুরের মাছে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে এবং আক্রান্ত মাছ থেকেই রোগের বিস্তার ঘটে। এছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণী যেমন ব্যাঙের মাধ্যমে, রোগাক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মাধ্যমেও এ রোগের বিস্তার ঘটার ঝুঁকি রয়েছে।

সংক্রমণযোগ্য মাছের প্রজাতি (Vulnerable Fish Species)

ছোট আকারের মাছ একটি অ্যাংকর ওয়ার্ম পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলেই মারা যেতে পারে। বড় আকারের মাছ মারা না গেলেও মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, গ্রাসকার্প, কমনকার্প, সিলভার কার্প, বাটা মাছ অ্যাংকর ওয়ার্ম পরজীবী দ্বারা মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়। এছাড়াও তেলাপিয়া, কই, শিং, মাগুর, সরপুঁটি, দারকিনা মাছেও এ পরজীবীর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। অ্যাংকর ওয়ার্ম

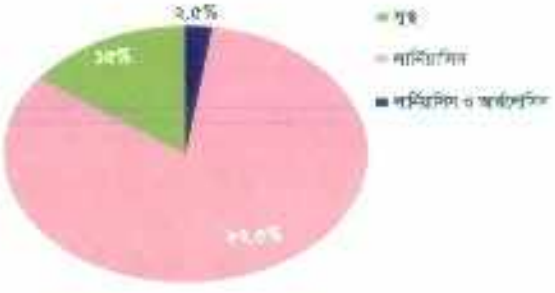

চিত্র: যশোর জেলায় মাছের রোগ

দ্বারা তৈরি দৈহিক ক্ষত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা সহজেই সংক্রমিত হয়। এ পরজীবীর দ্বারা রেণু পোনা ও অঙ্গুলে পোনা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কার্প হ্যাচারিতে ব্যবহার্য ব্রুড মাছের ও কার্প মাছের নার্সারিতে পোনার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বড় আকারের ব্রুড মাছ বেঁচে থাকলেও রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে মাছ ক্রমান্বয়ে খাবারের প্রতি অনীহা দেখায় এবং মাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ব্রুড মাছের বৃদ্ধি, পরিপক্কতা ও প্রজননক্ষমতা কমে যায়। যশোর অঞ্চলের ২০টি হ্যাচারি, ২০টি নার্সারি ও ২০টি চাষের পুকুরে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে ৮২.৫০ শতাংশ মাছই লার্নিয়াসিস রোগে আক্রান্ত, ১৫ শতাংশ লার্নিয়াসিস ও আর্গোলসিস উভয় রোগে আক্রান্ত। কোনো রোগ নেই এমন পুকুরের সংখ্যা নগণ্য।

জীবনচক্র (Life Cycle)

পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সাধারণত অন্য এক বা একাধিক প্রাণী পোষকের ওপর নির্ভর করতে হয়। লার্নিয়ার জীবনচক্র একটি প্রাণীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। এর জীবনচক্রে তিনটি মুক্ত চলাচলকারী 'নপলিয়ন' পর্ব এবং পাঁচটি 'কপিপেডিট' পর্ব রয়েছে। এরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মাছের

চিত্র: অ্যাংকর ওয়ার্ম-এর জীবনচক্র

ফুলকায় অবস্থান করে তবে এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান নেয় না। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী লার্নিয়া মাছের শরীরে সংযুক্ত থাকলেও পুরুষ লার্নিয়া বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়ায়। গ্রীষ্মকালে (২৭° সে.) জন্মের পরে ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লার্নিয়া প্রাপ্তবয়স্ক হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরুষ লার্নিয়া মারা যায়। তবে মারা যাওয়ার আগেই এরা স্ত্রী লার্নিয়ার সঙ্গে প্রজনন করে। মিলন হওয়ার পর স্ত্রী লার্নিয়া আগের মাছ বা আশেপাশের অন্য কোনো মাছের উপর বসে তাকে আক্রমণ করে। স্ত্রী লার্নিয়া মাছের টিস্যুর উপর বসে ফুড ফুটানোর জন্য নোঙরের শিংগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। একদিনের মধ্যেই স্ত্রী লার্নিয়া প্রথমবারের মত প্রথম ব্যাচ ডিম দেয় এবং ২-৩ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট ডিম দেয়। স্ত্রী লার্নিয়া (২৮-৩২° সে.) সাধারণত ৩০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। একটা স্ত্রী লার্নিয়া ৫০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। শীতকালে লার্নিয়া সাধারণত শীতনিদ্রায় থাকে। তবে ব্যতিক্রমভাবে শীতকালেও কোনো কোনো জায়গায় এদের বংশবিস্তার এবং আক্রমণের নজির রয়েছে। জীবনচক্র সম্পন্ন হওয়ার পর স্ত্রী লার্নিয়া মারা যায় ও মাছের শরীর থেকে ঝরে পড়ে। কিন্তু মাছের শরীরে যে ক্ষতস্থান থেকে যায়, তাতে পরবর্তীতে অধিকতর ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি থাকে এবং মাছ পুনরায় লার্নিয়ার আক্রমণের শিকার হয়।

লার্নিয়াসিস রোগের লক্ষণ (Symptoms of the Lernaeasis)

- এরা ম্যাক্রোস্কোপিক যা খালি চোখে দেখা যায়
- মাছ দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে থাকে
- আক্রান্ত স্থান লালচে হয় ও ক্ষত হয়ে যায়
- আক্রান্ত স্থান অনেক সময় ফুলে ওঠে এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়।
- মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।
- সাধারণত মাছের পাখনার গোড়ায় এর আক্রমণ বেশি ঘটে।

প্রতিকার বা চিকিৎসা (Remedy or Treatment)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণায় দেখা গেছে

ছবি: লার্নিয়া আক্রান্ত মাছ

ছবি: লার্নিয়া আক্রান্ত চিকিৎসার পরে সুস্থ মাছ

ঘ. ট্রাইক্লোরফন,পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ডিপটারেক্স ও লবণ ব্যবহার করে লার্নিয়াসিস রোগের প্রতিকার করা সম্ভব।

১. ট্রাইক্লোরফন (Trichlorfon): ব্যবহার মাত্রা- ১ম ডোজ: নিম প্রতি ২৫০-৩০০ মিলি (৫ ফুট পানি)। ২য় ডোজ ১৪ দিন পর। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৭৫ শতাংশ মাছ রোগ মুক্ত হয়েছে।

২. পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO4): পুকুরের পানিতে ২-৩ মিলিগ্রাম/লিটার হারে সপ্তাহে ১ বার প্রয়োগ করতে হবে এবং এর পরের সপ্তাহে একই হারে প্রয়োগ করতে হবে। গুধুমাত্র মাছের ক্ষেত্রে ১০ মিলিগ্রাম/লিটার হারে ২০-৩০ মিনিট মাছকে ট্যাংকের মধ্যে রেখে চুবিয়ে নিতে হবে। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৭০ শতাংশ মাছ রোগ মুক্ত হয়।

৩. ডিপটারেক্স (Dipterex): ব্যবহার মাত্রা- ১ম ডোজ: ২৫-৩০ গ্রাম প্রতি শতাংশে (৫ ফুট পানি)। ২য় ডোজ ১৪ দিন পর। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৬০ শতাংশ মাছ রোগ মুক্ত হয়।

৪. লবণ (NaCl): এটি দিলে মুক্তভাবে চলাচলকারী পুরুষ লার্নিয়া মারা যায়। ব্যবহার মাত্রা: শতাংশে ৫০০ গ্রাম

ছবি: লার্নিয়া আক্রান্ত মাছ চিকিৎসা

৫. রিপকর্ড বা ডেসিস (Ripcord or Desis): শতাংশ প্রতি ৩ ফুট গভীরতার জলাশয়ের জন্য ১ মিলিলিটার করে রিপকর্ড বা ডেসিস পরপর তিন সপ্তাহ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করার পূর্বে পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পরের দিন শতাংশে ৫ গ্রাম হারে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করে পানির শাওয়ার বা ঝরণা দিতে হবে।

প্রতিরোধ (Prevention)

- রোগাক্রান্ত পুকুরের পানি অন্য পুকুরে স্থানান্তর করা যাবে না।
- পুকুর ভালভাবে শুকিয়ে ও জীবাণুমুক্ত করার পর মাছ ছাড়তে হবে।
- সম্ভাব্য বাহক যেমন- ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, কাঁকড়া ও অন্যান্য ছোট মাছের অবাধ চলাচল প্রতিহত করতে হবে
- এক পুকুরে জাল, বালতি, খাবার পাত্র, ড্রাম, গামছা ইত্যাদি ব্যবহারের পর অন্য পুকুরে ব্যবহারের পূর্বে পরিশোধন করে নিতে হবে।
- পুকুরে ব্যবহৃত জাল শুকিয়ে পুকুরের মাছ ধরার জন্য শুকনো জাল ব্যবহার করা আবশ্যক

উপসংহার (Conclusion)

লার্নিয়াসিস রোগ নিরাময়ে অ্যাংকর ওয়ার্মের জীবনচক্র জানা থাকলে রোগ দমন করা সহজ হবে। কার্প মাছের ব্রুডের ও নার্সারি পুকুরে এ রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া সম্প্রসারণ কর্মী ও চাষি ভাইয়েরা এ রোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করলেন এবং মৎস্য খেতের এ রোগের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে।

ভেদা মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন কৌশল
Induced Breeding Technique and Fry Rearing of Nandus

নিলুফা বেগম[১] ও মোঃ মেহেদী হাসান প্রামানিক[২]

Abstract

The present study deals with brood development at different stocking densities, standardization of induced breeding technique and larval rearing of *Nandus nandus*. For the development of broods, the average size of male (20.50 ± 3.7cm) and female (42.50 ± 4.0 cm) fish were reared at stocking densities of 40/decimal (T_1), 60/decimal (T_2) and 80/decimal (T_3) respectively for 3 months. The brood fish were fed two times daily with fry, dead small fishes and artificial feed comprising 30% rice bran, 30% wheat bran, 20% fish meal, 15% mustard oil cake OC, 5% molasses at the rate of 5-3% body weight. Brood Nandus reared at 40/decimal (T_1) has attained highest weight of 32 ± 4.20g for male and 60 ± 6.10 g for female. For standardization of breeding technique, three different doses of pituitary gland (PG) were tested viz. 4, 6, and 8 mg/kg body weight for female and 1.5, 2.0 and 2.5 mg/kg body weight for male. Sex ratio of male and female brood at 1:1 was maintained. The dose of PG tested with 1.5mg/kg for male and 4 mg/kg for female revealed best fertilization (96 ± 3) % and hatching rate (90 ± 2) %. After 72 hours, hatchlings were transferred to nursery pond for larval rearing. After 30 days of rearing the average length of 3.33 ± 0.05 to 41.02 ± 0.24 mm fry was attained.

দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের পুষ্টিমান অনেক বেশি। এসব প্রজাতির মাছের আবাসস্থলের মধ্যে প্লাবনভূমি অন্যতম। বাংলাদেশে প্রায় ২৬.৩৩ লক্ষ হেক্টর আয়তনের প্লাবনভূমি রয়েছে। কিন্তু পানি দূষণ, অপরিকল্পিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, জলাভূমিকে ফসলের ক্ষেতে রূপান্তরিত করা, অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য আহরণ, বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ও রাসায়নিকের ব্যবহারসহ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ অমূল্য মৎস্যসম্পদ আজ হুমকির মুখে এবং এসব কারণে ইতোমধ্যেই মৎস্য প্রজাতির প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে গেছে, বিপন্ন হয়ে গেছে ৫৪ প্রজাতির মাছ (IUCN-এর মতে), এর মধ্যে ভেদা (মেনি/ নন্দাই/ ধান্দা/ নুইনা) তেমনই একটি বিপন্ন প্রজাতির মাছ। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়ায় ভেদা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল, পোনা উৎপাদন ও লালন পালন পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমবারের মতো সফলতাজনকভাবে এ গবেষণা কার্যক্রম শেষ হয়েছে যা বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের অগ্রযাত্রা হিসেবে বিবেচিত হবে।

ভেদা মাছের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Bheda)

ভেদা মাছ ঈষৎ ধূসর কালচে বাদামি রঙের ডোরাকাটা ছোপ ছোপ বিন্যাসকৃত। বিল হাওর-বাঁওড়-নদীতে দেখা যায় বর্ষাকালে জলাভূমির ফসলের ক্ষেতে এরা বিচরণ করে কর্দমাক্ত জলাশয়ের পরিবেশ এদের বেশ পছন্দ। আগাছা, কচুরিপানা, ডালপালা অধ্যুষিত জলাশয়ে বাস করে। ভেদা মাছ খেতে সুস্বাদু।

প্রজননক্ষম ভেদা মাছের ব্রুড সংগ্রহ ও প্রতিপালন
(Brood Collection and Rearing)

ভেদা মাছের ব্রুড প্রতিপালন, কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশলের জন্য নিম্নের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে হয়।

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি: ব্রুড প্রতিপালন পুকুরের আয়তন ৮-১০ শতাংশ ও গড় গভীরতা ১.৫ মিটার রাখা হয়। ব্রুড ছাড়ার আগে পুকুর শুকিয়ে ইউরিয়া (১০০ গ্রাম/ শতক), টিএসপি (৭৫ গ্রাম/ শতক) ও গোবর (৮ কেজি/ শতক) ব্যবহার করা হয়। ব্রুড প্রতিপালন পুকুরের চারপাশে জালের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা হয়।

ছবি: ভেদা মাছ

প্রজননক্ষম ভেদা মাছের ব্রুড মজুদ: বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভেদা মাছের প্রজননকাল হিসেবে স্বীকৃত। প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত মাছ সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্রুড তৈরি করা হয়। প্রতি শতাংশে ৪০টি ভেদা, ওজন (পুরুষ ২০.৫০ গ্রাম, স্ত্রী ৪২ গ্রাম) মজুদ করা হয়।

খাদ্য প্রয়োগ: ব্রুডের পরিপক্বতার জন্য প্রতিদিন দুই বার করে খাবার হিসেবে চালের কুঁড়া ৩০%, গমের ভুসি ৩০%, ফিসমিল ২০%, সরিষার খৈল ১৫%, মোলাসেস ৫% হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। মাছের দৈহিক ওজনের ৫-৩% সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া অন্যান্য খাবারের মধ্যে মরা ও জীবিত ছোট মাছ বিশেষ করে ছোট চিংড়ি দেয়া হয়।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা: ১৫ দিন পর পর জাল টেনে ব্রুড মাছের দেহের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিয়মিত পানির গুণাগুণ (পানির তাপমাত্রা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ও মোট ক্ষারত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। নিয়মিত চুন প্রয়োগ করা হয়। ব্রুড প্রতিপালনের পর ভেদা ব্রুড (৪০/শতক) ঘনত্বে তিন মাস পর সর্বোচ্চ ওজন হয়

(পুরুষ ৩২ গ্রাম, স্ত্রী ৬৬ গ্রাম) যেখানে মজুদকৃত ওজন ছিল (পুরুষ ২০.৫০ গ্রাম, স্ত্রী ৪২ গ্রাম)। পরবর্তী ২০ দিন সিস্টার্নে খাবার হিসেবে কেঁচো, ছোট চিংড়ি ও হাঁসপোকা সরবরাহ করা হয়।

কৃত্রিম প্রজনন কৌশল (Induced Breeding Technique)

প্রজনন মৌসুমের পূর্বে পরিপক্ক পুরুষ ও স্ত্রী ব্রুড প্রতিপালন পুকুর থেকে সিস্টার্নে স্থানান্তর করা হয়। সংগৃহীত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্রুড (স্ত্রী ও পুরুষ) ভাসমান জলজ উদ্ভিদপূর্ণ ও কাদাযুক্ত সিস্টার্নে রাখা হয়। ২০ দিন পর প্রজনন সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয় দেহের রঙ ও আকৃতি দেখে। পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে ১:১ অনুপাতে ৬ ফিট মসৃণ জর্জেট হাপায় স্থানান্তর করা হয়। সিস্টার্নে অক্সিজেন নিশ্চিত করতে কৃত্রিম ঝর্ণা ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে ৪ মিগ্রা/কেজি ও পুরুষের ক্ষেত্রে ১.৫ মিগ্রা/কেজি হারে পিজি ডোনার বক্ষ পাখনার নিচে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়।

ছবি: রেণু পোনা

হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করার ৭-৮ ঘণ্টা পর স্ত্রী ভেদা ডিম ছাড়ে। ডিম আঠালো অবস্থায় হাপার চারপাশে লেগে যায়। ডিম দেয়ার পর হাপা থেকে ব্রুডগুলো সরিয়ে নিতে হয়। ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পর ডিম ফুটে এবং রেণুগুলো হাপার গায়ে লেগে যায়। ডিম ফুটার ৩৬ ঘণ্টা পর রেণুকে খাবার দিতে হয়। নাহলে এক জন আর একজনের লেজ কামড়ানো শুরু করে। রেণু পোনাকে সিদ্ধ ডিমের কুসুমের দ্রবণ দিনে ৬ ঘণ্টা পর পর ৪ বার দেয়া হয়। হাপাতে রেণু পোনাকে এভাবে ২/৩ দিন রাখার পর নার্সারি পুকুরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

নার্সারি পুকুরে পোনা লালন-পালন (Fry Rearing Technique)

নার্সারি পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি: পোনা প্রতিপালন পুকুরের আয়তন ৪-৮ শতাংশ ও গড় গভীরতা ১.০ মিটার রাখা হয়। পুকুর প্রস্তুতির জন্য চুন (১কেজি/ শতক) দেয়া হয় এবং ইউরিয়া (১০০ গ্রাম/শতাংশ), টিএসপি (৭৫ গ্রাম/শতাংশ) ও গোবর (৮ কেজি/শতাংশ) ব্যবহার করা হয়। পুকুরের চারপাশে নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া এবং বহিরাগত উপদ্রব (সাপ, ব্যাঙ ও পাখি) থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের উপরিভাগে বড় ফাঁসের পাতলা নেট টানানো হয়। পোনার আশ্রয়স্থলের জন্য পুকুরের ভেতরে লম্বাভাবে ২/৩ টি নরম কাপড়ের টুকরো টানিয়ে দেয়া হয়।

পোনা সংগ্রহ ও নার্সারি পুকুরে মজুদ: ২/৩ দিনের রেণু পোনার মজুদ ঘনত্ব রাখা হয় ৪০,০০০টি/শতাংশ। নার্সারি পুকুরে মজুদের সময় পোনাকে পুকুরের পানির তাপমাত্রার সঙ্গে ভালভাবে কন্ডিশনিং করে ছাড়া হয়।

নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ: খাবার হিসেবে পুকুরে সিদ্ধ ডিমের কুসুমের সঙ্গে আটা/ ময়দা মিশিয়ে পর পর ৩ দিন দিনে ৩ বার করে দেয়া হয়। এরপর ৫ দিন ময়দার সঙ্গে নার্সারি ফিড মিশিয়ে খাবার দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রচুর জু-প্লাংকটন উৎপাদনের লক্ষ্যে আরো ৩-৪ দিন ময়দার সঙ্গে তৈল মিশিয়ে খাবার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। এভাবে ২০ দিন পর ২-৩ দিন বয়সের পুঁটি জাতীয় মাছের রেণু সরবরাহ করা হয়। নার্সারি প্রতিপালন পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরির লক্ষ্যে প্রতি শতাংশে আধা কেজি গোবর ৭ দিন পরপর প্রয়োগ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা: প্রতি ১০ দিন পর জাল টেনে মাছের দেহের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিয়মিত পানির গুণাগুণ (পানির তাপমাত্রা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ও মোট ক্ষারত্বের পরিমাণ) নির্ণয় করা হয়।

পোনা উৎপাদন ও আহরণ: উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদের একমাস পর পুকুর সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ৪-৪.৫ সেমি সাইজের পোনা পাওয়া যায়।

ভেদা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল ও পোনা উৎপাদনে পরামর্শ (Recommendations for Induced Breeding and Rearing)

প্রয়োজনীয় খাবার যথাযথভাবে প্রয়োগ করা না হলে ব্রুড মাছের প্রজনন পরিপক্কতা সঠিকভাবে হবে না। প্রজনন হাপাটি অত্যন্ত মসৃণ জর্জেটের হতে হবে। হাপা থেকে রেণু পুকুরে স্থানান্তরের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে রেণু আঘাত না পায়। বিকালে পানির তাপমাত্রা যখন কম থাকে তখন নির্ধারিত আশ্রয়স্থলের নিকটে পুকুরে পোনা ছাড়তে হয়।। ব্রুড প্রতিপালন, পোনা উৎপাদন ও লালন-পালনে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা না করলে রোগজীবাণু কর্তৃক ব্রুড ও পোনা আক্রান্ত হতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত গবেষণায় প্রাপ্ত কৌশল অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারি মৎস্য হ্যাচারিসমূহেও ভেদা মাছের সফল কৃত্রিম প্রজনন করা সম্ভব। দেশের বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতিসমূহের মধ্যে ভেদা মাছের কৃত্রিম প্রজনন সফলভাবে সম্প্রসারণ করা গেলে চাষের মাধ্যমে এ প্রজাতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং বিপন্নপ্রায় অবস্থা থেকে এ প্রজাতির মাছের উত্তরণ ঘটবে বলে আশা করা যায়।

---

[1]প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
[2]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৪

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পদক	নাম ও ঠিকানা
১	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	স্বর্ণপদক	৬৬ পদাতিক ডিভিশন, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর - এর পক্ষে মেজর জেনারেল মোঃ সালাহ্ উদ্দিন মিয়াজী পিএসসি, জিওসি
২	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	স্বর্ণপদক	**জনাব মোঃ শাহজাহান বাবলু**, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এস বি গ্রুপ শাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক দক্ষিণ কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩২
৩	মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/মৎস্য শুটকী ইত্যাদি)	স্বর্ণপদক	গী ফ্রেশ লিঃ, মোঃ মামুনুর রহমান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, গ্রাম: ইলাইপুর ডাকঘর: পূর্ব রূপসা, উপজেলা: রূপসা, জেলা: খুলনা
৪	মাছ উৎপাদন (পাংগাস মাছ চাষ)	স্বর্ণপদক	আলহাজ্ব বেলাল হোসেন সরদার, পিতা: মৃত সখের আলী গ্রাম: কাশিমালা, ডাকঘর: বিশিয়া, উপজেলা: আদমদীঘি, জেলা: বগুড়া
৫	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	রৌপ্যপদক	**সৈয়দা সারোয়ার জাহান**, নিরিবিলি মৎস্য খামার স্বামী: বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম শওকত হাফিজ খান রুশনি মাতা: রাবেয়া বেগম, দক্ষিণ কাট্টলি, চট্টগ্রাম/ নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, ১ নং রোড, চট্টগ্রাম।
৬	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	রৌপ্যপদক	খাজা মৎস্য হ্যাচারি, মোঃ মফিজুল ইসলাম, পিতা: মৃত খাজা মঈনুদ্দিন মাতা: মোছাঃ কলিমন নেছা, গ্রাম: বাঘরাপাড়া, ডাকঘর: কাঠালী উপজেলা: ভালুকা, জেলা: ময়মনসিংহ
৭	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন (কার্প ও পাঙ্গাসের পোনা উৎপাদন)	রৌপ্যপদক	মেসার্স মা-মনি মৎস্য খামার; প্রোঃ মোঃ সেলিম রেজা (পোলু) পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মাতা: সালেহা খাতুন, গ্রাম: ভাতুড়িয়া ডাকঘর: চাঁচড়া, উপজেলা: যশোর সদর, জেলা: যশোর
৮	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন (কার্প ও মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন)	রৌপ্যপদক	বিসমিল্লাহ এগ্রো প্রোডাকশন, প্রোঃ মোঃ সাহেদুল রহমান পিতা: মৃত তোফায়েল আহমেদ, মাতা: সালেহা খাতুন গ্রাম: মহব্বতপুর, ডাকঘর: সোনাপুর, উপজেলা: নোয়াখালী সদর, জেলা: নোয়াখালী
৯	মাছ উৎপাদন (দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, পিতা: মৃত আছর আলী মাতা: ফুলজান, গ্রাম: লাউটিয়া, ডাকঘর: মাশিয়ালী উপজেলা: তারাকান্দা, জেলা: ময়মনসিংহ
১০	মাছ উৎপাদন (মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	ভাই ভাই মৎস্য খামার, প্রোঃ মোঃ হারুন অর রশিদ পিতা: মোঃ হাশেম আলী, মাতা: মৃত আয়না বেগম, গ্রাম: খামারপাড়া চাঁচড়া, ডাকঘর: চাঁচড়া মোড়, উপজেলা: যশোর সদর, জেলা: যশোর
১১	মাছ উৎপাদন (পশ্চাৎপদ এলাকায় পাহাড়ী ক্রীকে মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	জনাব এটিএম শেরাজুল ইসলাম, পিতা: মরহুম আবুল ফজল চৌধুরী মাতা: মরহুমা আমেনা বেগম, গ্রাম: কিশাইত নগর ডাকঘর: তারাবিনয়াহাট, উপজেলা: ফটিকছড়ি, জেলা: চট্টগ্রাম
১২	মাছ উৎপাদন (পশ্চাৎপদ এলাকায় পাহাড়ী ক্রীকে মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ আবু তাহের, পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম মাতা: মোছাঃ মনুজা খাতুন, গ্রাম: বোরের মুখ, ডাকঘর: লংগদু উপজেলা: লংগদু, জেলা: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
১৩	মাছ উৎপাদন (পশ্চাৎপদ এলাকায় পাংগাস মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	আতিয়া মৎস্য খামার, প্রোঃ মোঃ শফিউল্লাহ মাল, পিতা: মৃত মজিবল হক মাল মাতা: আছিয়া বেগম, গ্রাম: দরিরাম শংকর ডাকঘর ও উপজেলা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
১৪	মাছ উৎপাদন (রুই জাতীয় মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব আব্দুল মোনায়েম কায়কোবাদ**, পিতা: মৃতঃ আব্দুল বাতিন মাতা: মৃতঃ আমিনা খাতুন, গ্রাম: হরিয়াউক, ডাকঘর: হরিয়াউক উপজেলা: নাসির নগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৫	মাছ উৎপাদন (রুই জাতীয় মাছ চাষ)	রৌপ্যপদক	**জনাব অসিম সাহা**, পিতা: শ্রী সন্তোষ কুমার সাহা মাতা: শ্রীমতি মিনা সাহা, গ্রাম: নীচাবাজার, ডাকঘর: নাটোর উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর
১৬	খাঁচায় মাছ চাষ (মনোসেক্স তেলাপিয়া)	রৌপ্যপদক	**জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান**, পিতা: মোঃ আলী আজগর মাতা: মোছাঃ সাজেদা খাতুন, গ্রাম: রতনপুর ডাকঘর: ডেমরা, উপজেলা: ফরিদপুর, জেলা: পাবনা
১৭	বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পিএল উৎপাদন	রৌপ্যপদক	মাসুম শ্রিম্প হ্যাচারি প্রাঃ লিঃ, প্রোঃ আলহাজ্ব শেখ আবুল হোসেন পিতা: মৃত আরশাদ আলী শেখ, মাতা: আলহাজ্ব মাজেদা বেগম গ্রাম: চালনা বাজার, ডাকঘর: চালনা বাজার উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

২০১২-১৩

মৎস্য সেক্টর	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
(১) মুক্ত জলাশয়				
১. নদী ও মোহনা	৮,৫৩,৮৬৩	১,৪৭,২৬৪		১৭২
২. সুন্দরবন	১,৭৭,৭০০	১৫,৯৪৫		৯০
৩. বিল	১,১৪,১৬১	৮৭,৯০২		৭৭০
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৯,০১৭		১৩১
৫. প্লাবনভূমি	২৭,০২,৩০৪	৭,০১,৩৩০		২৬০
মোট ঃ	৩৯,১৬,৮২৮	৯,৬১,৪৫৮	২৮.১৯%	
(২) বদ্ধ জলাশয়				
৬. পুকুর	৩,৭১,৩০৯	১৪,৪৬,৫৯৪		৩,৮৯৬
৭. মৌসুমি চাষ জলাশয়	১,৩০,৪৮৮	২,০০,৮৩৩		১,৫৩৯
৮. বাঁওড়	৫,৪৮৮	৬,১৪৬		১,১২০
৯. চিংড়ি খামার	২,৭৫,২৭৪	২,০৬,২৩৫		৭৪৯ (২৬৩ কেজি সাদা মাছসহ)
মোট ঃ	৭,৮২,৫৫৯	১৮,৫৯,৮০৮	৫৪.৫৪%	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় মোট ঃ	৪৬,৯৯,৩৮৭	২৮,২১,২৬৬	৮২.৭৩%	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়				
১০. ট্রলার		৭৩,০৩০		
১১. আর্টিসেনাল		৫,১৫,৯৫৮		
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)		৫,৮৮,৯৮৮	১৭.২৭%	
সর্বমোট ঃ		৩৪,১০,২৫৪	১০০%	

বছরভিত্তিক চিংড়ির উৎপাদন

বছর	চিংড়ির উৎপাদন (মে.টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসেনাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৬৮২	১৪৭৭৩	৫৭৪৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৬০৯	২০.২৯
১৯৮৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৫১১৭	১২৭০১	১৭৮১৮	৭২৭২৬	২৫.৬১
১৯৯০-৯১	৪৮২৬২	১৪৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৫৭	১৭৬৫৩	৮০৩৬৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০০৩৫	৮১০৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১১১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৫৫৩০	১০৩৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৭৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৬৯৭৩	৩৪০৩০	৯১০০৩	২৪১৬	১৭৬৪৭	২০০৬৩	১১১০৬৬	৩০.৬২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৫৮	২২৭৪৫	২৬৩০৩	১১৬৬০৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩০৩৭	২১২৮১	২৪৩১৮	১১৮৪৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৫৫	৬২১৫৭	১০৮৮১২	২৪৪৪	২২৩৩৬	২৪৭৮০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৮	১১২৪৬৪	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০৬	৪৩.৮০
১৯৯৯-০০	৪০৩৬৭	৬৬৮৪৭	১০৭২১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৮৬০৯	৪৮.২৩
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৩৫	৩১০০৭	১৪০৩২০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫০৭৯	১২০০৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২০২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৮১৩	৩৬৮৮৮	১৭৫১৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৬৭৬৮	৮২৬৬১	১৪৯৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৩৬৯০	৪২.৬৮
২০০৫-০৬	৭৭৫৮১	৮৫৫১০	১৬৩০৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১২১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৫	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩২৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	৫৭৯২২	১২৪৬৮৮	১৮২৫৭০.৭৬	২৭৮৫	৫৪২০৪	৫৬৯৭৯	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	৫৭৬৮৮	১৩১৭১৫	১৮৮৮৬০	২২১২	৫৫৪৪৮	৫৭৬৬০	২৪৬৫২০	৫৪.০২
২০১২-১৩	৪৫০১৩	১৪০২৬১	১৮৫২৭৪	৩০৮৩	৪৩৪৮৫	৪৬৫৬৮	২৩১৮৪২	৬০.৫০

বছরভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

বছর	ইলিশের উৎপাদন (মে.টন)		
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১
১৯৮৮-১৯৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২
১৯৮৯-১৯৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১
১৯৯০-১৯৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭
১৯৯১-১৯৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২
১৯৯২-১৯৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০
১৯৯৩-১৯৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১
১৯৯৪-১৯৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫
১৯৯৫-১৯৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫
১৯৯৬-১৯৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯
১৯৯৯-২০০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২
২০০০-২০০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪
২০০১-২০০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩
২০০২-২০০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২
২০০৩-২০০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯
২০০৪-২০০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২
২০০৫-২০০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩
২০০৬-২০০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯
২০০৭-২০০৮	৮৯,৯০০	২০০১০০	২৯০০০০
২০০৮-২০০৯	৯৫,৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮৯২১
২০০৯-২০১০	১১৪৭৬৮	১৯৮৫৭৪	৩১৩৩৪২
২০১০-২০১১	১১৪৫২০	২২৫৩২৫	৩৩৯৮৪৫
২০১১-২০১২	১১৪৪৭৫	২৩২০৩৭	৩৪৬৫১২
২০১২-২০১৩	৯৮৬৪৮	২৫২৫৭৫	৩৫১২২৩

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণঃ মে.টন
মূল্যঃ কোটি টাকা

বছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবণাক্ত ও পানিশূন্য মাছ		কাঁকড়া/ঈল		হাঙ্গরের পাখনা এবং মাছের ফোটকা		অন্যান্য		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের হার
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
৯২-৯৩	১৯২২৩	৬০৪.৩৫			২৭০৪	৩৮.৫১	১০৮২	১২.২২	২৯৯	৩.১৩	২৮০০	২১.৮০	২৫৮.৩৯	১৪.২০			২৬৬০৭	৭০০.২৯	৭.৩৭
৯৩-৯৪	২২০৩৪	৭৭৭.৯৫			৫১২৫	৫১.১৬	২৪৭৫	৫১.৮৩	৩০	১.০৬	৪০০৮	৩৯.৫৭	৪২	২.৭৯			৩৩৮৫২	৯২৩.৯৬	৮.১২
৯৪-৯৫	২৫৯৭৭	১০৪৫.৯৭			৯২৬৭	১৩০.২৬	৫২১	৮.৩৯	১৫৬	১৫.৫৫	৪৭৬০	৪০.৭৭	২১১	১৯.৯০			৪১১৩৬	১২০২.৯৪	৯.৫৮
৯৫-৯৬	২৫২২৫	১২০৩.৫৯			৬৯২৭	১৭৬.৯২	১৬২	৩.০৫	৪৩১	১১.৫৭	৪২০৫	৩৯.২০	৫৮	৪.২১			৩৭২৫২	১৪৩০.৯৪	৯.৫৭
৯৬-৯৭	২৩৭৪২	১১৬৭.৯১			৮৭৫৪	১৭৬.৭৫	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১০.৮১	৩৭৩৫	৪১.৪৮	১১৫	৮.৫৫			৪১৬৭৯	১৪০৭.৯১	৭.৭৫
৯৭-৯৮	১৮৫৫০	১১৫৭.৪৮			১৫৩৬৯	১৫১.৯৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪০	১১১৮	১৪.৫৪	১৫৫	১০.৭৯			৩৬১৬৮	১৩৬৭.৮১	৫.২৩
৯৮-৯৯	২০৫২৭	১১৬১.২১			৫৪৯৪	১৩৩.৯৬	১৪৭	২.২৫	১২৫২	৫৭.১৮	৪৯৬	৬.৩৯	১৩৪	১৭.৪০			২৯৩৫১	১৩৭৯.০৭	৫.৪১
৯৯-২০০০	২৯৫৫৬	১৬১২.৫৩			৬৪৮৭	১৩৭.১৯	৭৬৫	৩.৬০	৭০৬	২২.৬৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩৩.১৭			৩৯৮৯১	১৮২১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৭৭৭.১৫			৭৬৬৫	১৪১.৯৯	১৩৭	২.৫৪	৮৩৮	২৭.৭৫	১৩৪	২.৩৩	১৮১	৫০.৬৫			৩৮৬৬৮	২০০২.৭৫	৫.৭৭
০১-০২	৩৩৫২৬	১৫৪৭.৭৬			৯৮৮৫	১৩৭.৫৯	৫২৭	৩.৫৪	২৯৫	২.২৩	৩৩৫	৬.৮৭	২৫৬	২৭.৬৫			৪৪৮৬২	১৭৫৭.১৬	৪.৭২
০২-০৩	৩৯৬৩৪	১৯১৫.৮৮			৮৯৮২	১৩৮.৪৪	৫৫৫	৭.৬৫	৫৭৪	১৪.১৯	৩৫০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩০			৪৯৫৯২	২০৯৪.৫০	৫.১১
০৩-০৪	৪২৯৪৪	২১৮২.৭৭			১০২২৯	২০২.১৪	৪৭২	৪.১৬	৫৭৭	২.৫৮	১১৯	১.৬৬	৪	১.৫৫			৫৪৩৮১	২৩৯০.৪৭	৪.৭১
০৪-০৫	৪৮০৫৬	২৩৭১.৫৯			১৪৭৬০	২৬৬.৯০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.২৭	৫৮	০.৬৬	১	০.৩৬			৬৩৬৭৭	২৬৭২.৭২	৫.৬০
০৫-০৬	৪৯৫২১	২৬৬৮.৩৫	৫৭	০.৪৯	১৭৮২৯	২৩৪.১৪	১৬০	৪.১১	৩৩১	১৯.৬৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৭০	১০০	১.০৪	৬৮৭২৯	৩০২৯.৫৪	৪.৫৫
০৬-০৭	৫৩৩৯১	৩৪৬২.৪৪	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩৫৫.৬০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১৬.৬০	১১২৩	১৩.৪৮	৪৪৪	৪.১১	৭৮	০.৬৬	৭৪৭৩৪	৩৯৫৩.৬৬	৫.৬০
০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৯৫.৮২	১০	০.১৫	২৫৫৩৫	৪৯৯.৪৪	২১০	২.৬৭	৩৫৮	২২.৩৭	৪৩১	৪.৬৬	৪৯৬	১.৬২	২৪৪	০.৪১	৭৬২৯৬	৩৫৬৯.২৮	৪.৬৪
০৮-০৯	৪৭৬৯৬	২৭৪৪.১২	০.৪	০.০০০৫	২৯২৪৪	৪৫০.৪০	৬৪২	১১.৪৪	১৭	০.৪২	১২১৭	১১.৬৮	৪৯৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৫	৭৯৮৮৮	৩২৪৪.৪১	৪.০০
০৯-১০	৫১০৯৯	২৩৬২.২১	১৭৮০	১৩.২২	২২৬৪৪	৪০৮.১১	৮২২	২৭.০৬	০	০	৬৬৪	১০.৪২	৪৫২	১২.৬৬	৫২৬	৩.১৫	৭৭৫৮৩	৩৬০৬.৪২	২.৭২
১০-১১	৫৪৮৯১	৩০৬৮.২	০.৯	০.০৪৫	৩৩১১১	১২১১.০৫	৮২৫	৫.৫৭	৫৭৫১.৮	৫০.৬৬	৫৪৮৭	৫৮.১১	০০	০০	২৭৪০	৩৪.০	৯৩৪৪৪	৪৪২৩.১৫	২.৭৫
১১-১২	৪৮০০৭	৩৩৫০.২	০.৪৪	০.০৪	৫৫২৩৫	৯১৩.৯৯	৯৬৬	৩.৮৩	৪২২	২৭.৮৫	৫৭৫৭	৯৪.৭৭	০০	০০	২৭৫৮	১৪.১৪	৯২৫৭৯	৪৭০৫.৩২	২.৪৬
১২-১৩	৫০৩৪৪	৩৫৭৯.৩	০	০	১১৪৫৫	৫১৬.৩৩	১২৭৮	৩৩.০৫	০	০	৭৯২৬	১৬৯.৪৯	১	০.০৯	৭৫৩৯	১৬.৯২	৮৫৪৫৫	৪৫৩২.৯১	২.৪২

* চিংড়ি ফিড সহ

- রপ্তানিকৃত চিংড়ি হিমিশ ৫৩২.৮৪ মে.টন এবং রপ্তানিকৃত আয় ২০.১৪ কোটি টাকা (২০১২-১৩)
- রপ্তানিকৃত হিমায়িত ইলিশ ৯০.৩৬ মে.টন এবং রপ্তানিকৃত আয় ৪.১১ কোটি টাকা (২০১২-১৩)
- রপ্তানিকৃত মোট ইলিশ ৫২৩.২০ মে.টন এবং রপ্তানিকৃত আয় ২৪.২৫ কোটি টাকা (২০১২-১৩)

বছরভিত্তিক বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন

১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০১২-২০১৩

(মেঃ টন)

মৎস্য সেক্টর	১৯৯৮-১৯৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১২৪২২২০	১৩২৭৪৮৩	১৪০২৮৬০	১৪৭৪৩০৬	১৫৬৬২০৮	১৬৪৬৮১৯	১৭৪১৩৬০	১৮৪৮৭৩০	১৯৫২৫৭৩	২০৬৫৮০৬	২১৮৬০৭০	২৩৫১৯১৬	২৫১৫৪৫৮	২৬৮৩৩৫৪	২৮২১৪৫৫
(১) মুক্ত জলাশয়	৬৯৯৪২৮	৬৮৯৫৪৫	৬৮৮৯২০	৬৯৮৪৩৪	৭০৬০০৩	৭৩২০৫৭	৭৬৯৬৯৬	৭৯৬৪৫০	১০০৭৯২৩	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৪	১০২৯৭০৯	১০৫৪৫৮৫	৯৫৭০৪৪	৯৬১৪৫৮
১. নদী ও মোহনা	১৫৭৫০৯	১৫৪৩৩৫	১৫০৩২৯	১৩৪০৯২	১৩৭৯৪৮	১৪৭১৬৭	১৪৯৬৯৮	১৩৭৬৭৩	১৩৬৫৫৮	১৩৬৮১১	১৩৮০১৮	১৪১১৯৮	১৪৪৮৭৮	১৪৮৭১১	১৫৪২৩৪
২. সুন্দরবন	১১১৩৪	১১৪৪৮	১২০৩৪	১২৩৪৩	১৫৭৭৭	১৫৪৯২	১৫৭৪৮	১৬৪২৩	১৭৭৯১	১৮১৮৯	১৮৪৩৪	২০৪৫৪	২২৪৫১	২১১২১	১৮৯৯৪
৩. বিল	৬৬৬৫৭	৭২৩২২	৭৪৫৫৭	৭৪৬০১	৭৫৪৩০	৭৫৩৪৮	৭৫৬৩২	৭৬৬৬৬	৭৫২৫৭	৭৭০২৬	৭৫৫০০	৭৯২৩৯	৮১২৬৪	৮৫৩৭৮	৮৭০৪২
৪. কাপ্তাই লেক	৬৬৬৯	৬৮৩৭	৭০৫১	৭২৪৭	৭০১৯	৭২৩৬	৭৫৭৯	৭৫৪৮	৮০৬৪	৮২৩৮	৮৩৮০	৭৬০৬	৮৬০০	৮৫৪৭	৯১২৭
৫. প্লাবনভূমি	৪১০৪৩১	৪৪৪৬০৩	৪৪৪৯১৬	৪৬৩২৫১	৪৭০৩২৯	৪৮৬৯০৯	৫১২৪৬৫	৫৫২০৪৩	৫৭০০০০	৬১৯৪৮৪	৬৭৯৪৬৯	৭৬৪৩৪৪	৭৯৭১৭৮	৬৯৩২৮৭	৬৯১৩৬১
(২) বদ্ধ জলাশয়	৫৪৩৭৯২	৬৩৭৯৩৮	৭১৩৯৪০	৭৭৫৮৭২	৮৬০২০৫	৯১৪৭৬২	৯৭১৬৬৪	৮৮২২৮০	৮৮৯২৬২	১০০৫৬২৫	১০৬২১৪৬	১৩২৩২০৭	১৪৬০৮৭৩	১৭২৬৩১০	১৮৫৯৮০৮
১. পুকুর	৪৪৯৩০০	৫৩৪০০০	৬০৪৯২৮	৬৬৭৯২৭	৭৪৩৩৫৪	৭৮৫০৮৩	৮১৭২৯৪	৭৫৯০৫৫	৭৬৬৬৬৮	৮৬৬০৪৯	৯১৮০১১	১১২১৪৭৫	১২৪৫৭৭৭	১৩৮৭২৭৭	১৪৭৭৮৪৬
২. মৌসুমি চাষ (প্লাবনভূমি)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৪৪৮০৩	৩৯৬৯০	৮৫১৪৩	১০০৪২০
৩. বাঁওড়	৩৯৪৯	৪০৮৮	৪২১০	৪৫৮৬	৪৫৬২	৪৮৯২	৪৮৯৮	৪৮৬০	৪৭৮৪	৪৯৬৫	৫০৪১	৫০৬১	৪৮১৮	৫১৭৭	৫৪৮৮
৪. চিংড়ি খামার	৯০৫৪৩	৯৯৮৫০	১০৪৮০২	১০৩৩৫৯	১১২২৮৯	১২৪৭৮৭	১৪৯৪৭২	১১৮৩৬৫	১১৭৮১০	১৩৪৯১১	১৩৯০৯৪	১৫১৯২৯	১৭০৫৮৮	২০০৮৮৬	২০১৫৩৫
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৩১০২৯৭	৩৩৩৮৯৪	৩৭৮২০৭	৪১৬১৫৩	৪৩১৯৭৬	৪৫৫২০৭	৪৭৪৫৯৭	৪৭৯৮১০	৪৮৭৪৩৮	৪৯৭৪৯০	৫১৪৩০০	৫৪৬০৬২	৫৪৬৩৩৩	৫৭৮৬২০	৫৮৮৯৮৮
১. ট্রলার	১৩৩৯২	১৩০০৪	২৬৮২৮	২৭৩৫৩	২৯৬৪৪	৩২৬৪৫	৩১৩৩৮	৩২২৫৮	৩৩৩২৩	৩৩২৯২	৩৫৬৪০	৩৯১৭২	৪২২৫৫	৫৫৩২৪	৭৯৯৮৫
২. আর্টিসানাল	২৯৬৯০৫	৩২০৮৯০	৩৫১৩৭৯	৩৮৮৮০০	৪০২৩৩২	৪২২৫৬২	৪৪৩২৫৯	৪৪৭৫৫২	৪৫৪১১৫	৪৬৪১৯৮	৪৭৮৬৬০	৫০৬৮৯০	৫০৪০৭৮	৫২৩২৯৬	৫০৯০০৩
সর্বমোট:	১৫৫২৫১৭	১৬৬১৩৭৭	১৭৮১০৬৭	১৮৯০৪৫৯	১৯৯৮১৮৪	২১০২০২৬	২২১৫৯৫৭	২৩২৮৫৪০	২৪৪০০১১	২৫৬৩২৯৬	২৭০১৩৭০	২৮৯৯১৯৮	৩০৬১৬৮৭	৩২৬১৫২৩	৩৪১০২৫৪
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার	৭.০৭	৭.০৩	৭.২০	৬.১৪	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৩	৪.৫৬

এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ
(২০১২-১৩)

১.	অভ্যন্তরীণ জলায়তন		
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	ঃ	৭,৮২,৫৫৯ হেক্টর
	▪ পুকুর	ঃ	৩,৭১,৩০৯ হেক্টর
	▪ অক্সবো লেক (বাঁওড়)	ঃ	৫,৪৮৮ হেক্টর
	▪ চিংড়ি ঘামার	ঃ	২,৭৫,২৭৪ হেক্টর
	▪ মৌসুমি জলাশয়		১,৩০,৪৮৮ হেক্টর
	(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	ঃ	৩৯,১৬,৮২৮ হেক্টর
	▪ নদী ও মোহনা	ঃ	৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর
	▪ সুন্দরবন	ঃ	১,৭৭,৭০০ হেক্টর
	▪ বিল	ঃ	১,১৪,১৬১ হেক্টর
	▪ কাপ্তাই লেক	ঃ	৬৮,৮০০ হেক্টর
	▪ প্লাবনভূমি	ঃ	২৭,০২,৩০৪ হেক্টর
২.	সামুদ্রিক জলায়তন		১,৬৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার
	▪ সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	৯,০৬০ বর্গ কিলোমিটার
	▪ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	১,৪০,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার
	▪ মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	ঃ	২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	ঃ	৭১০ কিলোমিটার
৩.	▪ জেলের সংখ্যা	ঃ	১৩,১৬ লক্ষ
	▪ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	ঃ	৮,০০ লক্ষ
	▪ সামুদ্রিক জেলে	ঃ	৫,১৬ লক্ষ
৪.	মৎস্য চাষি		১৪৬.৯৭ লক্ষ
	▪ মৎস্য চাষি	ঃ	১৩৮.৬৪ লক্ষ
	▪ চিংড়ি চাষি	ঃ	৮.৩৩ লক্ষ
৫.	মৎস্য উৎপাদন		৩৪,১০,২৫৪ মে.টন
	▪ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	ঃ	২৮,২১,২৬৬ মে.টন
	▪ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	ঃ	৯,৬১,৪৫৮ মে.টন
	▪ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	ঃ	১৮,৫৯,৮০৮ মে.টন
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য	ঃ	৫,৮৮,৯৮৮ মে.টন
	▪ ট্রলার দ্বারা আহরণ	ঃ	৭৩,০৩০ মে.টন
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	ঃ	৫,১৫,৯৫৮ মে.টন
৬.	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি		
	▪ পরিমাণ	ঃ	৮৪,৯০৫ মে.টন
	▪ মূল্য	ঃ	৪,৩১২.৬১ কোটি টাকা
	▪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	ঃ	মোট ১০০ টি (ই ইউ অনুমোদিত-৭৫)
	▪ জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	ঃ	২.০১%
৭.	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান		
	▪ GDP-তে অবদান- ২০১১-১২	ঃ	৪.৩৭%
	▪ কৃষিখাতে অবদান- ২০১১-১২	ঃ	২৩.৩৭%

৮.	মাছ গ্রহণ (Fish Intake) ও চাহিদা		
	▪ জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	ঃ	১৯.৩০ কেজি
	▪ মাছের বাৎসরিক চাহিদা	ঃ	৩৭.৯২ লক্ষ মে.টন
	▪ জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	ঃ	২১.৯০ কেজি
	▪ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান	ঃ	৬০ %
৯.	মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি		
	▪ মৎস্য হ্যাচারি	ঃ	৯৩৬টি
	▪ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	ঃ	৪,৮৭,৪৯৮ কেজি
	▪ প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	ঃ	৩৩২৬ কেজি
১০.	অবকাঠামো (সংখ্যা)		
	▪ মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঃ	০৬ টি
	▪ প্রশিক্ষণ একাডেমি	ঃ	০১ টি
	▪ মৎস্য হ্যাচারি	ঃ	৯৩৬ টি
	▪ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি	ঃ	৬০ (উৎপাদন চলমান)
	▪ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি	ঃ	২৩ (উৎপাদন চলমান)
	▪ চিংড়ি পিএল	ঃ	৯২৭.২৩ কোটি
	▪ চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	ঃ	০২ টি
	▪ চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	ঃ	২০ টি
	▪ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (বিএফডিসি)	ঃ	০৯ টি
	▪ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (উপকেন্দ্র)	ঃ	১০ টি
১১.	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)		
	▪ ট্রলার	ঃ	১৮৪ টি
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	ঃ	৩০,১৬৪ টি
	▪ ইঞ্জিন বিহীন নৌকা	ঃ	২৭,৬৯৯ টি
	▪ জাল ও বড়শি	ঃ	১,৮৩,৭৭৭টি
১২.	মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)		
	▪ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	ঃ	২৬০ টি
	▪ বিদেশী মৎস্য প্রজাতি	ঃ	১২ টি
	▪ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	ঃ	২৪ টি
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	ঃ	৪৭৫ টি
	▪ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	ঃ	৩৬ টি
১৩.	মৎস্য সেক্টরের জনবল (২০১২-২০১৩)		
	▪ মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল	ঃ	১ম শ্রেণি - ১০৮০ জন
		ঃ	২য় শ্রেণি - ৬৩৪ জন
		ঃ	৩য় শ্রেণি - ১৯৪৬ জন
		ঃ	৪র্থ শ্রেণি - ১৩৩৯ জন
		ঃ	সর্বমোট- ৪৯৯৯ জন
	▪ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-১২	ঃ	২৪৬ (১ম শ্রেণি -৭৭ জন)
	▪ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন -১২	ঃ	৭৯১ (১ম শ্রেণি -৯৪ জন)

সংকলিত ঃ মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৯৫৪০৪৩০ (অ) ৯৫৪৫৫৫৫ (অ) ৯৩৪৮২১৯(বা) ৯৩৪৮২৫৫ (বা) ৯৫৪০১৯২ (ফ্যা) min.mofl@gmail.com
জনাব এস, এম, আবু তাহের মাননীয় মন্ত্রীর পিএস (যুগ্ম-সচিব)	৯৫৪০৯৩০ (অ) ৮৩৫৫২৪৮ (বা) ps.mofl@gmail.com taher3643@gmail.com
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীর এপিএস	৯৫৭৪৮১২ (অ)
জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার সিনিয়র তথ্য অফিসার	৯৫৭৪৮১৯ (অ) m.asarker@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৪৩৮৩০ (অ)
জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯৫৪০০৫৫ (অ) ৯৫৪০২৫৫ (ফ্যা) st.min.mofl@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর পিএস	৯৫৪০০৭৯ (অ) mazaman_1973@yahoo.com
জনাব সমীর কুমার দে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর এপিএস	৯৫৪০০৮১ (অ)
জনাব মাধব লাল শীল মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৪৩০৭৪ (অ)
শেলীনা আফরোজা পিএইচডি ভারপ্রাপ্ত সচিব	৯৫৪৫৭০০ (অ) ৮১৫৭৩৭৯ (বা) ৯৫১২২২০ (ফ্যা) secmofl@gmail.com shelina.afroza@gmail.com
জনাব সিরাজ আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী সচিবের একান্ত সচিব	৯৫১৫৭৯৯ (অ) ssr15542@gmail.com
বেগম রীনা মণ্ডল সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৬৪৭০০ (অ)
জনাব মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	৯৫৪৫৫৮৩ (অ) ৮০৫৫৪৬৬ (বা) altaf.smef@yahoo.com
ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল উপ-সচিব (বাজেট)	৯৫৭১০০৭ (অ) ৮৩২২০৫৫ (বা) kamal_asm@yahoo.com
জনাব এস. এম. আবু তাহের যুগ্ম-সচিব (মেরিন ফিসারিজ একাডেমী এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের কার্যক্রম)	৯৫১৫৫২৭ (অ) ৮০৫৫২৪৯ (বা)
ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহন্ত এনডিসি যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	৯৫৭৩৬৯৪ (অ) ৮৩৩৩১৬৪ (বা)
জনাব মোঃ আবদুল ছাত্তার উপ-সচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)	৯৫৭৬৯৯৬ (অ) ৭১১৬৩৪০০ (বা)
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা)	৯৫৪০৪০৭ (অ)
জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)	৯৫৭৩৬৮০ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, যুগ্ম-সচিব (বিএফডিসি এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এর কার্যক্রম)	৯৫৭৪৮৮১৭ (অ)
জনাব মোঃ আশরাফ আলী যুগ্ম-সচিব (প্রাণিসম্পদ)	৯৫৭৪৪৯৮ (অ) ৮০৫৬১৪৬ (বা)
বেগম দেলোয়ারা বেগম উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা)	৯৫৬৯৯৪৭ (অ)
বেগম কে.এফ.এম. জেসমীন আখতার উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা)	৯৫৬১১১৭ (অ) ৯১৫৩৪০৫ (বা) kfm_j@yahoo.com
জনাব জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস উপ-সচিব, (প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা) (অতিরিক্ত দায়িত্ব, প্রাণিসম্পদ-৪ অধিশাখা)	৯৫৭৬৬৯৮ (অ) ৮৩৫৩৫৫৪ (বা)
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৯৫১৪২০১ (অ) ৯৬৬৯০৬৫(বা) ৯৬৬১৪৭৯ (বা) anisur3112@gmail.com
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (মৎস্য-১ অধিশাখা)	৯৫৭৭২৬২ (অ)
জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-২ ও আইন)	৯৫৭৬৫৫৭ (অ)
জনাব এ, এম, সাইফুল হাসান উপ-সচিব (মৎস্য-৩)	৯৫৭৬৩৫৬ (অ) amsaifulhassan@yahoo.com
জনাব মজিবুল হক মজুমদার সহকারী সচিব ও প্রটোকল অফিসার (মৎস্য-৪ শাখা)	৯৫৪০৪৩৮ (অ)
জনাব এ.কে. এম ফজলুল হক উপ-সচিব (মৎস্য-৫ অধিশাখা)	৯৫৪৯১৮১ (অ) ৮০৫১৬৬৬ (বা) haque5744@gmail.com
জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন যুগ্ম-প্রধান	৯৫৪০৯৬৬ (অ) ৮০৫৭৯২০৫ (বা)
জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপ-প্রধান	৯৫৭৪৮১৪ (অ) ৯৩৫৪৩৮৩ (বা) mizanlu@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব পুলকেশ মন্ডল সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিঃ-১ ও ৩)	৯৫৭৪৮৬১৫ (অ) pulak75@gmail.com
বেগম তানজিনা শাহরীন সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিঃ-২)	৯৫৭৪৮৬১৭ (অ) shahrinp@gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ সহকারী প্রধান (প্রশাসঃ পরিঃ-১)	৯৫৬১৫৭৭ (অ)
জনাব এইচ, এম, মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রশাঃ পরিঃ-২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) ৮০৯০৫৮৬ (বা)
জনাব মোহাম্মদ-আল-মারুফ সহকারী প্রধান (মনিটরিং-১)	৭১৭০১০৮ (অ) ৯৫৫০৫৭১ (অ)
বেগম মাহমুদা মাসুম সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	০১৭১৬৮৯৭৭৭৫ (মো) masum.ndi@gmail.com
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা www.fisheries.gov.bd	
সৈয়দ আরিফ আজাদ মহাপরিচালক dg@fisheries.gov.bd	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার)	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) kbdmamun_1974@yahoo.com
সৈয়দ আরিফ আজাদ পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) psofiqcdof@gmail.com
জনাব এম আই গোলদার পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৭১৮১২ (অ) goldar4@gmail.com
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরি. ও পরি.) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৮৯৫২৪৮৪ (বা) [illegible]@yahoo.com
জনাব পরিমল চন্দ্র দাস উপপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৯৩৫৫ (অ) ৯৫৬৭২১৭ (ফ্যা) parimal.das58@yahoo.com
ড. মোঃ গোলজার হোসেন উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ddacua@fisheries.gov.bd
ড. জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) anwarulhaque35@yahoo.com
জনাব আ.ক.ম. আজিজুল হক মোল্লা উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ahoque1957@gmail.com
ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), বাস্তবায়ন শাখা	৯৫৬৫০২১ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), জলমহাল শাখা	৯৫৬০৬৫৩ [illegible]@yahoo.co.uk
সৈয়দা শিরিন কুলসুমা খাতুন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), অডিট শাখা	৯৫৬৭২১৬ ৯৫৪৭২১৬
ড. মোঃ ফজলুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৯৩২০ (অ) fazludof2005@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), লিগ্যাল শাখা	৯৫৫০২৮০ (অ) atiquedof@yahoo.com
জনাব সুবল চন্দ্র পন্ডিত উপ প্রধান	৯৫৬১৭১৫ (অ)
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ.দা)	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_aul@yahoo.com
জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫৪৩ (অ)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম উপপ্রধান (সামুদ্রিক শাখা)	৯৫৬৫০২৩ (অ) serajdof1955@gmail.com
জনাব মোঃ ইউসুফ খান প্রধান সমন্বয়ক ও প্রকল্প পরিচালক (ডিপিপি শাখা)	৭১৬২৮০৪ (অ) yousuf@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ) zahid_dof@yahoo.com
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) majibdof@yahoo.com
বেগম শামীম আরা বেগম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১৬৩ (অ) admin-2@fisheries.gov.bd
জনাব এ কে এম লুৎফর রহমান সিদ্দীক সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৬৭২১৮ (অ) luttor.dhaka@yahoo.com
ড. আলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক সহকারী পরিচালক (সরবরাহ ও সেবা)	৯৫৬৭২১৯ (অ) [illegible]@yahoo.com
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী সহকারী পরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) [illegible]@yahoo.co
জনাব কৃষ্ণেন্দু সাহা প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) [illegible]@yahoo.com
বেগম শিল্পী দে সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)	৯৫৬৯০৪১ (অ) shilpiplus@yahoo.com
বেগম তাসমী শাহরীন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), [illegible]	৯৫৬৯০২৬ (অ)
জনাব অহিদুজ্জামান সহকারী প্রধান (বাস্তবায়ন)	৯৫৫৮০৭০ (অ)
জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৫৮০৭০ (অ) faruk.dof@gmail.com
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) [illegible]@yahoo.com
জনাব মোঃ সৈয়দ হোসেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ)	৯৫৬৯২৯৫ (অ) ৮৩৫৫৩৪৫ (বা)
সরকার তরিকুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (এফসিডিআই)	৯৫৬৬৯৭১(অ) alamsb@live.com
তথ্য সেবা কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
সাধারণ শাখা	৯৫৫৪৮৭৫ (অ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
জনাব মোঃ রমজান আলী প্রকল্প পরিচালক (অতি. দা.) বীজ প্রকল্প (রাজশা.)	০৪২১-৬৩১০৮ (অ)
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম এনপিডি, বিএমএফসিসি প্রকল্প	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৭১১১৫৪৪ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের ডিএনপিডি, বিএমএফসিসি প্রকল্প	৯৫৬০৪৭২ (অ) [illegible]2222@yahoo.com
জনাব মোহাঃ আতিয়ার রহমান এডি, বিএমএফসিসি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ) atiar_dof@yahoo.com
ড. মোঃ গোলজার হোসেন পরিচালক, এনএটিপি	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৯৫৬৯৯৮৯ (ফ্যা) goljardof@yahoo.com
জনাব খঃ মাহবুবুল হক এডি, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) [illegible]232@yahoo.com
জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এডি, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল এডি, এনএটিপি	৯৫৫৫৩৫১ (অ) sarkeferoz@yahoo.com
বেগম মোছাঃ নাছিমা সুলতানা বাজেট ও হিসাব রক্ষণ অফিসার, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) [illegible]@yahoo.com
ড. জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প	৯৫১৩৫০৭ (অ) [illegible]@yahoo.com
ড. মোঃ আব্দুস সালাম এডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প	৯৫১১১৫০ (অ) [illegible]
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপপরিচালক ও পিডি, এফসিডিআই প্রকল্প	৭১৬২৭৮৩ (অ)
ড. কাজী ইকবাল আজম পিডি, চিহ্নিত জলাশয় প্রকল্প	৯৫৫৩১৫৩ (অ) [illegible]@gmail.com
জনাব আব্দুল্লা আল হাসান এডি, চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৫৬৬৮৫ (অ)
জনাব ছালেহ আহমদ এনপিডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১২১ (অ) saleh_ahmed[illegible]@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৪৫ habib.[illegible]@yahoo.com
জনাব এ বি এম শাব্বীর এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৯৯ (অ) abm_sabbir@yahoo.com
ড. মোঃ সিরাজুর রহমান পিডি, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার প্রকল্প	৯৫১১৯৯৬ (অ) [illegible]@yahoo.com
বেগম প্রভাতী দেব পিডি, হাওর প্রকল্প	০৩১-২৫৮০৯৬২ (অ) provatideb@gmail.com
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান প্রকল্প সমন্বয়কারী, IAPP	৯১০৪৬৬৭ (অ) mukhles.[illegible]@gmail.com
জনাব এ বি এম জাহিদ হাবিব পিডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৬০৭ (অ) abmjahidhabib@yahoo.com
জনাব মাহবুব-উল- হক এডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৬৫৮ (অ)
বেগম মাসুদ আরা মমি এডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আবুল হাশেম পিডি, WBRP	৯৫৬৯৯৪৫ (অ) [illegible]@yahoo.com
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান এপিডি, WBRP	৯৫১৪০৪২ (অ) ৯৫১৪০৪১ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার পাল পিডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৬৯ (অ) tapanaddof@yahoo.com
ড. মোঃ আব্দুস সবুর এডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৪ (অ) [illegible]@yahoo.com
জনাব এস এম খালেকুজ্জামান এডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৪ (অ)
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পিডি, মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_zul@yahoo.com
জনাব আব্দুর রেজ্জাক এডি, মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৬০৪৫৭ (অ)
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭১১৪৭০৬ (অ)
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তালুকদার পিডি, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প	৯৫৫২১৭৬ (অ) arif@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ মিজানুর রহমান পিডি, বিল নার্সারি প্রকল্প	mrb47@gmail.com
ড. আবদুল কাদির পিডি, বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬৬৫৪৫৪ (অ) akadir_[illegible]@yahoo.com
ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার এনপিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	৯৫১২৫৬৬ (অ) riaz_phd@yahoo.com
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পিডি, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প	০১৭১১-০০৩০২৫ [illegible]@gmail.com
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী পিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৭১১৬০৪২ (অ) bbroty@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এডি, বিল নার্সারী প্রকল্প	৯৫৬১৮২০ (অ) mdhjamil@gmail.com
ড. জি এম শামসুল কবির পিডি, ফরমালিন প্রকল্প	৯৫৬৮১১৯ (অ) gmskabir@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া পিডি, বৃহত্তর পাবনা প্রকল্প ও গাজনারবিল প্রকল্প	০৭৩১-৬৬০৬৬ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা) [illegible]@yahoo.com
জনাব মোঃ আবদুল হান্নান মিয়া পিডি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ প্রকল্প	০৩৫১-৬২৬২৯ (অ) hannan07@yahoo.com
জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার পিডি, [illegible] মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০৭৫১/৬২১৫৭ hsarkar78@gmail.com
ড. আ ন ম আজিজুল ইসলাম খান ফোকাল পয়েন্ট, সাইক্লোন সিডর প্রকল্প	৯৫৬০৬৫৩ (অ) azizdof@yahoo.com
জনাব এস এম আশিকুর রহমান প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব) ভবদহ প্রকল্প, যশোর	০৪২১-৬১৪৩৬(অ) ashiktanu@gmail.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন পরিচালক	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) nasir_dof@yahoo.com
বেগম মরিয়াম সুলতানা উপপরিচালক	০৩১-২৫২৬৭৬৪ (অ)
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন পিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা	০৩১-২৫২৮২৬২ (অ) ০৩১-৭২৪২০৬ (ফ্যা)
জনাব অধীর চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯০ (অ) adhir_arnab@yahoo.com

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল পরিচালক (অ.দা.), এফটিআই, সাভার	৭৭১২৫১৮ (অ)
জনাব মোহাম্মদ হাসান অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০২ (অ)
কাজী মাহবুবুল হক অধ্যক্ষ, এফটিটিআই, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৪৫৭ (অ)
জনাব এস. এম. মহিব উল্যাহ সোএসও, এফটিটিআই, রায়পুর, লক্ষীপুর	০৩৮২২-৫৬০৩৭ (অ) ০৩৮২২-৫৬০৩৯ (ফ্যা)
জনাব মোঃ ইসহাক আলী খামার ব্যবস্থাপক, এফটিটিআই, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ)
জনাব তপন কুমার দাস প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফটিটিআই, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)
কাজী হেলেনা আরজু প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফটিটিআই, গোবিন্দপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
জনাব ছালেহ আহমদ উপপরিচালক, FIQC, ঢাকা	৭১৬৮৩৮০ (অ) salehahmedpd@yahoo.com
জনাব মোঃ মনিক মিয়া মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (লজা), ঢাকা	৯৫৬২৩৩৪ (অ) mianarik443@yahoo.com
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (পরিদর্শন), ঢাকা	৯৫৬৩৬৭৪ (অ)
বেগম প্রভাতী দেব উপপরিচালক, FIQC, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২৫০৩ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুর রাশেদ উপপরিচালক, FIQC, খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯৫ (অ)
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম সরদার মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১-৫৭৫০১৭৯ (ফ্যাক্স)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব সৈয়দ খোরশেদ জাফরী পরিচালক	৯১১২২৬১ (অ)
জনাব মিজানুর রহমান প্রধান তথ্য অফিসার	৮১৩০৪৭২ (অ)
ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫৭ (অ) ৭২১১৭৫০ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৮১২৩১৮৭ (অ)
জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ) ০১৭১২১৩৫৮৫২
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন পরিচালক (খাদ্য শস্য উইং)	৯১১৭০৩০ (অ)
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	৮১২৩৬৪৩ (অ) ০১৭২০১৭২৮৯২

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
ডা. মোঃ শহিদুল ইসলাম মহাপরিচালক	৯১০২৯৩২ (অ)
ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক সিদ্দিকি পরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন)	৯১১৭৭৩৬ (অ)
ডা. মলয় সংকর দে পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ) ৯১৩১৪০৪ (অ)
ডা. মোঃ লিয়াকত আলী পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৫৮ (অ)
ডা. মোঃ শহিদুল ইসলাম পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	৯৮৯৮৮৯৫ (অ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭০ (অ) ০১৭১৩০০২৬৩৮

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব উজ্জল বিকাশ দত্ত সদস্য (কৃষি)	৯১৮০৭৯৯ (অ)
জনাব নূর মোঃ মেসবাহুল কুদ্দুস একান্ত সচিব	৯১৮০৫৪৮ (অ)
রোকেয়া বেগম বিভাগ প্রধান	৯১১১৭২৫ (অ)
ড. মোঃ শাহজাহান আলী খন্দকার যুগ্ম-প্রধান (খাদ্য ও সমন্বয়)	৯১৮০৭৫৮ (অ)
বেগম ইসরাত জাহান তসলিম উপ-প্রধান (মৎস্য)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯৬৬১৩৫৩ (বা)
বেগম শাহিনা সুলতানা সহকারী প্রধান (মৎস্য)	৯১১৭০৩৯ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি সচিব	৯১৮০৭৬২ (অ) ৯৫৩৪৪০৭ (বা)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব অমূল্য কুমার দেবনাথ মহাপরিচালক, CPTU	৯১৪৪২৫০ (অ)
জনাব আবু জাফর মোঃ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী পরিচালক (কৃষি)	৯১২৩৭৫২ (অ) ৮০৫২৩৬০ (বা)
ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন সচিব	৯১১৩৭৪৩ (অ)
জনাব আরাস্তু খান অতিরিক্ত সচিব	৯১৮০৬৭৫ (অ) ৯৮৯০৯৫৫ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	
জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১৩৫৫৮৭ (অ) ৮১৫০০০৯ (বা)
ড. কবীর ইকরামুল হক সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৮১১০৬১৮ (অ) ০১৭১১-৪৬৬৪২৪
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	
জনাব পিটিশ কস্তা চেয়ারম্যান	৯৫৮৬৭৯৬ (অ) ৮৩৫০১৬৬ (বা)
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন খান পরিচালক (অর্থ)	৭১৬৯৫০০ (অ) ৯৩৫১৩৫৭ (বা)
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬৪০০৭ (অ)
জনাব সজল কুমার চৌধুরী সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস মহাপরিচালক	৯২৫২৭৩৬ (অ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল মহাপরিচালক	৯২৫২৭১৫ (অ) ৯১২৪১৭৪ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	
জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান	৯৫৬৪৩২৮ (অ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	
জনাব মোঃ শেফাউল করিম উপপরিচালক (উপ-সচিব)	৭১৬৯৪৫৫ (অ)
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৭১৬৯৪৫৩ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	
মোহাম্মদ জাহের মহাপরিচালক	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ফ্যাক্স: ০৯১-৬৬৫৫৯
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ পরিচালক (প্রশাসন)	০৯১-৬১২৩১ (অ) yahiamahmud@yahoo.com
ড. মাসুদ হোসেন খান সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০৭ (অ)
ড. শ্যামলেন্দু বিকাশ সাহা সিএসও, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬০৩০ (অ) saha_sb@yahoo.com
ড. মোঃ এনামুল হক সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ)
জনাব খান কামাল উদ্দিন আহমেদ সিএসও, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০১৭১২-১০৩২৮১ ০৪৬৮-৬২২৯১
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২১৫৯ (অ)
জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১-৬৬৯৮২ (অ)

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১-০৬ ফ্যাক্স: ৫৫৮১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২১৭৯১ ফ্যাক্স: ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯৬৬১৯০০-৫৯ ফ্যাক্স: ৮৬১৫৫৮৩
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭২১-৭৫০৭৪২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	০৩১-৭১৪৯৪৯
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১-৭৫৪৫৩২
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৪৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭০৮৪৭৮-৮৫
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০৮২১-৭৬১৯৫০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৪৪২৭-৫৬০১৫
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	০৩১-২৫৬৬৫৭৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিশারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১ (অধ্যক্ষ)

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
অ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭৪৫০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (নি. জেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
ভাইস-চেয়ারম্যান, বপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, ঢাকা	৮৩১৬৮৮২ ৮৩১৭৫৩১
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, খুলনা অঞ্চল	০৪১-৮১৩২৯২ (অ) ০৪১-৮১২৯২৫ (ফা)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	০৩১-৭২৪৯৪৫ (অ) ০৩১-২২১৯৮৭ (ফা)
বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন ঢাকা	৮৪১৭৭৩১ (অ) ৮৪১২৭০৯ (ফা)
প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আকোয়াকালচার এসোসিয়েশন	৮৩৯১৫৯৪ (অ)
সমন্বয়ক ফিসারিজ প্রোডাক্ট ডিভেলপমেন্ট প্রোমোশন কাউন্সিল	৯৫১৪৪৩৪ (অ)

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৮১৫৯০০১
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৫৬০০০-৮
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৬৩২০
এফএও	৮১১৮০১৫-৮
ইউএনডিপি	৮১৫০০৮৮
ওয়ার্ল্ডফিস	৮৮১১৫১
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আইইউসিএন	৯৮৯০৪২৩
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আইওএমএফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৮৮৩২২৬৬
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
জিআইজেড	৯৬৬৬৭০১০০০

ঢাকা বিভাগ	
বেগম ফরিদা বেগম উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২(অ) ৯৫৬৫০২২(ফা) dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২২(অ) nazrulder1959@gmail.com

ঢাকা জেলা	
জনাব মোঃ আবদুল কাইয়োম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩(অ) dfodhaka@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭৪৭৫৩৪(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২-৭১১৪৭(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেরাণীগঞ্জ	৭৭৬৪৪৭৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪-৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৬২২৫-৫৬২৪৯(অ)

মানিকগঞ্জ জেলা	
কাজী শামস আফরোজ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৭১০৩৯২(অ) manik@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৭১০৭৮৩(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	৭৭১৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিঙ্গাইর	৭৭১৭১৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর	৭৭২৭৩৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	৭৭২৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	৭৭১৫১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিরামপুর	৭৭২৮০৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	৭৭১১৫২৩ (অ)

মুন্সীগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ নুরতাজুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬১১৫৯১ (অ) dfomunshiganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৬১২৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	৭৬২৭৩২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজদিখান	০৬৯২৪-৮৮০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টঙ্গীবাড়ী	৭৬১৮২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লৌহজং	৭৬২৫২৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গজারিয়া	৭৬১৬২৩২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সীগঞ্জ সদর	৭৬১১৫৮৩ (অ)

গাজীপুর জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯২৫২৫২০ (অ) ০২-৯২০৫২৭৯ (বা) dfo.gazipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০২-৯২০৫২৪৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫-৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪-৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২-৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৬৮২৩-৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	০২-৯২৯১৩১৭ (অ)

নরসিংদী জেলা	
জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল ফারাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯৪৬২৪১০ (অ) ০২-৯৪৫১০০০ (বা) dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৯৪৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০৬২৫৫-৫৬১৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৮-৭৫০৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০৬২৮-৭৪৪১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলাবো	০৬২৫২-৬৩১০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩-৫৬১৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	০২-৯৪৬৩০০৬ (অ)

নারায়ণগঞ্জ জেলা	
মর্জিনা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৭৬৩০৬২৫ (অ) dfonarayanganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৭৬৪৮৩৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁও	০২-৭৬৫৬৩০১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০২-৭৬৫৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বন্দর	০২-৭৬৬১১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০২-৭৬৫০০২৭ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ফরিদপুর জেলা	
জনাব এমদাদুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ) dfofaridpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১-৬৬৬১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪-৫৬১৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা	০৬৩২২-৫৬১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নগরকান্দা	০৬৩২৭-৫৬৩২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুখালী	০৬৩২৬-৫৬১৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরভদ্রাসন	০৬৩২৫-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গা	০৬৩২৩-৫৬৫৪৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১-৬৩৯৯০ (অ)
রাজবাড়ী জেলা	
জনাব রতন দত্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ) dforajbari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১-৬৫০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাংশা	০৬৪২৪-৭৫০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি	০৬৪২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩-৫৬৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজবাড়ী সদর	০৬৪১-৬৫৩৬৪ (অ)
মাদারীপুর জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬১-৬১৪৪২ (অ) dfomadaripur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬১-৫৫৪১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২-৫৬১৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪-৫৬১২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদারীপুর সদর	০৬৬১-৬২১২১ (অ)
গোপালগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শামীম হাওলাদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৬৬৮৫৫৫৫ (অ) dfogopalganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৬৬৮৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টুঙ্গীপাড়া	০২-৬৬৫৬৩০৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুকসুদপুর	০৬৬৫৪-৫৬২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৬৬৫২-৫৬২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া	০২-৬৬৫১৩১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ সদর	০২-৬৬৮৫৯৪২ (অ)
শরীয়তপুর জেলা	
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১-৬১৪৮২ (অ) dfoshariatpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১-৬১৪৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭-৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২-৫৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪-৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩-৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১-৫৬১৪৫ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ময়মনসিংহ জেলা	
জনাব সুরেশ চন্দ্র সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) dfomymensingh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১-৬৬১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলপুর	০৯০২৪-৫৬০১৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০৯০২৯-৬৪৩৬০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২-৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৯-৫৬০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৬-৭৫৩৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া	০৯০২৩-৭৩০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২-৫৬০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫-৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬-৫৬১৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধোবাউড়া	০৯০৩৪-৫৬০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০১৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১-৬৬৩৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদকান্দা	০৯১-৬৬১৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গৌরীপুর	০৯০২৭-৫৬০১৬ (অ)
কিশোরগঞ্জ জেলা	
ড. মোঃ মজিবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	০৯৪১-৬১৯২৭ (অ) dfokishoreganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১-৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭-৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৪-৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩-৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কটিয়াদী	০৯৪২৬-৫৬১৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলিয়ারচর	০৯৪২৯-৫৬১৬৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মিঠামইন	০৯৪৩৫-৫৬০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাকুন্দিয়া	০৯৪৩৩-৫৬০৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াইল	০৯৬৩৪-৭৫১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইটনা	০৯৪২৬-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম	০৯৪২২-৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫-৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ সদর	০৯৪১-৬১৮৬৯ (অ)
কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কটিয়াদি	০৯৪২৮-৫৬০৪৭ (অ)
নেত্রকোনা জেলা	
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৫১-৬১৪০৪ (অ) dfonetrokona@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৫১-৬১৩৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪-৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩-৫৬০৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮-৫৬০০২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২-৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২-৫৬১২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা	০৯৫২৭-৫৬১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী	০৯৫২৬-৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুর্গাপুর	০৯৫২৫-৫৬৩৪৪ (অ)
জামালপুর জেলা	
জনাব রনজিত কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৮১-৬৩৬২০ (অ) dfojamalpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১-৬৩২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪-৭৪১৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩-৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭-৫৬২৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বকশীগঞ্জ	০৯৮২২-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১-৬৩৩৫১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৬৬১৮৪ (অ)
শেরপুর জেলা	
জনাব গোলাম মোস্তফা আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ) dfosherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৩১-৬২৬৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৫২৩-৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৫২৪-৭৩৩০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৫২২-৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৫২৫-৫৬০৭৯ (অ)
টাঙ্গাইল জেলা	
জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	০৯২১-৬৩৬৭৮ (অ) dfotangail@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১-৫৪০৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মির্জাপুর	০৯২২৯-৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩-৭৫০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬-৭৫১৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভূয়াপুর	০৯২২৩-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৫-৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২-৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সখিপুর	০৯২৩২-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেলদুয়ার	০৯২২৪-৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮-৫৬০৬৫
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধনবাড়ী	০৯২২৮-৫৬২৬৯

খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপপরিচালক (চঃ দাঃ)	০৪১-৭৬২৬৩২ (অ) ০৪১-৭৬৩৩৪৫ (ফ্যা) ddkhulna@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০৪১-২৮৩১৩১৯(অ) shafiqmonirul@gmail.com
জনাব সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায় প্রকল্প	০৪১-৭৬৩০১৩ (অ)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মৎস্য জরিপ পদ্ধতি, খুলনা	০৪১-৭৬১০০৩ (অ)
প্রকল্প কর্মকর্তা	০৪১-৭৬১০০৯ (অ)

খুলনা জেলা	
জনাব প্রফুল্ল কুমার সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১-৭৬৩০১৬ (অ) dfokhulna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১-৭০১৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯-৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা	০৪০২২-৫৬০২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫-৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩-৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬২৬২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬-৫৬০৩৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১-৮৯০০১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১-৮০০১২২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খুলনা সদর	০৪১-৮১৩২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ডুমুরিয়া, খুলনা	০৪০২৫-৫৬১১৭ (অ)

সাতক্ষীরা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল অদুদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১-৬৩৩১৮ (অ) dfosatkhira@fisheries.gov.bd
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০১৭১২-৮৪৫৫৯৪
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১-৬৫৮৪০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪-৭৫৩২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৩-৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনি	০৪৭২২-৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫-৫৬০৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬-৭৪০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২-৭১০৫৫ (অ)

বাগেরহাট জেলা	
জনাব নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	০৪৬৮-৬২৪৪৫ (অ) dfobagerhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮-৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭-৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬-৫৬২০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মংলা	০৪৬৫৮-৭৩২১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৪৬৫৪-৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী	০৪৬৫২-৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোল্লাহাট	০৪৬৫৫-৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফকিরহাট	০৪৬৫৩-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরণখোলা	০৪৬৫৯-৫৬০৪৭ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
যশোর জেলা	
জনাব মোঃ রমজান আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১-৬৫৭৫২ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১-৬৮৬৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অভয়নগর	০৪২২২-৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫-৭১৫২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মণিরামপুর	০৪২২৭-৭৮৪২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬-৫৬৩৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮-৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪-৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১-৬৪০৪৬ (অ)
ঝিনাইদহ জেলা	
জনাব শঙ্কর চন্দ্র হাওলাদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১-৬২৬৫৭ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১-৬১৩৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিণাকুণ্ডু	০৪৫২২-৭৪০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩-৫৬১০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪-৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫-৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকুপা	০৪৫২৬-৫৬০৬০ (অ)
হ্যাচারী ম্যানেজার, কেন্দ্রীয় কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)
নড়াইল জেলা	
জনাব হরিপদ মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১-৬২০৩৩ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১-৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৪৮২৩-৫৬৩৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২-৫৬০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৮১-৬২০৬৬ (অ)
মাগুরা জেলা	
চন্দ্র শেখর নন্দী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮-৬২৩৪১ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮-৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩-৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুহম্মদপুর	০৪৮৫২-৭৫১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪-৫৬১৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাগুরা সদর	০৪৮৮-৬২৮৫১ (অ)
কুষ্টিয়া জেলা	
ড. শেখ শফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১-৬২১৮৯ (অ) [illegible]
সহকারী পরিচালক, কুষ্টিয়া	০৭১-৬২১০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১-৭১১৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫-৭৬৪৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪-৫৬৩৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬-৫৬৪৫৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২-৭১০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩-৭৫২৬২ (অ)
মেহেরপুর জেলা	
জনাব মোহাম্মদ মেছবাহুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১-৬২৫৪৩ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১-৬২৬৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাংনী	০৭৯২২-৭৫৮৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুজিবনগর	০৭৯২৩-৭৪১৬৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৭৯১-৬২৯১৮ (অ)
চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জনাব মোহাঃ বজলুর রশীদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১-৬২০৮৮ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১-৬৫১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২৪-৭৫০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা	০৭৬২২-৫৬২৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দামুড়হুদা	০৭৬২৩-৫৬০৫৭ (অ)
রাজশাহী বিভাগ	
জনাব মোঃ মাহবুব উল আলম উপপরিচালক	০৭২১-৭৬০১৮৪ (অ) [illegible]
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭২১-৮৬০০০২ (অ) ০৭২১-৮৬০০০২ (ফ্যা)
জনাব মোঃ রুহুল আমীন, সহকারী পরিচালক ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগ	০৭২১-৮৬০৫৯০ (অ)
বেগম মঞ্জুয়ারা বেগম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ জরিপ	০৭২১-৮৬১৫০১ (অ)
রাজশাহী জেলা	
জনাব মোহাঃ গোলাম রাব্বানী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১-৭৬০২৪৫ (অ) [illegible]
সহকারী পরিচালক	০৭২১-৭৬০৮৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১-৭৬০৮২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮-৫৬৩২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুর্গাপুর	০৭২২৪-৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩-৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩-৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯-৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫-৫৬১৮১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১-৮৬১৪৪০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পুঠিয়া, রাজশাহী	০৭২২৮-৫৬৩১৩ (অ)
নাটোর জেলা	
জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১-৬২৫৯০ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১-৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪-৭৪৪০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬-৬৫১২০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২-৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫-৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১-৬২৯১৮ (অ)
নওগাঁ জেলা	
জনাব মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১-৬২৫৮৫ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১-৬২৮২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫-৬২০৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২-৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	০৭৪২৬-৫৭১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭-৫৬০৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩-৫৬০৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২-৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী	০৭৪২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	০৭৪২৪-৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা	০৭৪২৮-৬৩০৯৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯-৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১-৬১৭৬১ (অ)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ একরামুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১-৫৫৪৮২ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১-৫৫৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪-৫৬০৩২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩-৭৪১১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫-৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২-৫৬০৪৯ (অ)
পাবনা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (বাসা) dfopabna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১-৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫-৬৪০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘরিয়া	০৭৩২২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪-৬৫৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩-৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঁথিয়া	০৭৩২৭-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯-৫৬১১৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৪২৭ (অ)
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১-৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬১৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫-৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭-৬৪৫৩৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪-৫৬০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াশ	০৭৫২৮-৪৬১০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ	০৭৫২৬-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলকুচি	০৭৫২২-৫৬৫০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌহালি	০৭৫১-৬৩৮২৩ (অ)
প্রকল্প মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬২১৫ (অ)
জয়পুরহাট জেলা	
জনাব আব্দুল সাত্তার প্রাং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ.দা.)	০৫৭১-৬২২২৪ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১-৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১-৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালাই	০৫৭২৬-৫৬০৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর	০৫৭২২-৬৪০১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩-৫৬০৪৫ (অ)
বগুড়া জেলা	
জনাব ক্ষিরোদ কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ.দা.)	০৫১-৬০৫৭০ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১-৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯-৭৭৪১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১-৬৯২২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬-৫৬০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭-৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৫০৩৩-৬৯০৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি	০৫১-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪-৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধুনট	০৫০২৩-৫৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫-৭৫০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাতলা	০৫০৩২-৭৯১১৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাহানপুর	০৫১৮২২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর	০৫১-৬৫৩৩৮ (অ)
রংপুর বিভাগ	
জনাব মোঃ রকিব উদ্দিন বিশ্বাস উপপরিচালক	০৫২১-৬৪৭৭৩ (অ) ০৫২১-৫৫০৪৬ (বা) [illegible] rakibbiswas38@gmail.com
জনাব অদ্বৈত চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৫২১-৫৫০৪৫ (অ) adwaita41@gmail.com
রংপুর জেলা	
বেগম রওশন আরা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১-৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭-৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫-৮৭০৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ	০৫২২২-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউনিয়া	০৫২২৪-৫৬০৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গঙ্গাচড়া	০৫২২৩-৫৬০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগাছা	০৫২২৬-৫৬০৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ	০৫২২৮-৫৬০৩৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
কুড়িগ্রাম জেলা	
ড. মোঃ জিল্লুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮১-৬১৮০১ (অ) ০৫৮১-৬১১২৪ (বা) dfokurigram@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১-৬১৮৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৮২-৫৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজিবপুর	০৫৮২৫-৫৬২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী	০৫৮২৬-৫৬৩২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯-৫৬২৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজারহাট	০৫৮২৭-৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভুরুঙ্গামারী	০৫৮২২-৫৬০৭৪ (অ)

নীলফামারী জেলা	
জনাব শাহ ইমাম জাফর সাদেক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৫১-৬১৭৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২-৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫-৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩-৭০১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪-৬৪০৮৩ (অ)

ঠাকুরগাঁও জেলা	
জনাব মোঃ লতিফুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১-৫৩৬৬৩ (অ) dfothakurgaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১-৫২২২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীশংকৈল	০৫৬২৫-৫৬১১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৬২২-৫৬০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩-৫৬০১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪-৫৬৩৮৯ (অ)

দিনাজপুর জেলা	
জনাব মোঃ হাসান ফেরদৌস সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ) dfodinajpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১-৬৩৩১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩-৫২৫১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহারোল	০৫৩৩৫-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬-৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭-৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরামপুর	০৫৩২২-৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯-৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট	০৫৩২৮-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩-৫৬১২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেতাবগঞ্জ	০৫৩২৫-৫৩২২১ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
লালমনিরহাট জেলা	
ড. মোঃ আবুল হাছানাত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১-৬১৩৮০ (অ) ০৫৯১-৬১১০৭ (বা) dfolalmonirhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১-৬১০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদিতমারী	০২৯২২২৫৬১৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৫৯২৪-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতীবান্ধা	০৫৯২৩-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাটগ্রাম	০৫৯২৫-৫৬০৭৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১-৬১০৭১ (অ)
গাইবান্ধা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১-৬১৫৪৩ (অ) dfogaibandha@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১-৬১৯২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩-৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর	০৫৪১-৬১৩৪৯৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলছড়ি	০৫৪২২-৬২০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭-৬৬০৭২ (অ)
পঞ্চগড় জেলা	
জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)	০৫৬৮-৬১৩৩৯ (অ) [illegible]
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮-৬১৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩-৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৫৪-৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া	০৫৬৫৫-৭৫০৬৫ (অ)
চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব এ কে এম সিদ্দিক উপপরিচালক	০৩১-৭২১২৭ (অ) ০৩১-৭১৯৬৬ (বা) ddchittagong@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার সহকারী পরিচালক	০৩১-৭২৫১১ (অ)
চট্টগ্রাম জেলা	
বেগম প্রভাতী দেব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) dfochittagong@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরসরাই	০৩০২৪-৫৬২৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড	০৩০২৮-৫৬০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী	০৩০৩৭-৫৬১৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাউজান	০৩০২৬-৫৬২৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চন্দনাইশ	০৩০৩৩-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৩০৩৪-৫৬৫১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি	০৩০২২-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬-৫৬৪৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাটহাজারী	০৩১-২৬০১৮৯৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গুনিয়া	০৩০২৫-৫৬২০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালখালী	০৩০৩২-৫৬১৭৫ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সন্দীপ	০৩০২৭-৫৬২০৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩৪৮ (অ)
কক্সবাজার জেলা	
জনাব ফেরদৌস আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৫১১৭৪ (অ) dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (এডিপি)	০৩৪১-৬৪৫৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১-৬৪২৬৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪-৭৪২৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬-৭৫০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া	০৩৪২২-৫৬৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫-৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭-৫৬১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পেকুয়া	০৩৪২৮-৫৬১৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	০৩৪২৩-৫৬১৫৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৫১১২৬ (অ)
ফেনী জেলা	
জনাব মোহাম্মদ মানিক মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১-৭৪০৮৬ (অ) ০৩৩১-৬১২৮৭ (বা) dfoferi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১-৭৪০৭৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২-৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪-৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬-৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঞা	০৩৩২৩-৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১-৭৪২৩২ (অ)
চাঁদপুর জেলা	
জনাব মোঃ সফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ) dfochandpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪১-৬৩৬৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭-৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দঃ)	০৮৪২৬-৫৬৩৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (উঃ)	০৮৪২৮-৫১০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাইমচর	০৮৪২৩-৫২২০১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ	০৮৪২৪-৭৫০৫৮(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদগঞ্জ	০৮৪২২-৬৪৩৭৬(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১২৮(অ)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১-৫৮৩৩১ (অ) ০৮৫১-৫৮৭৮৫ (বা) dfobrahmanbaria@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৫১-৫৮০১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর	০৮৫২৫-৭৫২৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর	০৮৫২৩-৫৬১০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাসিরনগর	০৮৫২৬-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরাইল	০৮৫২৭-৫৬১৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কসবা	০৮৫২৪-৭৫২০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ	০৮৫২৮-৭৪১০১ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
কুমিল্লা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১-৭৬১৫১ (অ) dfocomilla@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮১-৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯-৫৬২৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮৩২-৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০-৫৬২১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চান্দিনা	০৮০২২৫৬৪১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবিদ্বার	০৮২৪-২৩৯৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬-৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩-৫৫৩৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট	০৮০৩৩-৬৬১২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরুড়া	০৮০২৭-৫২০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ	০৮০৪২-৫৭০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেঘনা	০৮০৩৫-৫১১৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তিতাস	০৮০২৩-৫৫৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোমনা	০৮০২৫-৫৪২৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণপাড়া	০৮০২৮-৫৬২৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরগঞ্জ	০৮০৩৭-৫৩০৩১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, দেবীদ্বার খামার	০৮০২৪-৫৩৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাঙ্গালিয়া খামার	০৮১-৭৬৫৪২ (অ)
রাঙ্গামাটি জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আবদুল হান্নান মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১-৬১৩৩৯(অ) ০৩৫১-৬১৩৩৪ (ফ্যা) ০৩৫১-৬২৩২৭ dforangamati@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১-৬৩৬০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লংগদু	০৩৫১-৪২০১০
বান্দরবান জেলা	
জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৬১-৬২০০৫ (অ) dfobandarban@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ) ০৩৬১-৬২০০৫
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলীকদম	০৩৬১-৮১০১১ (অ)
খাগড়াছড়ি জেলা	
জনাব আ-ব-মোঃ আখতার-উজ-জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ) dfokhagrachari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৭১-৬২০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,মহালছড়ি	০৩৭১-৫১০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,দীঘিনালা	০৩৭১-৮১০৪০ (অ)
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১-৬১৪৫০ (অ) ০৩৮১-৫৫৪৫৫ dfolaxmipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১-৬২২৬৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২৩-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২২-৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২৪-৭৫৪৯৫ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
নোয়াখালী জেলা	
বেগম বিলকিস তাহমিনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ. দা.)	০৩২১-৬১৬৮১ (অ) dfonoakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩২১-৬১৬৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১-৫২৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৩২২৩-৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫-৫৬১৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া	০৩২২৪-৫৬০৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটখিল	০৩২২২-৭৫০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুবর্ণচর	০৩২২৬-৫২১৫৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কবিরহাট	০৩২৩২-৫৩২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ি	০৩২২৭-৫১০১৩ (অ)
সিলেট বিভাগ	
জনাব আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক উপপরিচালক	০৮২১-৭২৬১৫০(অ) (ফা) dd.sylhet@fisheries.gov.bd
জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ সহকারী পরিচালক	০৮২১-৭২৩২৫৭ (অ)
সিলেট জেলা	
জনাব শঙ্কর রঞ্জন দাশ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) ০৮২১-৭১৬২৪১ (বা) dfo.sylhet@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য দপ্তর	০৮২১-৭১১২৯৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১-২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২-৫৬১২২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪-৫৬০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২-৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দক্ষিণ সুরমা	০৮২১-২৮৭৮২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬-৫৬২৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩-৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩-৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৮২২৫-৫৬০৯৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১-২৮৭০২২৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৪ (অ)
সুনামগঞ্জ জেলা	
জনাব সুলতান আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৬১৪৯৭ (অ) dfosunamganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১-৬১৬৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই	০৮৭২৪-৫৬৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০৮৭৩২-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোয়ারাবাজার	০৮৭২৬-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাল্লা	০৮৭২৯-৫৬০৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০৮৭২২-৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালগঞ্জ	০৮৭২৮-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২৫-৭৫০৫১ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দ: সুনামগঞ্জ	০৮৭১-৬২৪৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩-৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭-৫৬০৪২ (অ)
হবিগঞ্জ জেলা	
জনাব আশরাফ উদ্দিন আহম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৬৩৫৫০ (অ) dfohabiganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৩১-৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮-৫৬৫০২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং	০৮৩২৪-৫৬২১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আজমিরীগঞ্জ	০৮৩২২-৫৬১১৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাহুবল	০৮৩২৩-৫৬০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুনারুঘাট	০৮৩২৮-৫৬১৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাধবপুর	০৮৩২৭-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাখাই	০৮৩২৬-৫৬০৫৪ (অ)
মৌলভীবাজার জেলা	
জনাব আ. ক. ম শফিক-উজ-জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ) dfomoulvibazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১-৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬-৭১৪৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজনগর	০৮৬২৫-৭৫৪৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলাউড়া	০৮৬২৪-৫৬৬৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ	০৮৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জুড়ী	০৮৬২৭-৫৭১৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়লেখা	০৮৬২২-৫৬৬১৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৯৬১-৫২২৯২ (অ)
বরিশাল বিভাগ	
ড. এ কে এম আমিনুল হক উপপরিচালক	০৪৩১-৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফা) dfobarisal@fisheries.gov.bd
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক	০৪৩১-৬৩৪৫২ (অ)
বরিশাল জেলা	
জনাব মোঃ গিয়াহিদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ) dfobarisal@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৩১-৬২৬০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝাড়া	০৪৩২৩-৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮-৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩২৭-৭৫০৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরনদী	০৪৩২২-৫৬৫৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩৩২-৫৬৩৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬-৭৫২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪-৫৬০৪১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৩১- ২১৭৩৫১৫(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৫ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ভোলা জেলা	
জনাব প্রীতিষ কুমার মল্লিক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১-৬২৮৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশন	০৪৯২৩-৭৪০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭-৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪-৫৬১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোকমানউদ্দিন	০৪৯২২-৫৬১৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমোহন	০৪৯২৫-৭৫৬১৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনপুরা	০৪৯২৬-৫৬০২১ (অ)
ঝালকাঠি জেলা	
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮-৬৩২৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাঠালিয়া	০৪৯৫২-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর	০৪৯৫৪-৬৫৩৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নলছিটি	০৪৯৫৩-৭৪০৩৪ (অ)
বরগুনা জেলা	
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (উ.দা)	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮-৬২৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২-৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫-৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩-৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪-৫৬১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, বরগুনা সদর	০৪৪৮-৬২৬৮১ (অ)
পটুয়াখালী জেলা	
জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১-৬২৫০১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৪১-৬২০৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২-৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪-৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬-৭৫২৮৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটুয়াখালী সদর	০৪৪১-৬২৮০৫ (অ)

পিরোজপুর জেলা	
জনাব মোঃ অলিয়ুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২৫৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১-৬২৬৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া	০৪৬২৫-৭৫১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬-৭৪০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪-৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেছারাবাদ	০৪৬২৭-৫৬০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভিয়ানগর	০৪৬২২-৫৬১৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভান্ডারিয়া	০৪৬২৩-৫৬৪৫৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১-৬২০৬৩ (অ)

মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
প্রফেসর ড. মোঃ ইদ্রিস মিয়া ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৯১-৬৭৪২৬ (অ)
ড. মুহাম্মদ গোলাম কাদের খান প্রধান, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯১০ (অ)
প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন প্রধান, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯২০ (অ)
প্রফেসর ড. হারুনুর রশীদ প্রধান, ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৫৬ (অ)
ড. মোঃ শাহেদ রেজা প্রধান, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৭২ (অ)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	
প্রফেসর ড. মোঃহায়েক-উজ্জামান ভাইস-চ্যান্সেলর	০৪১-৭২১৩৮৩ (অ) ০৪১-২৮৩০১১১ (বা)
প্রফেসর ড. মোঃ আইয়াজ হাসান চিশতী প্রধান, এফ.এম.আর.টি ডিসিপ্লিন	০৪১-৭৩২১৫৭ (অ) mahchisty@gmail.com
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	
ড. সুলতান মাহমুদ অধ্যাপক, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৪৪২৭-৫৬৩১৭ sultanmahmud77@yahoo.com
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	
ড. মোঃ আখতার হোসেন অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১-৭৬০৪৪১ (বা) mahfaa@yahoo.com
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
মিসেস ওয়াহিদা হক চেয়ারম্যান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০- ৭৭৮৩ (অ) dasihsan@yahoo.com
ড. এম. নিয়ামুল নাসের অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	৯৬৬১৯২০-৫০ এক্স. ৭৫৯৮ (অ)
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূরুল আবছার খান ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	০৩১-৬৮৯২১০ mnkabsar@yahoo.com

সংকলনে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মামুন
সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

USAID Disclaimer: "This publication is made through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."